বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, গ্রন্থাগার
সংখ্যা
কলিকাতা

The Hare Prize Fund Essay.

নারীশিক্ষা।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫৩ [illegible] স্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে
মুদ্রিত হইল।

১১ পৌষ, ১২৭৫ সাল।

মূল্য ।০ বার [illegible]

The Hare Prize Fund Essay.

নারীশিক্ষা।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৫৩ নং কালেজ ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে
মুদ্রিত হইল।

১১ মাঘ ১২৭৫ সাল

মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

নারীশিক্ষা ২য় ভাগ কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, বামাবোধিনী সভা হইতে ১২৭০ ভাদ্র হইতে ১২৭৪ চৈত্র পর্য্যন্ত যে সকল বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে; সেই সকল পত্রিকা হইতে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী বিষয়গুলি উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে "নারীশিক্ষা" নামে প্রকাশিত হইল।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে কোণনগর নিবাসী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব এবং "হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড" সভার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু প্যারী চাঁদ মিত্র মহাশয়দিগের যত্নে এই পুস্তকের মুদ্রার ব্যয় "হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড" হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল।

কলিকাতা বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৫৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
১১ মাঘ, ১২৭৫ সাল।

The Hare Prize Fund Essay.

The Hare Prize fund is for the preparation of standard works in the Bengali language calculated to elevate the female minds.

Adjudicators.

Baboo Debendro Nath Tagore.
The Revd. K. M. Benerjea.
Baboo Shib Chunder Deb.
Baboo Peary Chand Mittra:

Secretary.

সূচী পত্র।

পৃষ্ঠা—

১। বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন

বিদ্যা কয় প্রকার ১
বিদ্যা বিভাগ ২৩

২। ভূগোল।

পৃথিবীর আকার ২৫
পৃথিবীর পরিমাণ ও স্থিতি ৩১
পৃথিবীর গতি ৩৩
গোলকের বিষয় ৩৫
সূর্য্যের আকর্ষণ ও পৃথিবীর কক্ষ ৪২
ঋতুভেদ ৪৪
মেরুসন্নিহিত দেশ সকলের বিবরণ ৪৯

৩। খগোল।

সৌরজগৎ ৫৬
চন্দ্রগ্রহণ ৬১
সূর্য্যগ্রহণ ৬৬

৪। বিজ্ঞান।

জলবহুরূপী—মেঘ ও বাষ্প ৭০
ঐ—শিশির ৭২
ঐ—কোয়াসা শিল ও বরফ ৭৪
রামধনু ৭৭
ভূমিকম্প ৮১
জোয়ার ভাঁটা ৮৯

পৃষ্ঠা
উদ্ভিদ্ তত্ত্ব ৯৫
বৃক্ষশরীর ৯৭
উদ্ভিদ কার্য্যপ্রণালী ১০৭
বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।
১। উপক্রমণিকা ১১০
২। পরমাণু ১১৩
৩। মূল পদার্থ ১২০
৪। আকৃতি ও বিস্তৃতি ১২৬
৫। অভেদ্যতা ১৩১
৬। অবিনাশ্যতা ১৩৬
৭। জড়গুণ ১৪২
৮। আকর্ষণ ১৫০
৯। মধ্যাকর্ষণ ১৫৫
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।
১০। আকাশ ও আকাশস্থ পদার্থ ১৫৯
১১। সময় ও গতি ১৬৫
১২। বিবিধ বিষয় ১৬৯
৫। নীতি ও ধর্ম্ম।
যাহার যেমন অবস্থা তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ১৭৫
কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ।
উপক্রমণিকা ১৮৩
১। বিদ্যাশিক্ষা ১৮৯
২। কুসংস্কার ১৯৫
৩। জ্ঞান ও কার্য্য ২০২
৪। সৎকর্ম্ম ২০৯
স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর সম্বন্ধ ২১৭

পৃষ্ঠা—
কুসংসর্গ ... ২২১
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ
১। সরলতা ... ২২৪
২। কৃতজ্ঞতা ... ২৩২
৩। দয়া-স্নেহ ... ২৩৯
৪। ভক্তি ও সম্মান ... ২৪৪
ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার উপদেশ ... ২৫১
ভগ্নীভাব ... ২৫৭
স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য ... ২৬৭
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চগেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ২৭২
সত্যবতী ও সুকুমারীর কথোপকথন ... ২৭৭
গৃহকার্য্য।
স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ ... ১৮৭
সময় ... ২৯০
অর্থ ব্যয় ... ২৯৪

চিত্র।

পৃথিবীর আকার ... ২৮
গালকের বিষয় ... ৩৫
ভূভেদ ... ৪৫
...ার জগৎ ... ৫৮
...র গ্রহণ ... ৬৫
...্য গ্রহণ ... ৬৭
...বার ভাঁটা ... ৯০

নিম্নলিখিত পুস্তক সকল "হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের" সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে।——

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান .... মূল্য ৷৹ আনা
মহিলাবলী .... মূল্য ।৶০ আনা
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ .... মূল্য ৷৹ আনা
ঐ ২য় ভাগ .... মূল্য ৸০ আনা

বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত
পুস্তক ও পত্রিকা।

কুমুদিনী চরিত (উত্তম কাগজে ছাপা ৬ ফরমা) মূল্য
নারীশিক্ষা ১ম ভাগ (২০ ফরমা) " " " " "
ঐ ২য় ভাগ (২৬ ফরমা) " " " " "

বামাবোধিনী পত্রিকা।

(৩ ফরমা মাসিক)

এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য কলিকাতার জন্য " " "
ঐ ঐ মফঃস্বলের জন্য) " "
প্রতি খণ্ডের মূল্য) " " " " " " " "
বামাবোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ (১২৭০ ভাদ্র হ
৭১ চৈত্র পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে বাঁধা) মূল্য ১৷৷
ঐ ২য় ভাগ ১ম খণ্ড (১২৭২ সাল বাঁধা) "
ঐ ঐ (বিলাতি কাপড়ে বাঁধা) " "
ঐ ঐ ২য় খণ্ড (১২৭৩ সাল বাঁধা) " "
ঐ ২য় ভাগ (১২৭২৷৷ ৭৩ সাল একত্র বাঁধা
ঐ ৩য় ভাগ (১২৭৪ সাল বাঁধা) " " "

নগদ মূল্যে ১২ খণ্ডের অধিক ৫০ খণ্ড পর্য্যন্ত ক্রয় করিলে ১২৷৷০ টাকা এবং ৫০ খণ্ডের অধিক ২৫৲ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

াদ মূল্যে এককালে ১২ বার খণ্ড পত্রিকা িম্বা
ৎসরের পত্রিকা ক্রয় করিলে ১।০ পাঁচসিকাতে
য়া যাইবে।

☞ ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকা বামাবোধিনী
ালয়—"কলিকাতা পটলডাঙ্গা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৩
ক ভবনে" এবং বটতলা শ্রীরাধাবল্লভ শীলে
য় পুস্তকালয়ে" প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

নারীশিক্ষা।

দ্বিতীয়ভাগ।

বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন।

বিদ্যা কয় প্রকার।

জ্ঞানদা, সরলা ও প্রভাব

স্ত্রীলোকগণ।

সরলা। জ্ঞানদা! একটা বড় সুসমাচার তোমায় চুপে চুপে বলি শোন। সেদিন ভাই তুমি আমারে যে কথাগুলি বলে মেয়েমানুষদের লেখাপড়া শেখা উচিত বুঝিয়ে দেছিলে আমি পাড়ার সঙ্গিমেয়ে জন-কতককে তাই বলেছিলাম, তাতে তারা অনেক আপত্তি করে শেষকালে আমাদের দলে এসেছে, লেখাপড়া শেখবার জন্যে অনেকের মন হয়েছে, তারা তোমায়

সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌চে, একটু পেছিয়ে আছে, এলো বলে।

জ্ঞানদা। ভাই সরলা! আমি জানি যাদের মন ভাল, তারা আপনারা একটা সুখ পেয়ে লুকায়ে রাখে না, আর দশ জনকে সুখী দেখ্‌তে চায়। তোমার সাধু ইচ্ছা দেখে আমি যে কত সন্তুষ্ট হলাম বলিতে পারি না। যা হউক ঐ বুঝি তাঁরা আস্‌ছেন, চল আগিয়ে আনি গিয়ে। (পাড়ার মেয়েদের নিকটে আসিয়া) আমার এ বড় সৌভাগ্য! এস ভগিনী সব এস; চল ঐ ঘরের ভিতর গিয়া বসি।

পাড়ার মেয়েরা। আমরা অনেক দিন তোমার নাম শুনেচি কিন্তু লেখাপড়া কর বলে তোমার উপর কেমন কেমন একটা ভাব ছিল। এখন সরলার মুখে তোমার কথা শুনে তুমি যে সামান্য মেয়ে নও বুঝেছি। শুনিলাম সরলাকে তুমি না কি লেখাপড়া শিখাবে? তা ভাই সেই সঙ্গে আমাদের প্রতিও কেন অনুগ্রহ কর না?

জ্ঞা। অমৃতে অরুচি কার? আমি সকল মেয়ে-মানুষকে আমার ভগিনী বলিয়া জানি, আমাদ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার হয় তার বাড়া আমার সৌভাগ্য কি? আর জ্ঞানের জন্য যারা আইসে তারা যে আমাকে কত সুখী করে বলিতে পারি না। আমি দিবা

নিশি আমাদের মেয়েমানুষদের দুঃখের কথা ভাবি আর কাঁদিতে থাকি। তোমরা লেখাপড়া শিখিলে আমার সব দুঃখ যায়।

পাড়া। তবে তোমারে আর বেশী কথা কি বল্‌বো? লেখাপড়া শিখ্‌বো বলে আমরাও স্থির করেছি, তা সরলার সঙ্গে আমাদিগকে তোমার ছাত্রী করিয়া লও। আজি কিন্তু আমরা কতগুলা কথা জেনে যেতে এসেছি, তুমি আগে তাই বলে দেও।

জ্ঞা। আচ্ছা, কি কথা জানিবে বল?

পাড়া। আমরা এই যে লেখাপড়া করিব একি একটু লিখিতে আর পড়িতে শিখিলেই হয়? না, বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারসী, সব বিদ্যা জানিতে হবে? বিদ্যা সব সুদ্ধ কত রকম এবং তা শিখিবার উপকার কি কি? আর শিখিতে বা কতদিন লাগে এই সব আমরা জানিতে চাই।

জ্ঞা। সরলাকে এবিষয় আমি ভাল করিয়া বলিতাম, তা এতগুলি একত্র হয়ে এ কথা উঠেছে বড় ভাল হয়েছে, কিন্তু এটা খুব ভারি বিষয় একটু মনঃসংযোগ দিয়া শুনিতে হবে।

স। আমি জানি ওঁদের মনঃসংযোগ খুব আছে, তুমি কিছু ভাবিও না। ছাত্রীর মত আমাদিগকে উপদেশ দেও আমরা সকলেই মনদিয়া শুনিব।

জ্ঞা। লেখাপড়া নাম দেওয়া যায় বলিয়া একটু লিখিতে আর প'ড়িতে পারিলেই বিদ্যা হয় না। পরমেশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া সকল জন্তুর চেয়ে বড় করেছেন, সেই বুদ্ধি চালনা করিয়া নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই বিদ্যা। লেখা ও পড়াতে বিদ্যা শিখিবার সাহায্য করে বলিয়া তা আগে চাই কিন্তু সে আসল বিদ্যা নয়। আর আমাদের একটা ভ্রম আছে যে একজন যদি বাঙ্গলা ইংরেজী পারসা, নাগরী শিখিলেক আমরা মনে করি এ লোকটা চারি বিদ্যায় মূর্ত্তিমন্ত। কিন্তু বাঙ্গলা ইংরাজী প্রভৃতি বিদ্যা নয়, ভাষা। যেমন একটা ঘরের ভিতর যাইতে হইলে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, জ্ঞানভাণ্ডারে যাইতে হইলে প্রথম ভাষা শিখিতে হয়। কিন্তু যেমন কোন একটা দ্বারদিয়া যাইলেই ঘরে প্রবেশ করা যায়, সেই রূপ বিদ্যার জন্য কোন একটা ভাষা শিখিলেই হয়। নানাভাষা জানিলেই বেশী বিদ্যা হয় না।

ছাত্রীগণ। তবে কি বাঙ্গলাতে ও ইংরাজীতে সমান ?

জ্ঞা। আসল বিষয়ে সমান বটে অর্থাৎ দুয়েতেই এক রকমে জ্ঞান পাওয়া যায়। তবে বিশেষ এই যে ইংরাজীতে অনেক বেশী বই আছে তাতে বেশী

জ্ঞান পাওয়া যায়। তা ঈশ্বরেচ্ছায় কালক্রমে আমাদের বাঙ্গলা ভাষাও সেইরূপ হইবে। যা হউক আমি তোমাদের বলেছি যে জ্ঞান লাভই বিদ্যা। এই বিদ্যা শিখিতে কতদিন লাগে যদি জানিতে চাও তবে কত রকম বিদ্যা আছে তা আগে জানিতে হয়।

ছা। আচ্ছা বল আমরা শুনিতেছি।

জ্ঞা। ঈশ্বর আমাদিগকে মন দিয়াছেন আর অসংখ্য বস্তু ও অসংখ্য কার্য্যে এই জগৎকে পূর্ণ করেছেন। এই মনের শক্তি সকল যত প্রকাশ পাইবে এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই বিদ্যারও বৃদ্ধি হইবে। বিদ্যার সংখ্যা নাই, বিদ্যার কেহ সীমাও করিতে পারে না। সকল বিদ্যাতেই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান ও পৃথক্ পৃথক্ সুখ। আমি তাহা এক একটী করিয়া বলিতেছি. মন দিয়া শুন।

১ম—ভূগোলবিদ্যা। এ বিদ্যা শিখিলে পৃথিবীর আকার কিরূপ? ইহা কেমন করিয়া আছে? ইহার কোন্ স্থানে কোন্ নদী পর্ব্বত সমুদ্র, দ্বীপ উপদ্বীপ ইত্যাদি, কোথায় কোন্ রাজ্য রাজধানী? কোথায় কিরূপ জল হাওয়া—কি রকম গাছপালা ও জন্তুসব আছে? কোথায় কি রকম মনুষ্যজাতি। তাহাদের আচার ব্যবহার কৃষি বাণিজ্য রাজ্যশাসন, শিক্ষা প্রণালী ও ধর্ম্ম কিরূপ? এসকল জানা যায়। ভূগোল

পড়িলে অনেক ভ্রম যায়, আমরা হিমালয়কে পৃথিবীর সীমা মনে করিতাম; কিন্তু এখন জেনেছি, তার পরে আরও কত দেশ আছে। ইহা জানিলে দূরবর্ত্তী দেশ সকল যেন চক্ষের সম্মুখে বোধ হয়। এই ইংরাজেরা কোথাহতে কোন্ পথ দিয়া এ দেশে আসিলেন ঘরে বসিয়া জানা যায়। আর নানা দেশের লোকের আচার ব্যবহার তুলনা করিয়া স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাযায়।

যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমুদায় বিবরণ জানা যায়, তাহার নাম ভূতত্ত্ব বিদ্যা, তাহাও ভূগোলের অন্তর্গত।

২য়—খগোলবিদ্যা। ইহাদ্বারা আকাশের কাণ্ড কারখানা সকল জানা যায়: অর্থাৎ সূর্য্য কি? চন্দ্র কি? ধূমকেতু কি? গ্রহ সকল কি? রাত্রি দিন শীত গ্রীষ্ম আদি ঋতু এবং গ্রহণাদি কিরূপে সংঘটন হয়, জানা যায়। গ্রহণের সময় দৈত্য আসিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে, ধূমকেতু উঠিলে অমঙ্গলের লক্ষণ, খগোল জানিলে এসকল ভ্রম দূর হয়। আর 'ব্রহ্মাণ্ড যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার' তাহা জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্য ও হর্ষে মন স্তব্ধ হয়, ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত মহিমা দেখিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে অবনত হয়।

৩য়—ইতিহাস। ভূগোল পড়িলে যেমন পৃথিবীর নানাদেশের বর্ত্তমান বিবরণ জানাযায়, ইতিহাস পড়িলে

নানা দেশে পূর্ব্ব কাল হইতে কত প্রকার স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছে তাহা শিক্ষা করা যায়। বস্তু-দর্শন জ্ঞানের এক মহৎ উপায়, ইতিহাস পাঠে তাহা বিলক্ষণ হয়। মনুষ্য জাতির প্রথমে কিরূপ অবস্থা ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, রাজ্যশাসন, বিদ্যা ও ধর্ম্মের কিরূপে উন্নতি হইয়াছে? এ সকল প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। কোন্ রাজ্যের কি প্রকারে পত্তন হইল? কেমন করিয়া উন্নতি এবং পরে অধোগতি হইল, অধোগতির পর আবার উন্নতি হইল? কোন্ সময়ে কোন্ জাতির মধ্যে কোন্ কোন্ অসাধারণ ব্যক্তির উদয় হইয়াছে কোন্ মহা মহা যুদ্ধে জনসমাজের মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? এ সকল জানা যায়। পৃথিবীর অধোগতি না হইয়া যে উন্নতি হইতেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাও এই যে পৃথিবীর ক্রমশঃ মঙ্গল ও উন্নতি হয় ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিলে সকল জাতির মঙ্গল নতুবা দুর্গতি; হিন্দুদের নিজের দোষেই যে তাঁহাদের এত দুরবস্থা, ইহাও দেখা যায়। ইতিহাসে কত ধর্ম্মোপদেশ পাওয়া যায়! কত ধনগর্ব্বিত রাজা ও প্রতাপ-গর্ব্বিত রাজা বিপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে ইহা দেখিয়া সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা করা যায়।

৪র্থ-প্রাকৃতিকইতিবৃত্ত। অর্থাৎ স্বাভাবিক পদার্থ সক-

লের বিবরণ। এ বিদ্যা শিখিলে চেতন, উদ্ভিদ্ ও অচেতন সকল পদার্থ ক্রমশঃ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কেমন সৃষ্ট হইয়াছে, কোন্ জন্তুর কিরূপ স্বভাব, কোন্ বস্তুর কিরূপ গুণ, জন্তুসকল কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, বৃক্ষ সকল কিরূপে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফুলফলে শোভিত হয়, ধাতু ও আর আর জড়বস্তুর বিবিধ তত্ত্ব কি? জানা যায়। নানা অদ্ভুত বিবরণ ইহার মধ্যে আছে এবং তাহাতে জ্ঞানের সহিত অপার কৌতুক লাভ করা যায়।

৫ম—জীবনচরিত। এই পৃথিবীতে কত অসাধারণ মনুষ্য মধ্যে মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিদ্যা ধর্ম্ম ও কত বিষয়ে আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান। এই সকল মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিলে ধর্ম্মের পথে কিরূপ অটল থাকিতে হয়, বিদ্যার জন্য কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, নানা দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াও কিরূপে আত্মার উন্নতি সাধন করা যায়, এসব বিষয়ে প্রবল দৃষ্টান্ত পাইয়া আমরা অশেষ মঙ্গল লাভ করিতে পারি।

খগোল, ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, ইতিহাস ও জীবনচরিত এ কয়েকটি বিদ্যাতে জগৎ ও পৃথিবী এবং পৃথিবীর অচেতন, উদ্ভিদ্, ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের স্থূল বিবরণ জানা যায়। কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা সূক্ষ্ম-

তত্ত্বসকল জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকে বিজ্ঞান কহে। তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি।

বিজ্ঞান। এই জগতে যে অসংখ্য পদার্থ দেখিতেছি সে সকল কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কি রূপ সম্বন্ধ, জগতে যে অসংখ্য ঘটনা হইতেছে সে সকলের কারণ কি? এবং এক ঘটনার সহিত অন্য ঘটনার বা সম্বন্ধ কি? এ সকল বিজ্ঞান হইতে জানা যায়। ইহা অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই ব্রহ্মাণ্ড একটি পরম সুন্দর যন্ত্রস্বরূপ, তাহার সকল স্থানেই নিয়ম শৃঙ্খলা এবং ঈশ্বর তাহার যন্ত্রী হইয়া আপনার অখণ্ড নিয়মে সকল স্থানে, সকল কালে, সমুদায় ঘটনার সংঘটন করিতেছেন। তাঁহার বিচিত্র শক্তি,আশ্চর্য্য কৌশল এবং অপারমঙ্গলভাব সর্ব্বত্র প্রকাশিত দেখা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে সকল কার্য্যের কারণ বুঝা যায় এবং ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় আনন্দও লাভ হইতে থাকে।

এই বিজ্ঞান অতি বৃহৎ শাস্ত্র এবং তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা। ইহাকে দুইটি প্রধান অংশে বিভাগ করা যায়;—১, জড় বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান; ২, মনোবিজ্ঞান।

১ম, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ইহা দ্বারা জড়বস্তুসকলের

ও তাহাদের মধ্যে যে সকল কার্য্য চলিতেছে তাহার তত্ত্ব জানা যায়। ইহা আবার ৩টি ভাগে বিভক্ত।

(১) বাহ্য বিজ্ঞান—ইহা দ্বারা জড় বস্তু সকলের যে সকল কার্য্য কারণ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই জানা যায়। কিরূপে জল হইতে বাষ্প, মেঘ ও বৃষ্টি হয়; কিরূপে জোয়ার ভাঁটা, ঝড় ও বজ্রপাত হয়; কোন বস্তু শূন্যে রাখিলে কেন ভূমিতলে পতিত হয়? জড় পদার্থ সকলের সাধারণ গুণ কি কি? গতির নিয়ম কি? এ সকল এই বিদ্যায় শিখা যায়। এই বিদ্যাবলে ইংরেজেরা কত কল প্রস্তুত করিতেছেন, কলের গাড়ী, বেলুন, বাষ্পীয় জাহাজ, বাষ্পের আলো ও আর কত শত কাণ্ড করিতেছেন।

(২) রসায়ন বিদ্যা। এই জগতে যত প্রকার জড় বস্তু আছে তাহা কি কি মূল পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন, এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর সংযোগ করিলে কিরূপ নূতন প্রকার গুণ ও কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা এই বিদ্যায় জানা যায়। চূর্ণে ও হরিদ্রাতে একত্র কর, এক নূতন পাটলবর্ণ দেখিবে। দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র বা অম্লরস মিশাও কেমন বিকার দেখিতে পাইবে। এইরূপ দুইটি বায়ু একত্র করিয়া জল তৈয়ার করা যায়। একখানি ছিন্ন বস্ত্র হইতে চিনি বাহির করা যায়। আমরা যে বেদের বাজী দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, রসায়ন

বিদ্যা জানিলে তাহা অতি সামান্য বোধ হয় এবং তাহা অপেক্ষা কত অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

(৩) শারীর বিজ্ঞান। বৃক্ষ ও জন্তুদিগের শরীর আছে। অস্থি, মাংস, শিরা, রক্ত ইত্যাদি দ্বারা শরীর কিরূপে নির্ম্মাণ হইয়াছে; কেমন করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চালনা, আহার, পরিপাক ইত্যাদি কার্য্য হয়; কেমন করিয়া দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে; কেমন করিয়া গর্ভের সঞ্চার হয় এবং গর্ভাবস্থায় সন্তান কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা পায়, শারীর বিজ্ঞানদ্বারা এ সকল জানা যায়। কিরূপে থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং কিরূপে অসুস্থ হয়; রোগ হইলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ইহাও জানা যায়। এ বিদ্যা না জানিলে কেহ চিকিৎসক হইতে পারে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহার কিছু কিছু জানা বিশেষ আবশ্যক। পরিবারকে সুস্থ রাখিবার জন্য গৃহাদি কিরূপে পরিষ্কার রাখিতে হয়; কিরূপ দ্রব্য ভক্ষণে উপকার হয়; গর্ভাবস্থায় কিরূপ নিয়মে থাকা উচিত; প্রসবের পর কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য এবং সন্তান সন্ততিকে কিরূপে পালন করিতে হয়, এসকল না জানাতে অনেক পরিবারে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

২য়—মনোবিজ্ঞান। জড় বস্তু ভিন্ন সকলকে জ্ঞান পদার্থ বা মন বলা যায়। জড় জগৎ যত বৃহৎ, মনো-

জগৎ তদপেক্ষাও বৃহত্তর। মনুষ্যে ইহার আরম্ভ কিন্তু সেই অনন্ত ঈশ্বরে ইহার শেষ। সুতরাং অনন্ত কাল শিক্ষা করিলেও ইহার শেষ হয় না। এবিষয়ের ৩টি বিদ্যা আছে।

(১) মনোবিদ্যা। এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন "পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ"। বস্তুতঃ সমুদায় জড় জগৎ হইতে মন অসংখ্য গুণে উৎকৃষ্ট। এই মন না থাকিলে বিশ্বের কোন শোভা শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতাম না—কোন বিদ্যারই সৃষ্টি হইত না। এই মন জড় হইতে কিসে বিভিন্ন? ইহাতে কত প্রকার ভাব, চিন্তা ও ইচ্ছা আছে? সেই সকলের সহিত বাহ্য জগতের কিরূপ সম্বন্ধ? মানসিক ক্রিয়াসকল কিরূপ নিয়মে সম্পন্ন হয়? মনোবিদ্যা দ্বারা এ সকল জানা যায়। ইহা ভাল করিয়া জানিলে আপনার মন বশ করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করা যায় এবং অন্য লোকদিগের মনও আপনার আয়ত্ত করা যায়। আমরা যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে চাই তাহাতে মনকে চালনা না করিলে হয় না। সুতরাং মনের তত্ত্ব যত জানা যাইবে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞান ও ক্ষমতারও তত বৃদ্ধি হইবে।

(২) ধর্ম্মনীতি। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে এমন একটি বোধ দিয়াছেন যে তাহার দ্বারা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ন্যায়

অন্যায় সহজে বুঝিতে পারি এবং এমন একটি কর্ত্তৃত্ব শক্তি দিয়াছেন যে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই আপন ইচ্ছায় অবলম্বন করিতে পারি। এই কর্ত্তব্য সাধনই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন এবং তাহাই আমাদের জীবনের সার কার্য্য। তাহা না করিলে পশুতে ও মনুষ্যে অতি অল্প প্রভেদ থাকে। এই কর্ত্তব্য কত প্রকার? কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য সাধনের কিরূপ পুরস্কার এবং লঙ্ঘনের বা কিরূপ দণ্ড? এ সমুদায় ধর্ম্মনীতি হইতে শিক্ষা করা যায়। আমাদের দেশের বিদ্যালয় সকলে যেরূপ অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, ধর্ম্মনীতি সেরূপ শিক্ষা প্রদান না হওয়াতে যে কত কুফল ফলিতেছে তাহা সকলেরই বিদিত আছে। স্ত্রীলোকেরাও ইহার উপদেশ না পাওয়াতে পতি শ্বশুর পুত্র কন্যা ও দাস দাসী আদির প্রতি অনেক স্থলে বিপরীত ব্যবহার করেন। সকল লোকে ধর্ম্মনীতি অনুসারে চলিলে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য হিংসা, বিবাদ কলহ সকলই বিলুপ্ত হয় এবং এই পৃথিবী স্বর্গ লোক হয়।

(৩) পরমার্থ বিদ্যা। ঈশ্বর এবং ধর্ম্মের ভাব আমাদের অন্তরেই আছে তাহা উজ্জ্বল করিবার জন্য শিক্ষার আবশ্যক। ঈশ্বর কি পদার্থ, তাঁহার সহিত জড় জগৎ ও আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, কিরূপে তাঁহার উপাসনা

করা যায়, পাপ পুণ্য ও তাহার দণ্ড পুরস্কার কি? পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়? পরকালে আত্মার গতি কি হইবে? মুক্তি কি? এবং কিরূপে জীবনকে ঈশ্বরের পথে রাখিয়া তাঁহার সহবাসে আত্মাকে কৃতার্থ ও অনন্ত শান্তি সুখ লাভ করা যায়? এই সকল সার-তত্ত্ব পরমার্থ বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে জানা যায়। যিনি একমাত্র পরম সত্য বস্তু, তাঁহাকে জানা অপেক্ষা মনু-ষ্যের শ্রেষ্ঠতর অধিকার আর কি আছে? যে মনুষ্য পবিত্র হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করেন তাঁহারই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, তাঁহার জীবন মধুময় হয়, তাঁহার সুখের সহিত আর কাহারও সুখের তুলনা হয় না।

একটু বেশী লেখা পড়া না জানিলে বিদ্যা বিষয়ে যে সকল কথা বলিতেছি ভাল করিয়া বুঝা যায় না। ইহাতে কি তোমাদের কষ্ট বোধ হইতেছে?

ছাত্রী। যদিও অনেক বিষয় কঠিন কিন্তু এ শুনিতে আমাদের আমোদ হচ্চেছে। আর কত রকম বিদ্যা আছে বল, আমরা সব শুনিতে চাই।

জ্ঞানদা। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ইহাতে যত প্রকার বস্তু আছে তাহাদের জ্ঞান যে সকল বিদ্যাতে পাওয়া যায় এবং আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব যে বিদ্যা

হইতে শিক্ষা করা যায় তাহা বলিয়াছি। এখন সংসারের কাজ কর্ম্মে লাগে এবং মনের সন্তোষ জন্মায় এইরূপ কয়েকটি বিদ্যার উল্লেখ করিব।

(১) রাজনীতি—রাজ্য শাসনের জন্য যে সকল নিয়ম প্রণালী অর্থাৎ আইন চাই—কাহারও প্রতি কেহ কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিলে কিরূপ দণ্ড আবশ্যক—কিরূপ নিয়ম থাকিলে রাজ্যের শান্তি এবং মঙ্গল উন্নতি হয় এসকল রাজনীতি হইতে শিখা যায়। আমাদের দেশের ইংরেজ রাজপুরুষগণ ইহার প্রসাদে কেমন সুখে রাজত্ব করিতেছেন। রাজনীতি ধর্ম্মনীতির অনুযায়ী যত হইবে ততই ইহা দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল হইবে।

(২) বার্ত্তাশাস্ত্র—কিসে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি, ব্যয়ের সুশৃঙ্খলা হয়—কিসে নানা ব্যবসায়ে লোক সকল নিযুক্ত থাকিয়া পরস্পরের সাহায্য এবং আপনাদিগের জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা এই শাস্ত্রে জানা যায়। ইহার মতে চলিলে ঘর সংসার চালাইবার অনেক সুবিধা করা যায়।

(৩) চিকিৎসাবিদ্যা—শারীর বিজ্ঞানে ইহার বিষয় বলা গিয়াছে। কিন্তু সুদ্ধ শরীরের গঠন এবং কার্য্য সকল জানিলে হয় না; রোগ সকলের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং তদনুসারে বিশেষ বিশেষ ঔষধ

পথ্য আদির নিয়ম জানা চাই। বিজ্ঞ চিকিৎসক হইতে হইলে অনেক বস্তুদর্শন আবশ্যক। গর্ভিণী এবং শিশু সন্তান পালন জন্য স্ত্রীলোকদের ইহার কিছু কিছু জানা নিতান্ত আবশ্যক।

(৪) কৃষিবিদ্যা—ভূমির গুণ, তাহা উর্ব্বরা করিবার উপায়, বৃক্ষ আদির স্বভাব এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির কৌশল এই বিদ্যা দ্বারা জানিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ফল শস্য উৎপাদন করা যায়। আমাদের আহার বস্ত্র ইহার উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

(৫) শিল্পাদি বিদ্যা—এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মনোরঞ্জনকর বিদ্যা। গৃহ নির্ম্মাণ, বস্ত্র বয়ন, নানা প্রকার গৃহ সামগ্রী প্রস্তুত করণ, মূর্ত্তি গঠন, সূচিকর্ম্ম, চিত্রকার্য্য সকলই ইহার অন্তর্গত। মেয়েদের ইহার কতক কতক জানা ভাল। তাহা হইলে অনেক সময় কুড়ে হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না—মনও খুসী থাকে এবং তেমন তেমন শিখিতে পারিলে ঘরে বসিয়াই টাকা আনা যায়। অনেক দুঃখী মেয়েমানুষ শিকে বুনে কাটনা কেটে, চুলের দড়ি ভেঙ্গে এবং পাট কেটে রোজকার করে। কিন্তু ইহার চেয়ে ভদ্র কাজ আছে অর্থাৎ জামা সেলাই, ঘুন্‌শী ও কার্‌পেটের জুতা বোনা, নেকড়ার ফুল ও পুতুল করা, বুটি তোলা কাপড় তৈয়ার করা, ভাল ভাল ছাঁচ কাটা ও ছবি আঁকা এ

সকল করিতে কার না আনন্দ হয়? আর ইহাতে বিলক্ষণ দুটাকা লাভও হইতে পারে।

(৬) সঙ্গীত বিদ্যা—এরূপ মনোরম বিদ্যা আর নাই। ইহার যে অদ্ভুত রস, তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয় এবং মন উন্নত ভাবে ও অতুল আনন্দে মগ্ন হয়। গান-বাদ্য আমাদের দেশে অনেক মন্দ বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া এত জঘন্য ও লজ্জাকর বোধ হয়, কিন্তু ভাল বিষয়ের সহিত যোগ করিলে ইহাদ্বারা কত সৎকার্য্যে উৎসাহ দেওয়া যায়—কত শোক তাপের শান্তি হয়—মনুষ্যের মধ্যে কত প্রীতি ও সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় এবং ঘোর পাষণ্ডের মনও ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইয়া অতুল বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে।

এই সকল ভিন্ন নানা ব্যবসায় ঘটিত আরও অনেক বিদ্যা আছে এবং সে সকলও শিক্ষা করা আবশ্যক; যেমন শিক্ষকের কার্য্য, ধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য ইত্যাদি। তা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে অনেক সময় চাই।

ছাত্রীগণ। বিদ্যা যে কত বড় তা এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম। যারা হইার কিছুই জানে না—যথার্থই তারা চখ্ থাকিতে অন্ধ—তারা পশুরই সমান। বিদ্যার পরিচয় শুনিতে শুনিতেই কত আনন্দ হতেছে—না জানি সকল শিখিতে পারিলে কত সুখ পাব,

কিন্তু আবার ভয় হয়! আমরা নির্ব্বোধ, এ কঠিন বিষয় সকল শেখা কি আমাদের কর্ম্ম?

জ্ঞানদা। অমন কথা মনে করিও না, নিরাশ হইও না। প্রথম প্রথম একটা সামান্য বিষয়ও অসাধ্য বোধ হয় কিন্তু ক্রমে সব সহজ হইয়া আইসে। শিশু একটি ভূমিষ্ঠ হইয়া কি এক পাও চলিতে পারে? কিন্তু ক্রমে সেই আবার দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। যে সাঁতার জানে না, তার পক্ষে ইহার মত কঠিন বিষয় আর কিছুই নাই, কিন্তু শিখিতে শিখিতে অতি সহজ বোধ হয়। তোমরা বিদ্যার পথে চলিতে চেষ্টা কর ক্রমে চলা সহজ হইবে।

ছাত্রী। তুমি বলিয়াছিলে যে ভাষা বিদ্যার দ্বারের মত, তা সেই ভাষা শিখিবার উপায় কি?

জ্ঞা। বিদ্যা শিখিতে হইলে ভাষাটা আগে আবশ্যক। ভাষা শিখিতে হইলে সাহিত্য, ব্যাকরণ অলঙ্কার জানিতে হয়।

(১) সাহিত্য—ইহাতে প্রথমে বর্ণ পরিচয় হইয়া ক্রমে পড়িতে শিখা যায় এবং তাহা হইলে পুস্তক সকলে যে নানা প্রকার মনের ভাব-ব্যক্ত করা আছে তাহা বুঝাযায় এবং আপনার মনের ভাব তদনুযায়ী শব্দরচনাদ্বারা ব্যক্ত করা যায়।

(২) ব্যাকরণে ভাষার সূক্ষ্ম নিয়ম সকল জানা যায়,

নতুবা ভাষার মধ্যে একটি শৃঙ্খলা বুঝিতে পারা যায় না এবং লিখন ও পঠন অশুদ্ধ হয়।

(৩) অলঙ্কারে ভাষার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও আর আর গুণ অবগত হওয়া যায়। য ভাব সকল ব্যক্ত করা যায় তাহা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার বিচার করিয়া দেয়। ন্যায়শাস্ত্রও ইহার একটি সহকারী। তাহাতে লেখা যুক্তিসঙ্গত কি অসঙ্গত বলিয়া দেয়।

জ্ঞান সকল শিখিবার জন্য আর একটি বৃহৎ শাস্ত্র। শিখিতে হয় অর্থাৎ গণিত শাস্ত্র।

ছা। তাহা বিশেষ করিয়া বল?

জ্ঞা। গণিত অর্থাৎ অঙ্ক শাস্ত্র। ইহা উত্তম রূপে না জানিলে খগোল, ভূগোল ও বিজ্ঞানের কিছুই ভাল করিয়া বুঝা যায় না। গণিত সকল ব্যবসায় ও সাংসারিক কাজকর্ম্মে অত্যন্ত আবশ্যক এবং ইহা দ্বারা বুদ্ধি বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ হয়। ইহার অনেক শাখা আছে।

(১) পাটীগণিত—ইহা দ্বারা ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা কি রূপে অঙ্কশাস্ত্র হইয়াছে—কিরূপে তাহাদিগের সংযোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ দ্বারা সকল অঙ্ক কসা যায় তাহা শিখা যায়।

(২) বীজগণিত – পাটীগণিতে বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা যে সকল অঙ্ক করিতে হয়, বীজগণিতে সে সকল

এক সঙ্কেতে শিখিবার কৌশল পাওয়া যায় এবং ইহাতে অস্থিত অঙ্ক সকল বাহির করিবার সহজ উপায় শিখা যায়।

(৩) রেখাগণিত—ইহা দ্বারা ভূমি সকলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মাপিয়া কালি করা যায়; এক স্থান হইতে আর এক স্থানের দূর বলিয়া দেওয়া যায়; রেখা সকল অবলম্বন করিয়া ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোল ইত্যাকার নানা প্রকার ক্ষেত্র আঁকা যায় এবং নানা প্রকারে তাহাদের পরিমাণ করা যায়।

গণিত শাস্ত্র যদিও আর আর বিদ্যার সহকারী, কিন্তু ইহাও একটি প্রধান বিদ্যা বলিয়া গণ্য। অতএব ভাষা এবং অঙ্ক আগে শিখিতে হয়।

ছাত্রীগণ। ভাষা এবং অঙ্ক না শিখিলে অন্য উপায়ে কি জ্ঞান পাওয়া যায় না?

জ্ঞানদা। এমন মনে করিও না যে জ্ঞানের আর কোন পথ নাই। লোকের নিকট উপদেশ পাইয়া এবং আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা একেত দুর্ঘট হয় আর তাহাতে সম্যক্ ফল লাভ হইতে পারে না। ভাষা শিখিলে সকল প্রকার পুস্তক পড়িতে পারিবে, সুতরাং অতি অল্প কালের মধ্যে সকল দেশের সকল কালের প্রধান মনুষ্যগণের জ্ঞান অনায়াসে শিখিয়া লইতে পারিবে। আপনি ঘরে

বসিয়া জগতের তাবৎ সংবাদ জানিতে পারিবে।

তোমোদের এখন একটি বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে এবং তাহা আমি পূর্ব্বেও এক প্রকার বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল বাহির হইতে নানা প্রকার জ্ঞানে মনোভাণ্ডারকে পূর্ণ করিলেই বিদ্যার সমুদায় ফল সিদ্ধ হয় না। বিদ্যার আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে অর্থাৎ মনের শক্তি সকলের উন্নতি করা।

ছা। মনের শক্তি সকল আবার উন্নতি করা সে কি?

জ্ঞা। তোমারা জান স্মরণ, বিবেচনা, ধারণা, অভিনিবেশ, সত্য অনুসন্ধান ইত্যাদি শক্তি মনের শক্তি; অল্প হউক বা অধিক হউক তাহা সকলেরই আছে। যত চালনা করা যায় এই সকল বৃদ্ধি পাইয়া ততই প্রখর হয় ক্রমে অধিক স্মরণ, অধিক মনোযোগ, অধিক বিবেচনা ইত্যাদি করিবার ক্ষমতা হয়। অনেকে অগাধ পুস্তক পড়িয়া বাহিরে রাশি রাশি জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু হয়ত সেসকল কেবল কণ্ঠস্থ আছে তাহাতে মনের কিছু উন্নতি হয় নাই। এইরূপ বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব সকলেরও উন্নতি চাই অর্থাৎ দয়া, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা ক্রমশঃ অধিক হইতে থাকিবে।

মনুষ্যের মন অনন্ত উন্নতিশীল অর্থাৎ ইহার উন্নতির কখনই শেষ হইবে না। এই পৃথিবীতে যত দিন আছে নানা প্রকার জ্ঞান, নানা প্রকার শক্তি, নানা প্রকার

ভাবে উন্নত হইতেছে—মৃত্যুর পরেও উন্নতি ক্রমাগত চলিতে থাকিবে আমরা সেই অনন্তজ্ঞান ঈশ্বরের ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সফল করিব।

ছাত্রী ।বিদ্যার তুল্য মহারত্ন আর নাই। ইহা হইতে নানা প্রকার জ্ঞান লাভ হয়, সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করা যায়, মনের কত আনন্দ হয়, আবার মনের নানা প্রকার শক্তি ও ভাব বৃদ্ধি পাইয়া চিরকালের মঙ্গল হয়। আমরা যেরূপে পারি এই বিদ্যারত্ন লাভ করিতে চেস্টা করিব। তুমি কল্যাবধি আমাদিগকে নিয়মিত শিক্ষা দেও। আজি সময় গিয়াছে আমরা বিদায় হই।

জ্ঞা। আচ্ছা, আজি সবে আইস। আমি তোমাদের জন্য এক প্রস্ত পুস্তক সংগ্রহ করি এবং একটি পাঠের প্রণালীও ঠিক করি। তোমরা ঘরে গিয়া আজিকার কথা গুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিও। একটু চেষ্টা করিয়া লাগ ক্রমে সব শিক্ষা করা সহজ হইয়া আসিবে।

বিদ্যা বিভাগ* ।

১ ভাষা শিক্ষা
- সাহিত্য
- ব্যাকরণ
- অলঙ্কার

২ গণিত
- পাটীগণিত
- বীজগণিত
- রেখাগণিত

৩ ইতিহাস বা স্থূলতত্ত্ব

(১) ভূগোল

(২) খগোল

(৩) প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত
- খনিজ বিদ্যা
- উদ্ভিজ্জবিদ্যা
- প্রাণি বিদ্যা

(৪) ইতিহাস

---

* বিদ্যার একটি পরিষ্কার এবং সুনিয়মবদ্ধ বিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। বিদ্যা সকল পরস্পরের সহিত এরূপ জড়িত যে এক হইতে অন্যকে পৃথক্ করা যায় না। এইরূপ ভূগোল, খগোল ও ইতিহাসের সহিত বিজ্ঞান সংযুক্ত থাকে এবং ব্যবসায় ঘটিত বিদ্যা সকলের সহিত জ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা সকল সংশ্লিষ্ট থাকে; যতদূর বিজ্ঞানের অনুযায়ী হয় এবং কার্য্যেতে আসিতে পারে এইরূপ লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা গেল।

(৫) জীবন চরিত

৪ বিজ্ঞান বা সূক্ষ্মতত্ত্ব

(১) প্রাকৃতিক — বাহ্য বিজ্ঞান, রাসায়নিক-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান

(২) মানসিক — মনোবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, পরমার্থবিদ্যা

৫ ব্যবসায়িক ও আমোদপ্রদ বিদ্যা

(১) চিকিৎসা বিদ্যা

(২) কৃষি বিদ্যা

(৩) রাজনীতি

(৪) বার্ত্তা শাস্ত্র

(৫) শিল্পাদি বিদ্যা

(৬) সঙ্গীত বিদ্যা

ভূগোল।

পৃথিবীর আকার।

আমরা এই যে পৃথিবীতে আছি এর আকার কিরূপ, এ কেমন করিয়া আছে, এতে ঈশ্বরের কত প্রকার সৃষ্টি এবং মানুষের কত রকম কাণ্ড কার্‌খানা রহিয়াছে, ভূগোল পাঠ না করিলে সে সকল জানা যায় না। আমাদের দেশের মেয়েমানুষেরা বাড়ীর বাহির হইতে পারে না, কিন্তু ভূগোল পড়িলে তাহারা ঘরে বসিয়াই সমুদায় পৃথিবীর খবর বলিতে পারে। এমন বিদ্যা শিখিতে কাহার না আমোদ হয়?

ভূগোল শিখিতে হইলে প্রথমে পৃথিবীর আকার কিরূপ জানা আবশ্যক। অবোধ লোকে মনে করে যে পৃথিবীর বুঝি কিছু আকার নাই, এর শেষও নাই, যতদূর যাও একটী সীমা পাওয়া যায় না। তারা জানে না বলিয়া এমন কথা কয়। পৃথিবীর যে শেষ আছে তার প্রমাণ দেখ—(১) আমরা প্রতিদিন দেখি সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে গিয়া অস্ত যায়। কিন্তু তার পর একবারে পূর্ব্বদিকে আসিয়া

কেমন করিয়া উদয় হয়? ইহাতে বেশ বোধ হয় পৃথিবীর একটা শেষ আছে তাহাতেই সূর্য্যকে নীচে দিয়া ঘুরিয়া আসিতে দেখা যায়।

(২) মাগেলেন্, ড্রেক্, আন্‌সন্ প্রভৃতি বড় বড় নাবিকেরা এক জায়গা হইতে জাহাজ ছাড়িয়া পৃথিবীর চারিদিক্ ঘুরিয়া আবার সেই থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন এই রূপে অনেকেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। সীমা না থাকিলে পৃথিবীর সব দিক্ ঘুরে আসা যাইত না।

পৃথিবীর যে শেষ আছে বুঝাগেল কিন্তু এর আকার লইয়া অনেকে অনেক রকম অনুমান করে। কেও বলে তিন কোণা, কেও বলে চারি কোণা; কেও বলে ঘরের মেজে বা থালার মত এর উপরি ভাগটা এক সমান। কিন্তু এ সকলের কিছুই ঠিক্ নয়। পৃথিবীর আকার একটি কদমফুল বা কমলা লেবুর ন্যায় গোল। ইহার উপরি ভাগ গোল, নীচে গোল, সব দিক্ গোল। আমাদের দেশের আর্য্যভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত এবং আর আর দেশের বড় বড় লোক ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। পৃথিবীর আকার গোল বলিয়াই, যে শাস্ত্রে ইহার বিবরণ জানা যায় তাহাকে ভূগোল কহে।

আমাদের দেশে পৃথিবীকে তিন কোণা বলে তার কারণ এই; আমরা যে ভারতবর্ষে থাকি তার আকৃতি

এইরূপ। আমরা বাড়ী ঘর উঠান পুকুর চারি কোণা করি তাইতে মনে হয় পৃথিবীও হয়ত চারিকোণা। আর যেমন একটা পিঁপীড়া গোল জালার উপর উঠিয়া মনে করিতে পারে যে সে সমান জায়গায় আছে সেই রূপ আমরা এই বৃহৎ পৃথিবীর একটু জায়গা দেখিয়া মনে করি পৃথিবীর উপরটা সমান।

পৃথিবী যে গোল তার গুটিকত প্রমাণ দেখ—

(১) পূর্ব্বে যে নাবিকদের কথা বলিয়াছি তাহারা বরাবর একমুখে জাহাজ চালাইয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর যদি তিন কোণ বা চারি কোণ থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক কোণে জাহাজের মুখ ফিরাইতে হইত। কিন্তু ইহা গোল বলিয়া সেরূপ করিতে হয় নাই।

(২) আমরা যদি একটা খুব বৃহৎ মাঠের মাঝখানে গিয়া বা উচ্চ ছাদের উপর উঠিয়া পৃথিবীর চারিদিক্ পানে চাই তাহা হইলে সকল দিক্ই গোল দেখিতে পাই। আর কোন রকম আকার হইলে গোল দেখাইবে কেন?

পৃথিবীর উপরি ভাগটা যে থালার মত সমান নয় ইহা সহজে বোধ হয় না, কিন্তু প্রমাণ ভাল করে দেখিলে জলের মত বুঝা যায়।

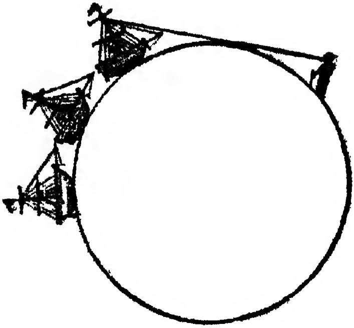

(৩) যখন একখান জাহাজ দূর হইতে তীরের নিকট আইসে আগে তার মাস্তুল দেখা যায়, পরে উপরের খানিক ভাগ, এবং খুব নিকট হইলে তলা অবধি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন তীর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া দেয় ক্রমে যত দূরে যায় নীচের ভাগটা আগে দেখা যায় না, ক্রমে ক্রমে মাস্তুল অবধিও অদৃশ্য হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? পৃথিবীর উপরটা যদি ঘরের মেজের মত সমান হইত তাহা হইলে জাহাজ দূরে গেলেও তার আগা গোড়া সব দেখা যাইত। কিন্তু গোল জমীর একধার হতে অন্য ধার দেখা যায় না, মাঝখানে খানিকটা উঁচু হইয়া চখের আড়াল করে। উপরে যে ছবিটি দেখিতেছ তাহাতে পৃথিবীর একধারে একটী মানুষ দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, জাহাজ অন্যধারে আছে। দেখ মাঝখানে খানিকটা গোলজমী উঁচু হইয়া আছে

বলিয়া জাহাজের সব দেখা যাইতেছে না। জাহাজ আবার যত সরিয়া যাইতেছে আর কিছুই দেখা যায় না।

(৪) আর একটী প্রমাণ দেখ। সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিকে উদয় হয় পৃথিবীর সকল জায়গায় এককালে আলো পড়ে না। পূর্ব্বদেশ-সকলে প্রভাত আগে হয় ক্রমে ক্রমে পশ্চিম দেশ-সকলে বিলম্ব হইয়া পড়ে। এই জন্য আমাদের দেশে যখন দুপর বেলা বিলাতে রাত্রি পোহায়। পৃথিবীর উপরিভাগটা গোল বলিয়া এক ধারে আলো পড়িলে মাঝখানে খানিকটা উঁচু হইয়া আড়াল করে, কাজে কাজেই সে আলো অন্যদিকে যাইতে পারে না। একটা প্রদীপের কাছে একটা গোল জিনিস ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।

(৫) রাত্রিকালে আকাশ যখন নক্ষত্রে পূর্ণ থাকে, আমরা যদি দক্ষিণ দিক্ হইতে ক্রমাগত উত্তর মুখে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই উত্তর দিকে যে সকল তারা মাটীতে ঠেকিয়াছিল ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতেছে আর দক্ষিণের তারা সকল নামিয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর উপরটা গোল বা গড়ানে বলিয়া আমরা উঠি ও নামি, তাহাতে তারাসকলের উঠা নামা বোধ হয়।

(৬) যখন চন্দ্র গ্রহণ হয় সূর্য্য একদিকে থাকে চন্দ্র আর এক দিকে থাকে পৃথিবী দুয়ের মাঝখানে আইসে।

ইহাতে পৃথিবীর ছায়া ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলে। এই ছায়াটি ঠিক্ গোল এজন্য সকল সময়েই গোল দেখা যায়; কোন বস্তু ঠিক্ গোল না হইলে তাহার ছায়া সকল সময়ে ঠিক্ গোল হইতে পারে না। দেখ পৃথিবী যদি থালার মত চাপ্‌টা হইত তাহা হইলে থালা যেমন আড় করিয়া ধরিলে তার ছায়া রেখার মত পড়ে পৃথিবীর ছায়াটা কখন না কখন রেখার মত দেখা যাইত। রাহু নামে এক দৈত্য চন্দ্রকে গিলিতে আইসে তাহাতে তাহার গ্রহণ হয় এ কল্পনা মাত্র পরে বুঝিতে পারিবে।

পৃথিবী যে গোল তার আরও অনেক প্রমাণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্র ভাল করিয়া না জানিলে তা বুঝা যায় না। বেশী বেশী প্রমাণের আর দরকারই বা কি? এই কয়টি ভাল করিয়া বুঝিলেই হয়।

এই পৃথিবী গোলাকার বটে কিন্তু সবদিকে সমান গোল নয়। যেমন কমলালেবুর দুদিক্ চাপ্‌টা ইহার দক্ষিণ ও উত্তর দিক দুটী একটু চাপ্‌টা। অনেকে বলিতে পারে যে পৃথিবীতে কত গভীর সাগর ও উচ্চ গাছ পাহাড় রহিয়াছে তবে ইহাকে গোলাকার কিরূপে বলা যায়? কিন্তু যেমন কদমফুলের গায় ছোট বড় কেশর ও ঠাঁই ঠাঁই ছিদ্র থাকিলেও তাহাতে বড় না, পৃথিবী

বৃহৎ অতএব তার পক্ষে পাহাড় ও সাগর একটু আধটু উঁচু নীচু, তাতে তার গোলাকার যায় না।

পৃথিবীর পরিমাণ ও স্থিতির বিষয়।

পৃথিবী একটী কদমফুল বা কমলা লেবুর ন্যায় গোলাকার, প্রমাণ হইয়াছে ; ইহা কত বড় এখন জানা আবশ্যক। একগাছা রজ্জু দ্বারা যদি পৃথিবীর চারিদিক্ বেষ্টন করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ প্রায় ১১,০০০ এগার হাজার ক্রোশ হয় ; ইহাকে পৃথিবীর পরিধি বা বেড় কহে। আর মনে কর যদি পৃথিবীর একধারে একটি ছিদ্র করিয়া ঠিক্ মাঝখান দিয়া অপর ধার পর্য্যন্ত এক শলাকা বিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ প্রায় ৩,৫০০ সাড়ে তিন হাজার ক্রোশ হয় ; ইহাকে পৃথিবীর ব্যাস কহে।

পৃথিবী কেমন করিয়া আছে ? এবিষয়ে আমাদের পুরাণে একটি আশ্চর্য্য কল্পনা দেখা যায় ; অবোধ লোকে তাতেই বিশ্বাস করিয়া থাকে। পুরাণে বলে বাসুকি বলিয়া এক সর্প সহস্র ফণাতে পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বলে যে, বাসুকির উপর কচ্ছপ, সেই কচ্ছপের উপর হস্তী এবং হস্তীর পৃষ্ঠে পৃথিবী

আছে। কিন্তু এখানে কি জিজ্ঞাসা করা যায় না, যে সেই বাসুকি কিসের উপরে আছে? বাসুকির নীচে আর একটা, তার নীচে আর একটা, এইরূপ ক্রমাগত না থাকিলে আর চলে না। কিন্তু সবশেষে কে থাকিবে? অতএব পুরাণের কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? আর এখন ইংরাজ ও আর আর জাতি পৃথিবীর প্রায় সবদিক্ ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে তাহারাত কোনদিকে কিছুই দেখিতে পায় না। ফলতঃ পৃথিবী কিছুরই উপর নাই, শূন্যে আছে; ইহার চারিদিকে আকাশ। একটি কদমফুলের চারিধারে যেমন কেশর থাকে ইহার চারিধারে পর্ব্বত, সাগর, বৃক্ষ পশুপক্ষী মনুষ্য, সকলেই রহিয়াছে। আর্য্যভট্ট প্রভৃতি এদেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতেরাও ঠিক্ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা দেখি শূন্যে কোন বস্তু রাখিলে পৃথিবীর দিকে পড়িয়া যায়। তাহার কারণ এই যে পৃথিবীর একটি আকর্ষণ শক্তি আছে তাহাতে সকল বস্তুকে টানিয়া লয়; যেমন চুম্বক পাথর লোহকে আকর্ষণ করে। যদি আকর্ষণ না থাকে তবে সব বস্তু শূন্যে থাকিতে পারে। আমাদের বিপরীত বা উল্টা দিকে যে সব মানুষাদি আছে, আমরা বলি তাদের মাথা নীচের দিকে আছে তারা কেমন করিয়া থাকে? কিন্তু তারাও আমাদিগের প্রতি সেইরূপ

বলিতে পারে। আমাদের যেমন, সেইরূপ তাদের ও মাথার দিকে আকাশ। সেদিক আমাদের মতে নীচে কিন্তু তারা উপর বলিয়া দেখিতে পায়। ফলতঃ পৃথিবীর সব দিকই একরূপ; ইহার নীচে উপর নাই। পৃথিবীর টানে যেমন আমরা আছি তারাও ঠিক্ সেইরূপ আছে, আকাশের দিকে কেহই পড়িয়া বা উঠিয়া যাইতে পারে না।

পৃথিবীর গতি।

পৃথিবী গোলাকার ও শূন্যে আছে ইহার কোন দিকে কিছু ঠেকা নাই। কিন্তু ইহা কি এক স্থানে স্থির হইয়া আছে? আমাদের এইরূপ বোধ হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। আমরা দেখি প্রতি দিন সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমে যাইতেছে, আবার অন্য দিক্ দিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে তাহাতেই দিবা রাত্রি হয় সেটিও আমাদের দেখিবার ভুল। সূর্য্য এক স্থানে আছে, পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আপনা আপনি ঘুরিতেছে তাহাতেই দিবা রাত্রি হইতেছে। যেমন একটা প্রদীপের সম্মুখে একটা গোল বস্তু ধরিলে তাহার একদিকে আলোক পড়ে, অন্য দিকে অন্ধকার। আবার ঘুরাইয়া দিলে আলোকের দিক্ অন্ধকারময় এবং অন্ধ-

কারের দিক্ আলোকময় হয়। সেইরূপ পৃথিবীর যে ভাগ যখন সূর্য্যের দিকে ফিরে তাহাতে তখন আলোক পড়িয়া দিবা হয়; অন্য দিকে রাত্রি হয়।

আমরা পৃথিবীকে স্থির থাকিতে আর সূর্য্যকে যে ঘুরিতে দেখি এ কিছু আশ্চর্য্য নয়। এক খান গাড়ী কিম্বা নৌকাতে চড়িয়া যখন দ্রুত বেগে চলা যায়, তখন বোধ হয় গাড়ী বা নৌকা যেন স্থির আছে—আর উভয় পার্শ্বের বৃক্ষ ও গৃহাদি উল্টা দিকে চলিয়া যাইতেছে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে দ্রুত বেগে ভ্রমণ করিতেছে ইহাতেই বোধ হয় যেন সূর্য্য উল্টা দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিতেছে। পৃথিবীর তুলনায় আমরা রেণুর ন্যায় ক্ষুদ্র, এজন্য ইহার চলাতে আমাদের চলা বোধ হয় না। একটা বৃহৎ জালার উপর একটি পিপীলিকা রাখিয়া ঘুরাইলে বোধ হয় সে কিছুই টের পায় না।

পৃথিবীর দুই প্রকার গতি—আহ্নিক ও বার্ষিক। একটা ভাটা উপর দিকে ছুড়িলে অথবা একটা চাকা গড়াইয়া দিলে যেমন তাহা এক গতিতে আপনাপনি ঘুরে আর এক গতিতে দূরে যায়। পৃথিবী আহ্নিক গতিতে ২৪ ঘন্টায় একবার আপনাপনি ঘুরে ইহাতে দিবা রাত্রি হয়। বার্ষিক গতিতে ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড ৩১ পলে ইহা একবার সূর্য্যের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ

করিয়া আইসে তাহাতে বৎসর হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত যে ছয় ঋতু হয় এই পৃথিবীর গতিই তাহার কারণ।

গোলকের বিষয়।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, পৃথিবীর দুইদিক কিছু চাপা অর্থাৎ নীচু। বাস্তবিক ইহার উত্তর দক্ষিণ ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন। এই দুই নিম্নস্থলের ঠিক্ মাঝখানের নাম মেরু।

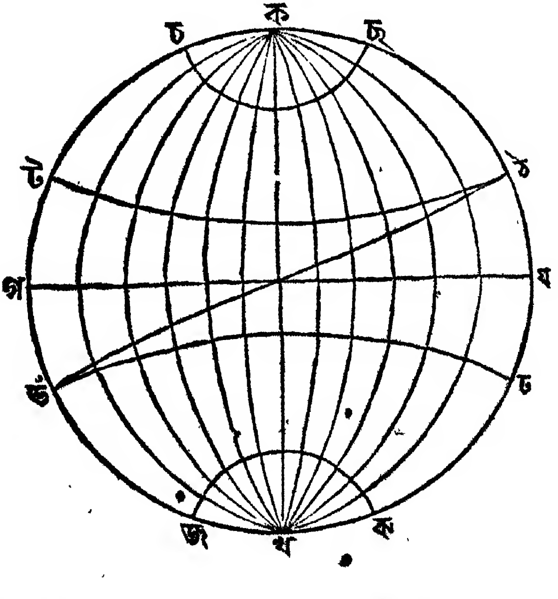

এই ছবিতে
ক—সুমেরু
খ—কুমেরু
কখ—মেরুদণ্ড

গঘ—বিষুবরেখা
চছ—সুমেরু বৃত্ত
জঝ—কুমেরু বৃত্ত
টঠ—কর্কট বৃত্ত
ডঢ—মকর বৃত্ত
কগখঘ—এক দ্রাঘিমা বৃত্ত

উত্তর মেরুকে সুমেরু (ক) এবং দক্ষিণ মেরুকে কুমেরু (খ) কহে। আহ্নিক গতির সময় যখন পৃথিবী আপনা-পনি ঘুরে, এই দুই মেরু তখন স্থির থাকে। মনে কর একটি সরলরেখা (সোজাকসি) পৃথিবী ভেদ করিয়া ও তাহার মধ্যস্থল দিয়া ক হইতে খ পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই কল্পিত রেখার নাম মেরুদণ্ড (কখ)। আহ্নিক গতির সময় পৃথিবী যেন ইহারই উপর ঘুরিতে থাকে; সুতরাং ইহা স্থির থাকে।

ভূচিত্র অর্থাৎ পৃথিবীর অথবা ইহার দেশ সমূহের ছবি যথার্থ দেশ সমূহ হইতে অসংখ্য গুণে ছোট। অত-এব পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য পৃথিবীর উপর অনেক রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। এই রেখাগণের সাহায্যে কোন দেশের পরিমাণ, বা একস্থান হইতে আর এক স্থানের দূরতা, জানা যায়।

একটি আলু সমান-পুরু চাকা চাকা করিরা কাটিয়া ফের জোড়। তাহা হইলে উহার উপর কাটা দাগগুলি গোল রেখার ন্যায় দেখিতে পাইবে। পৃথিবীর উপর পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপ্ত এইরূপ অনেক গোল রেখা (বৃত্ত) কল্পনা করা যায়। ইহাদের নাম অক্ষবৃত্ত, যথা কখ, গঘ, চছ,

ইত্যাদি এক একটি অক্ষবৃত্ত। পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা যায়; ইহার এক এক ভাগকে অংশ কহে*। ভূচিত্রে প্রতি অক্ষবৃত্তের পার্শ্বে ১ অংশ ১০ অংশ এই রূপ অংশের নির্দ্দেশ থাকে; তাহার অর্থ এই যে, যে সকল স্থান সেই রেখার উপর তাহারা সকলে ৩০ ক্রোশ দূরে, ৩০০ ক্রোশ দূরে ইত্যাদি। কিন্তু কোথা হইতে ৩০ ক্রোশ দূর? তাহা ক্রমে বলা যাইতেছে।

পৃথিবীর ছবির ঠিক্‌ মধ্যস্থলে পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপ্ত যে অক্ষবৃত্তটি (গ ঘ) দেখিতেছ, উহা দুই মেরু হইতে ঠিক্‌ সমান দূরে আছে। ইহা পৃথিবীকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; ইহার উত্তর ভাগকে উত্তর গোলার্দ্ধ এবং দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ কহে। অনেক সুবিধার জন্য এই রেখা হইতে অক্ষাংশ অর্থাৎ অক্ষবৃত্তের অংশ গণা যায়। যথা, যে সকল স্থান এই রেখার এক অংশ উত্তর বা দক্ষিণ, তাহারা এক অক্ষাংশক অক্ষবৃত্তের উপরিস্থ। এইরূপ যখন বলা যাইবে কলিকাতা নগরের অক্ষাংশ উত্তর সাড়ে বাইশ অংশ তখন এই বুঝাবে যে কলিকাতা এই এই রেখা (গ ঘ)

---

* পৃথিবীর পরিধি ১০৮০০ ক্রোশ, সুতরাং এক অংশ প্রায় ৩০ ক্রোশ। যথা ১ অংশ ৫ অংশ, এক অংশ অর্থাৎ ৩০ ক্রোশ, ৫ অংশ অর্থাৎ ১৫০ ক্রোশ, ইত্যাদি বুঝায়। সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত পৃথিবীর অর্দ্ধেক পরিধি আছে; সুতরাং ১৮০ অক্ষাংশ অথবা প্রায় ৫৪০০ ক্রোশ।

হইতে প্রায় ৬৭৫ ক্রোশ উত্তর; এবং লণ্ডন উত্তর সাড়ে একান্ন অংশ অর্থাৎ প্রায় ১৫৪৫ ক্রোশ উত্তরে। অতএব কলিকাতা হইতে লণ্ডন নগর প্রায় ৮৭০ ক্রোশ উত্তর। কিন্তু যে স্থান ঠিক্ এই গঘ রেখার উপরে আছে তাহার অক্ষাংশ কত? ১ অংশ নহে, কারণ তাহা হইলে ৩০ ক্রোশ দূরে হইবেক; শূন্য অংশ অর্থাৎ মোটে দূরে নয়। অতএব এই রেখাকে নিরক্ষ-বৃত্ত* কহে। ইহা হইতে সকল অক্ষাংশ গণনা করা যায়। ইহার উত্তর ৯০ অংশ এবং দক্ষিণ ৯০ অংশ আছে। ইহার আর একটি নাম বিষুবরেখা।

অক্ষবৃত্তের দ্বারা সুধু উত্তর দক্ষিণের মাপ জানা যায়, পূর্ব্ব পশ্চিম মাপা যায় না। এই নিমিত্ত আর এক রকম রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। একটি কমলা-লেবু ছাড়াইলে তাহার কোযার মধ্যে এক এক উপর নীচে ব্যাপ্ত অর্দ্ধেক গোলরেখা দেখিবে, এবং যদি সমান কোযা ওয়ালা হয় তাহা হইলে অর্দ্ধেক করিতে গেলে এইরূপ দুই ভাঁজে ভাগ হয়। অতএব প্রতি ভাঁজ ও তাহার ঠিক বিপরীত ভাঁজে একটি গোল রেখা হয়। পৃথিবীর উপর উত্তর দক্ষিণে ব্যাপ্ত এবং মেরুদ্বয় ভেদ

---

* নিরক্ষবৃত্ত এবং তাহার নিকটস্থ স্থানে প্রায় সম্বৎসর সমান দিন রাত্রি হয়, এই জন্য ইহাকে বিষুবরেখা কহে। এই নামটি বেশী চলিত।

করিয়া এইরূপ অনেক গোল রেখা কল্পনা করা যায়। ইহাদের নাম দ্রাঘিমারৃত্ত। পৃথিবীর ছবিতে অক্ষ-রৃত্তের যে রূপ অর্দ্ধেক মাত্র দেখা যায় অপর অর্দ্ধেক ও পিঠে ঢাকা থাকে, দ্রাঘিমারৃত্তের সেইরূপ ক হইতে খ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক মাত্র দেখিবে। একটি সম্পূর্ণ দ্রাঘিমারৃত্ত পৃথিবীকে ঠিক্ সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে; যথা (কগ খঘ) একটি দ্রাঘিমারৃত্ত দ্বারা পৃথিবী দুই ভাগ করা হইয়াছে এবং তাহারই এক গোলার্দ্ধ ছবিতে দেখি-তেছ।

বিষুবরেখা পৃথিবীর পরিধির ঠিকু সমান, সুতরাং ১১০০০ ক্রোশ এবং তাহার ৩৬০ ভাগ প্রায় ৩০ ক্রোশ: অতএব এখানকার দ্রাঘিমাংশ প্রায় ৩০ ক্রোশ। কিন্তু অন্যান্য অক্ষরৃত্ত এই রেখা হইতে ছোট, সুতরাং তথাকার দ্রাঘিমাংশ অল্প। বাস্তবিক দ্রাঘিমাংশ অক্ষাংশের ন্যায় পৃথিবীর সকল স্থানে সমান নহে। কিন্তু কমলালেবুর কোষায় মধ্যখান অপেক্ষা, দুই ধার যেরূপ সরু, দ্রাঘিমাংশও, যত বিষুবরেখা হইতে মেরুর-দিগে যায়, তত অপ্রশস্ত হইতে থাকে। ভূচিত্রে পরি-মাণ নির্দ্দেশের জন্য ও এক শূন্যাংশ দ্রাঘিমা কল্পনা করিতে হয়। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভূচিত্রে গ্রিনিচ্*

---

* গ্রিনিচ্ নগর লণ্ডনের প্রায় দুই ক্রোশ মাত্র পূর্ব্বে। ইহাতে

নগরের উপরিস্থ দ্রাঘিমাকে শূন্যাংশ জ্ঞান করে। এই রেখা হইতে ইহার পূর্ব্ব বা পশ্চিমস্থ তাবৎ দ্রাঘিমাংশ গণনা করা হয়। যথা কলিকাতার দ্রাঘিমাংশ পূ. ৮৮৷০ অংশ অর্থাৎ ইহা গ্রিনিচ্ হইতে প্রায় ২৬৫০ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং লণ্ডন পশ্চিমে অর্থাৎ এক অংশের দ্বাদশ ভাগ গ্রিনিচ্ হইতে ২৷৷০ ক্রোশ পশ্চিমে। সুতরাং লণ্ডন, কলিকাতা হইতে প্রায় ২৬৫২ ক্রোশ পশ্চিমে, এবং অক্ষবৃত্তের স্থানে বলা গিয়াছে উহা কলিকাতা হইতে ৮৭০ ক্রোশ উত্তর; অতএব কলিকাতা হইতে লণ্ডনের দূরতা অনায়াসে জানা যায়। এইরূপ পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ তাবৎ স্থানের পরিমাণ, এই দ্রাঘিমা ও অক্ষবৃত্ত স্বরূপ কল্পিত রেখাগুলি দ্বারা সম্পন্ন হয়। গ্রিনিচের পশ্চিম ২০ দ্রাঘিমাংশক, অথবা উহার পূর্ব্ব ১৬০ দ্রাঘিমাংশক বৃত্ত পৃথিবীকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যে দিকে গ্রিনিচ্ আছে তাহাকে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ এবং অপরদিককে পশ্চিম গোলার্দ্ধ কহে। পৃথিবীর ছবি আঁকিতে গেলে সচরাচর এই দুই গোলার্দ্ধের প্রতিকৃতি দেখান হয়।

সুমেরুর ২৩৷৷ অক্ষাংশ দক্ষিণে যে অক্ষবৃত্তটি (চ ছ) দেখিতেছ উহার নাম সুমেরুবৃত্ত, এবং ঐ রূপ কুমে-

---

ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মানমন্দির আছে। মানমন্দির—অর্থাৎ যে স্থল হইতে এইরূপ পরিমাণাদি হয়।

কর ২৩॥০ অংশ উত্তর জ ছ রেখাকে কুমেরু বৃত্ত কহে। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ২৩॥০ অংশ দূরে যে দুটি অক্ষবৃত্ত দেখিতেছ উহাদিগকে অয়নান্তবৃত্ত কহে। উত্তরায়ণান্ত বৃত্তকে কর্কট বৃত্ত (ট ঠ) এবং দক্ষিণায়নান্ত বৃত্তকে মকর বৃত্ত (ড ঢ) কহে।

এই কয় প্রধান অক্ষবৃত্ত দ্বারা পৃথিবী পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; এক এক ভাগকে কটিবন্ধন* বা মণ্ডল কহা যায়। সুমেরু হইতে সুমেরুবৃত্ত পর্য্যন্ত স্থানকে উত্তর হিমমণ্ডল এবং কুমেরু ও কুমেরুবৃত্ত মধ্যস্থ স্থানকে দক্ষিণ হিমমণ্ডল কহে। মেরু সন্নিহিত দেশে অত্যন্ত শীত, এজন্য তাহাকে হিমমণ্ডল † কহা যায়। বিষুব রেখার দুই পার্শ্বে অয়নান্তবৃত্ত দ্বয়ের মধ্যস্থ স্থান, প্রায় সর্ব্বদাই সূর্য্যের সম্মুখে থাকে, এস্থলে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, এজন্য ইহাকে গ্রীষ্ম মণ্ডল কহে। কর্কটবৃত্ত ও সুমেরু-বৃত্তের মধ্যস্থিত ৪৩ অক্ষাংশ ব্যাপ্ত স্থানকে উত্তর সমমণ্ডল এবং ঐরূপ কুমেরুবৃত্ত ও মকর বৃত্তের মধ্যস্থ স্থানকে দক্ষিণ সম মণ্ডল কহা যায়। সম মণ্ডলে শীত গ্রীষ্ম সমান।

---

* কটিবন্ধ অর্থাৎ কোমরবন্দ—এই মণ্ডল গুলি যেন পৃথিবীর কোমরকে চেটাল পেটির ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে।

† পৃথিবীতে হিমমণ্ডল ৪৭ অক্ষাংশ ও গ্রীষ্মমণ্ডল ৪৭ অক্ষাংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু সমমণ্ডল ৮৬ অক্ষাংশ ব্যাপ্ত।

কলিকাতার প্রায় ১ অংশ অর্থাৎ ৩০ ক্রোশ উত্তরে কর্কট বৃত্তের স্থান নিরূপণ হয়। এজন্য ইহা গ্রীষ্ম মণ্ডলে স্থিত। ইংলণ্ড উত্তর সম মণ্ডলে আছে।

(ট চ) রেখাটি সূর্য্যের পথের চিহ্ন; ইহা পরে বুঝিবে)।

সূর্য্যের আকর্ষণ ও পৃথিবীর কক্ষ।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে চাকা যেরূপে গড়াইয়া যায় পৃথিবী, আহ্নিক গতিতে স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর সেই-রূপ ঘুরিতে ঘুরিতে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু চাকা কিম্বা ভাঁটা যেরূপ বরাবর সোজা চলিয়া যায়, পৃথিবী তাহা না করিয়া এক গোলাকার পথ ধরিয়া ঘোরে। ইহার কারণ এই যে সূর্য্য ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অর্থাৎ টানিতেছে। সুতরাং যেরূপ কলুর ঘানিসংলগ্ন গরুদ্বয় সোজা চলিতে চায়, কিন্তু ঘানিতে বাঁধা আছে বলিয়া তাহাকে কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ পৃথিবীও আহ্নিক গতিতে সোজা চলিতে যায় কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণ জন্য তাহাকে প্রদক্ষিণ করে।

কিন্তু কি জন্য সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। তোমরা সকলেই জান কোন বস্তু শূন্যে রাখিলে ভূমিতে

পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি? জগদীশ্বর তাবৎ জড়পদার্থকে এক গুণ দিয়াছেন যাহাতে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই গুণকে আকর্ষণ-শক্তি কহে। একপাত্র জলের উপর দুই খণ্ড শোলা ভাসাইলে বা দুইটি বুদ্ বুদ্ করিলে দেখিবে যে তাহারা অল্পক্ষণ মধ্যেই একত্র হইবে, ইহার কারণ কেবল পরস্পরের আকর্ষণ মাত্র। যে বস্তু যত বড় তাহার আকর্ষণ শক্তি তত অধিক। পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তু অপেক্ষা পৃথিবী অনেক বড়, এজন্য তাবৎ বস্তুই পৃথিবীকে টানিতে না পারিয়া, উহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহাতে সংলগ্ন হয়। এই জন্যই তাবৎ বস্তু পড়িয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে সংলগ্ন হয়। পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকল শূন্যে রহিয়াছে; এবং এই আকর্ষণ-শক্তি প্রযুক্ত তাহারা পরস্পর টানাটানি করিতেছে। কিন্তু সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ বড় সুতরাং সূর্য্যের আকর্ষণ বেশী, এই নিমিত্তই পৃথিবীর গতি সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

এখন তোমরা বলিতে পার যে যদি সূর্য্য এত বড়, তবে ছোট দেখায় কেন? তাহার উত্তর এই ইহা অত্যন্ত দূরে রহিয়াছে। দেখ শকুনিগণকে নিকটে দেখিলে প্রায় কুকুরের ন্যায় বড় দেখায় কিন্তু যখন তাহারা উচ্চে উড়ে তখন প্রায় চড়ুই পক্ষীর ন্যায়

ছোট দেখায়। আবার যদি বল সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় সুতরাং ইহার আকর্ষণশক্তি পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক; তবে পৃথিবীস্থ দ্রব্য সমুদায় শূন্যে স্থাপিত হইলে সূর্য্যের দিকে না গিয়া পৃথিবীর উপর পড়ে কেন? তাহারও উত্তর সূর্য্য অত্যন্ত দূরে আছে—এমন কি ইহা প্রায় ৪৫ লক্ষ ক্রোশ দূরে রহিয়াছে। এবং যে বস্তু যত দূরে থাকে তাহার আকর্ষণশক্তি তত কম হয়।

যাহাহউক, পৃথিবী আহ্নিক গতি এবং সূর্য্যের আকর্ষণের দ্বারা যে গোলাকার পথ ধরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা ঠিক্ গোল নয় প্রায় একটি ডিম্বের ন্যায় এক দিগে লম্বা। এবং সূর্য্য ঠিক্ মধ্যস্থলে না থাকিয়া এক ধারে ঘেঁসা থাকে। এই পথের নাম পৃথিবীর কক্ষ। বার্ষিক গতিতে পৃথিবী এই কক্ষ দিয়া চলে এবং এক বৎসরে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আইসে।

ঋতুভেদ।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি দ্বারা যেমন দিবা রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে, বার্ষিক গতি দ্বারা সেইরূপ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই ছয়টি ঋতুর সঞ্চার হইতেছে। সংলগ্ন ছবিতে গোলরেখাটি পৃথিবীর কক্ষ;

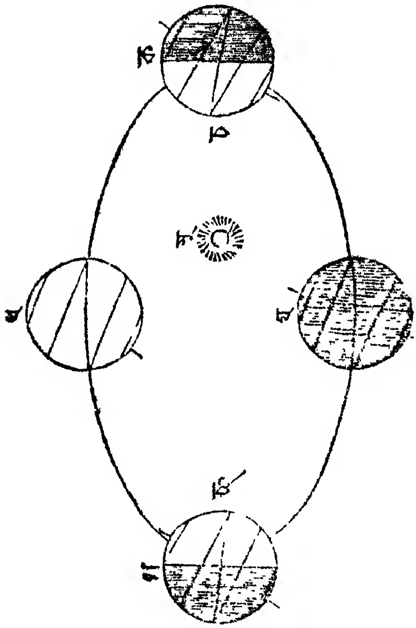

সু—সূর্য্য তাহার চারিদিকে কখগঘ পৃথিবী একএক সময়ে আসিয়া একটি গোলাকার পথ প্রস্তুত করিয়াছে এই পথটি পৃথিবীর কক্ষ। পৃথিবীর উপর ও নীচের দিকে যে একটু একটু রেখা দেখা যাইতেছে, ইহা পৃথিবী আহ্নিক গতিতে যে মেরুদণ্ডে ঘুরিতেছে তাহারই উত্তর ও দক্ষিণ

এখন দেখ পৃথিবী যখন ক চিহ্নিত স্থানে আসিয়াছে তখন সুর্য্যের কিরণ ঠিক্ সোজা হইয়া বিষুবরেখায় পড়ে নাই কিন্তু তাহার একটু দক্ষিণে পড়িয়াছে এই জন্য দক্ষিণ গোলার্দ্ধে যত আলো পাইয়াছে উত্তর গোলার্দ্ধে তত পায় নাই। আমরা উত্তর গোলার্দ্ধে বাসকরি, সূর্য্য এসময় আমাদিগের দিকে অন্য সময় অপেক্ষা অল্প ক্ষণ থাকে এবং তাহার কিরণ বক্রভাবে পড়ে, এজন্য তাহার তেজ থাকে না সুতরাং শীত উপস্থিত হয়। সূর্য্যকে এসময় ঠিক্ মাথার উপর কখনই দেখা যায় না। যাহারা উত্তর হিমমণ্ডলে বাস করে তাহারা এসময় সুর্য্যকে মূলেই দেখিতে পায় না; ক্রমাগত রাত্রি ও দারুণ শীত ভোগ করে। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সূর্য্য অনেকক্ষণ ধরিয়া সরল-ভাবে কিরণ নিক্ষেপ করে এজন্য সেখানে গ্রীষ্ম হয়। দক্ষিণ হিমমণ্ডলের লোকেরা রাত্রি পায় না, ক্রমাগত দিনের আলোকে থাকে এই সময় সূর্য্য দুই মুখ। এই মেরুদণ্ড ঠিক্ সোজা না থাকিয়া বক্রভাবে আছে। পৃথিবীর মাঝখানের গোল রেখা বিষুবরেখা। পৃথিবীর দক্ষিণদিক্ ঘেঁসা থাকে, এজন্য তাহার দক্ষিণায়ন কহে।

যখন পৃথিবী গ চিহ্নিত স্থানে আইসে তখন, যাহা বলা গেল ঠিক্ তাহার বিপরীত ঘটে। এসময়ে সূর্য্যের কিরণ বিষুবরেখা হইতে আরও উত্তরে গিয়া সোজারূপে

পড়ে এজন্য উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে শীত হয়। এসময়ে সূর্য্য উত্তর দিক্ ঘেঁসা থাকে বলিয়া তাহাকে উত্তরায়ণ বলে এবং উত্তর গোলার্দ্ধে দিন বড় রাত্রি ছোট হয়; দুই প্রহরের সময় সুর্য্যকে ঠিক্ আমাদের মস্তকের উপর দেখা যায়। শীতকালে সুর্য্য যদিও আমাদিগের নিকটে থাকে কিন্তু তাহার কিরণ বক্রভাবে আসিয়া অনেক দূর ছড়াইয়া পড়ে সুতরাং তাহার তেজ থাকে না। কিন্তু গ্রীষ্ম কালে সুর্য্য দূরে থাকিলেও ঠিক্ সরল-ভাবে কিরণ বর্ষণ করে এজন্য তাহা অল্পস্থানে একত্রিত হইয়া দারুণ গ্রীষ্ম উৎপাদন করে। দেখ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য এক পাশ হইয়া থাকে বলিয়া তাহার কিরণ নিতান্ত হেলিয়া পড়ে; তাহাতে অতি অল্প উত্তাপ বোধ হয়; কিন্তু মধ্যাহ্ন-ক লে কিরণ যত সোজা হইয়া পড়িতে থাকে, সুর্য্যকে ততই প্রচণ্ড বোধ হয়।

পৃথিবী যখন ক চিহ্নিত স্থান হইতে ঘুরিয়া খ চিহ্নিত স্থানে যায় তখন সুর্য্যের কিরণ ঠিক্ সোজারূপে বিষুবরেখার উপর পড়ে; সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধের ‍াধাআধি ঠিক এককালে কিরণ পায়। এই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই দিন রাত্রি সমান হয় এবং দুই গোলার্দ্ধের অধিকাংশ স্থানেই সুখের বসন্ত কাল সমাগত হয়।

পৃথিবী আবার যখন গ হইতে ঘুরিয়া ঘ চিহ্নিত স্থানে আইসে, তখনও সূর্য্য ঠিক্ বিষুবরেখায় সরলভাবে কিরণ পাত করে। এসময়ে শরৎকাল হয়। বসন্তের ন্যায় এখনও পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে দিনরাত্রি সমান। এইজন্য বৎসরের মধ্যে ১১ ই চৈত্র ও ১১ ই আশ্বিন দিন রাত্রি সর্ব্বত্র সমান হয়। বসন্ত ও শরৎ একই রূপ; কেবল যখন শীতভোগ করিয়া গ্রীষ্মাভিমুখে যাই তখন বসন্তএবং যখন দারুণ গ্রীষ্ম হ তে শী.তর দিকে আসিতে থাকি তখন শরৎকাল অনুভব হয়।

সূর্য্য প্রায় বিষুবরেখার সম্মুখে চিরকালই থাকে, উত্তরায়ণের সময় উত্তরে বিষুবরেখা হইতে কর্কটবৃত্ত পর্য্যন্ত ২৩৷৷০ অংশ এবং দক্ষিণায়ণের সময় দক্ষিণে বিষুবরেখা হইতে মকরবৃত্ত পর্য্যন্ত ২৩৷৷০ অংশ যায়; এজন্য গ্রীষ্মমণ্ডলে যাহারা বাস করে তাহাদের প্রায় সমস্ত বৎসরই গ্রীষ্মকাল এবং দিন রাত্রি সমান। যাহারা সমমণ্ডলে বাস করে তাহারা প্রায় সকল ঋতুই বিশেষরূপে ভোগ করে এবং সময় সময় দিন রাত্রি ছোট বড় দেখে। এবং যাহারা গোলার্দ্ধের প্রান্তভাগে অর্থাৎ হিমমণ্ডলে থাকে তাহারা প্রায় চিরকাল শীত ভোগ করে এবং গ্রীষ্মের মুখ অতি অল্পকাল দেখিতে পায়। তাহাদের দেশে ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি এবং ছয়মাস ক্রমাগত দিন হয়।

এখন তোমরা বলিতে পার যে কিরূপে ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি এবং ছয় মাস ক্রমাগত দিন হয়? মনে কর একটা বড় ভাঁটার উপরদিকে যদি একটি প্রদীপ রাখা যায়, তাহা হইলে, সেই ভাঁটার উপর দিকটি ক্রমাগত আলো পায়; এবং আবার যদি প্রদীপটিকে ক্রমাগত ভাঁটার নীচুদিকে রাখা যায় তাহা হইলে সেই উপরদিকে আর আলো থাকে না। সেইরূপ যখন সূর্য্য পৃথিবীর উত্তরদিকে থাকে তখন ক্রমাগত সেই-দিকে ছয় মাস দিন হয়, এইরূপ আবার যখন সূর্য্য পৃথিবীর দক্ষিণদিকে থাকে তখন উত্তরদিকে ক্রমাগত ছয়মাস রাত্রি হয়।

উত্তর হিমমণ্ডলে যখন ক্রমাগত রাত্রি, তখন ঈশ্বরের করুণায় সেদিকে এমত একটি বড় ধূমকেতুর মত উজ্জ্বল নক্ষত্র-মণ্ডল দেখা যায় যে তদ্দ্বারা সেখানকার লোক বিলক্ষণ আলো পায় এবং সুখে জীবন যাপন করে।

মেরুসন্নিহিত দেশ সকলের বিবরণ।

পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তকে সুমেরু ও কুমেরু বলে। এখানে বারমাসই প্রায় শীতের প্রাদু-

র্ভাব, আর আর ঋতু অতি অল্পকাল থাকে। এখানে দিবারাত্রি আমাদের দেশের মত নয়, ২৪ ঘন্টার মধ্যে কখন এক ঘন্টা মাত্র দিন, কখন এক ঘন্টা মাত্র রাত্রি; কখন কখন দিনের সহিত সাক্ষাৎ নাই, কয়েক মাস কেবল রাত্রিই চলিতেছে; কখন কখন মূলে রাত্রি নাই ক্রমাগত কয়েকমাস দিবস রাজত্ব করিতেছে। এই আশ্চর্য্য ঘটনা অবগত হইতে কাহার না কৌতুহল হয়?

সূর্য্য প্রায় চিরকালই পৃথিবীর বিষুবরেখার সম্মুখে থাকে। পৃথিবীর গতি দ্বারা যখন তাহার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হয়, তখন মেরু সন্নিহিত দেশে তাহার কিরণ অনেক সরলভাবে পড়াতে সেখানে গ্রীষ্মকাল হয়। এসময়ে সূর্য্য আর সেখানে অস্ত যায় না—পূর্ব্ব-দিক হইতে পশ্চিমে, আবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে এইরূপ ক্রমাগত যাতায়াত করে। যদিও পৃথিবীর সে অংশ ২৪ ঘন্টায় একবার আপনাআপনি ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা সূর্য্যের সম্মুখেই থাকে। যেমন অগ্নির নিকট কোন বস্তু রাখিলে তাহা ক্রমশঃ অধিক উষ্ণ হয়; ক্রমাগত সূর্য্যের কিরণ পাইয়া হিমমণ্ডলও সেই-রূপ উত্তপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর বহুকাল-সঞ্চিত কঠিন বরফ রাশি দ্রব হইয়া ভূমি উর্ব্বরা হয় এবং নানাবিধ তৃণ পুষ্প উৎপন্ন হইতে থাকে।

অল্পকালেই গ্রীষ্মের ভোগ অবসান হয়। মেরুস্থিত দেশ সকল সূর্য্য হইতে যত অন্তর হইতে থাকে, ততই তাহাকে ক্রমশঃ আকাশের নীচে নামিয়া পড়িতে দেখা যায়; ততই তাহার কিরণ অধিক বক্ররেখায় পতিত হওয়াতে আলোক ও উত্তাপের হ্রাস হইতে থাকে। কিছুদিন অনবরত গোলাকার পথে সূর্য্যকে ঘুরিতে দেখা যায়; কিন্তু ক্রমে সূর্য্য এতদূরে গিয়া পড়ে যে তাহাকে আকাশের সীমামাত্র স্পর্শ করিতে দেখা যায়। কিছুদিন এইরূপে ঘুরিয়া সূর্য্য একবার অস্ত যায়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণের পর আবার উদয় হয়, ইহা-তেই রাত্রির সঞ্চার হইতে থাকে। ক্রমশঃ অস্ত ও উদয়ের মধ্যে সময় বেশী যায় এবং রাত্রির পরিমাণ বাড়িতে থাকে। পরে সূর্য্য যখন আরও নামিয়া ঠিক বিষুবরেখার সম্মুখে আইসে তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়। হিমগুলে ইহার পর হইতেই শীতের অধিক প্রাদুর্ভাব হয়।

দিন রাত্রি সমান না হইতে হইতেই এখানে শীতের সঞ্চার হয়। শ্রাবণমাসে বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়; আশ্বিন মাসে ইহা জমির উপর ১॥ হস্ত প্রমাণ জমে। ভূমি ও বায়ুর মত সমুদ্র শীঘ্র শীতল হয় না; উপরের কতকজল যেমন শীতল হয় তাহা নীচে যায় এবং নীচের উষ্ণতর জল উপরে উঠে। ইহাতে সমুদ্র

হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উঠিতে থাকে এবং তাহা শীতল বাতাসে ঘন হইয়া গাঢ় কোয়াসায় দিক সকল অন্ধকার করিয়া রাখে। সূর্য্য যত দূরে যায় শীত ততই অধিক হয়, ভূমি সকল তত রাশি রাশি বরফে আচ্ছাদিত হইয়া কঠিন ও শ্বেতবর্ণ হয়, এবং সমুদ্রের উপর ক্রমাগত মেঘ ও কোয়াসা ঘন হইতে থাকে। অবশেষে জলরাশি শীতল হইয়া বরফ হয় এবং ইহা জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে। সমুদ্র একবার হিমশিলায় আবৃত হইলে নীচের জল আর অধিক শীতল হইতে পারে না, জলজন্তু সকল সুখে বাস করিয়া ঈশ্বরের করুণার পরিচয় দেয়। তখন বাষ্পও আর উঠিতে পারে না, যাহা উঠিয়া কোয়াসা ও মেঘ হইয়াছিল তাহা বরফ হইয়া পড়ে এবং আকাশ ও বায়ু পরিষ্কার হয়।

শীতকাল বেশী হইলে দিন ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়। অবশেষে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য হয়ত কয় মুহূর্ত্তের জন্য উদয় হয়; ২৪ ঘন্টার মধ্যে আর দেখা নাই। ক্রমে এককালে অদৃশ্য হয় এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতের ন্যায় তাহার অস্পষ্ট আলোকমাত্র প্রেরণ করে। কিছুদিন পরে সে আলোকও যায়, ক্রমাগত রাত্রি বিরাজ করিতে থাকে; এই সময়ে শীত ভয়ঙ্কর হয়। সমুদ্রের জল ৪৫ হস্ত নামিয়া কঠিন বরফ হয়,

স্থল এবং জল কিছুই পৃথক্ জানা যায় না। প্রবল ঝটিকা ও তরঙ্গাঘাতে বরফরাশি কখন কখন ছিন্ন হয়, কিন্তু আবার যেমন তেমন মিলিয়া যায়। ঘোরতর শীতকালে মেরু সন্নিহিত দেশ সকলের যেরূপ ভয়ানক দৃশ্য তাহা মনেতেও কল্পনা করা যায় না। দিনের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবিশ্রান্ত রাত্রি চলিতেছে; একটী তৃণপত্রের সহিত সাক্ষাৎ নাই, চারিদিক্ যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায় শ্বেতবর্ণ বরফে আচ্ছন্ন, শীতের প্রভাবে ফুটন্ত জল নিমেষে জমিয়া যায় এবং নিদ্রাকালে নিঃশ্বাসের সহিত যে বাষ্প বহির্গত হয় তাহা শয্যা এবং গাত্রের উপর বরফ হইয়া থাকে। পারদ জমিয়া সীসার মত হয়। শরীরের আবরণ একটু মাত্র খুলিলে শীত এমনি লাগে, যেন কোন ভয়ঙ্কর জন্তু আসিয়া দংশন করিতেছে। কুকুরেরা কোন ধাতুপাত্রে খাদ্যদ্রব্য চাটিতে চাটিতে জিহ্বা বরফে এমনি আঁটিয়া যায় যে, সহজে কোনক্রমে ছাড়ান যায় না, তাহাদিগকে পাত্র সকল মুখে করিয়া বেড়াইতে হয়। এরূপ স্থলেও ঈশ্বরের করুণা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জন্তু সকলের আপাদ মস্তক গাঢ় লোমে আবৃত হয়, মনুষ্যেরাও চর্ম্মাদি দ্বারা পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া শরীর উষ্ণ রাখে। যেমন সূর্য্যের আলোক নাই সেইরূপ চন্দ্রের ও নক্ষত্র সকলের আলোক এম-

ময়ে অতি উজ্জ্বল হয় এবং এক প্রকার তারকামণ্ডল দেখা দেয় তাহার আভায় সুস্নিগ্ধ দিবস ভোগ করা যায়।

শীতের অবসান হইলে সূর্য্য অল্পে অল্পে আকাশের নিম্ন ভাগে আসিতে থাকে। প্রথম প্রথম মধ্যাহ্ন সময়ে একবার করিয়া তাহার আলোকটা দেখা যায় ক্রমে তাহা বেশী উজ্জ্বল হইয়া অনেকক্ষণ থাকে। বহুকালের পর সূর্য্যকে পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য লোক সকল অতুল আনন্দে নৃত্য করে। তৎপরে প্রথম দিবস তাহার রক্তবর্ণ এক কণামাত্র মুহূর্ত্তকের জন্য উঁকি মারিয়া অস্ত যায় ক্রমে কিছু কিছু করিয়া সমস্ত মণ্ডলটি দৃশ্যমান হয়। দুই তিন মাসের মধ্যে নিয়মিত উদয়াস্ত হয় এবং এক ঘন্টাকাল দিবস পাওয়া যায়। আর ২।৩ মাসের মধ্যে দিন বড় হইয়া গ্রীষ্মকাল হয়, তখন সূর্য্য আর অস্ত যাইতে চাহে না, ক্রমাগত প্রখর কিরণ বর্ষণ করিয়া ভূমি সমুদ্র উত্তপ্ত করিয়া থাকে। প্রথমে সমুদ্রতীরের বরফ গলিয়া জল রাশিকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়, সবুজ জল দৃষ্টিগোচর হয়। পরে ভূমির বরফ গলিয়া বদ্ধ নদী সকল স্রোতস্বতী হয়। শীতকালের শীতে ৪।৫ হস্ত জল কঠিন বরফ হয়, আর তাহার উপরে ১।,১৷৷০ হস্ত বরফ জমাট থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এত উত্তাপ হয় যে, তাহাতে ৮।৯ হস্ত বরফ রাশি

গলাইয়া ফেলিতে পারে। অতএব এসময় পৃথিবী উর্ব্বরা ও হরিৎবর্ণ তৃণাদিতে সুশোভিত হইয়া পরম মনোরম বেশ ধারণ করে; আবার যদবধি শীতের প্রাদুর্ভাব না হয় জীবজন্তু সকলও মহানন্দে কেলি করিতে থাকে।

খগোল।

সৌরজগৎ।

খগোলে আকাশের বিবরণ সমুদায় জানা যায়। আকাশটা যে কি তা অনেকে জানে না। অজ্ঞান লোকে মনে করে যে, যেমন ঘরের উপরে ছাদ বা চাল থাকে, আকাশটা সেই রূপ যেন একটা পৃথিবীর উপরে ঢাকুনির মত রহিয়াছে; তাহার মাঝখানটা উপরে আছে চারিধার পৃথিবীর কিনারায় ঠেকিয়াছে। আবার অনেকে বিশ্বাস করে যে, আকাশটা আগে ভারি নীচু ছিল মাথায় ঠেকিত; এক দিন এক বুড়ী উঠান ঝাঁট দিতেছিল আকাশটা যেমন মাথায় লাগিল সে ঝাঁটার বাড়ী মারিল আকাশ সেই অবধি উপরে উঠিয়া গেল।

এসকল ছেলে বেলার গল্প কথা বই আর কিছুই নয়। আকাশের অর্থ, শূন্য স্থান। পৃথিবীর যেমন উপরে

আকাশ, নীচেও আকাশ, চারিধারে আকাশ; পৃথিবী শূন্যে অর্থাৎ আকাশে আছে। আকাশের কোন আকার নাই তাহাতে যে নানা প্রকার রঙ্ দেখি সে মেঘে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া হয়। যখন মেঘ থাকে না গাঢ় নীলবর্ণ দেখা যায় সে বাতাসের রঙ মাত্র। বাতাসের ও জলের কোন রঙ্ সচরাচর দেখা যায় না—কিন্তু একত্র রাশি প্রমাণ থাকিলে সমুদ্রের জল সবুজ বর্ণ এবং সেই উপরের বাতাস নীলবর্ণ দেখায়।

আকাশ যে কত বড় তা কেহ সীমা করিতে পারে না—যে দিকে যত দূর দেখাযায় আকাশ ছাড়াইয়া যাওয়া যায় না। এই আকাশ যদিও শূন্য কিন্তু ইহা সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী ধূমকেতু ও অসংখ্য নক্ষত্রে পূর্ণ রহিয়াছে। আমাদের বোধ হয়, আকাশে ইহারা এথায় সেথায় ছড়ান রহিয়াছে কিন্তু খগোল বা জ্যোতিষ জানিলে ইহাদের মধ্যে ভারি সুশৃঙ্খলা দেখা যায়।

মনে কর যেন এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত আকাশ যুড়িয়া আছে। কিন্তু যেমন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে একটি একটি দেশে ভাগ করা যায়—এই জগতেরও সেইরূপ একটি একটি অংশ করা যায়। উপরে যে ছবিটি দেখিতেছ তাহা এইরূপ একটি ভাগ—এইটি মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিয়া ফেল, অনেক কৌশল বুঝিতে পারিবে।

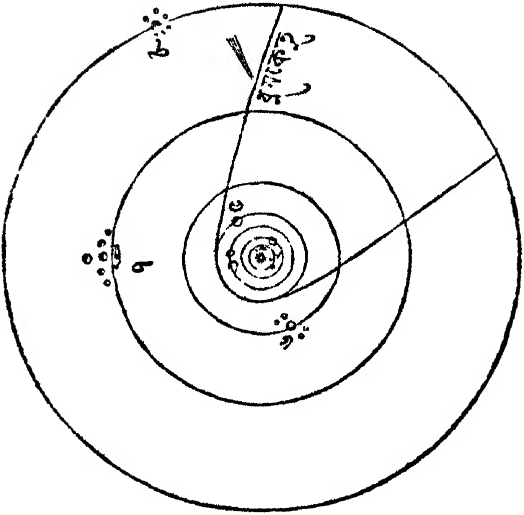

এই ছবিতে

১—সূর্য্য।	২—বুধ।
৩—শুক্র।	৪—পৃথিবী
৫—মঙ্গল।	৬—বৃহস্পতি।
৭—শনি।	৮—হর্শেল গ্রহ

এটিকে একটি সৌর জগৎ বলে। ইহার মধ্যে স্থলে সূর্য্য রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রহ সকল ঘুরিতেছে। আমাদের পুরাণে বলে পৃথিবী স্থির, আর তাহার চারিদিকে রবি অর্থাৎ সূর্য্য, সোম অর্থাৎ চন্দ্র ও মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি,

রাহু ও কেতু এই নব গ্রহ ঘুরিতেছে কিন্তু সেটির মূলে ভুল। চন্দ্র একটি গ্রহ নয়—উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে চন্দ্র সেইরূপ পৃথিবীকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর যেমন এই একটি চন্দ্র, কোন কোন গ্রহের ৪,কাহারও ৬,কাহারও ৮ চন্দ্র আছে। ছবিটিতে যে কয়েকটি গ্রহের নাম আছে তাহা ছাড়া আরও অনেক গ্রহ প্রকাশ হইয়াছে সে সকলেই আবার তাহাদের চন্দ্র সকল সঙ্গে লইয়া সূর্য্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। সৌর জগতে সূর্য্য, গ্রহ, উপ গ্রহ ভিন্ন আরও কতক গুলি জ্যোতিষ্ক আছে তাহাদিগের নাম ধূমকেতু। ধূমকেতু উঠিলে লোকে মহা অমঙ্গলের আশঙ্কা করে কিন্তু তাহাও এক প্রকার গ্রহের মত সূর্য্যের চারিদিকে অপনার পথ দিয়া ঘুরিতেছে। আমাদিগের এই একটি সৌরজগতে কত গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু আছে তাহা কেহই বলিতে পারেন না— সেই সকলে কত প্রকার সৃষ্টি রহিয়াছে তাহাও কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন না।

যেমন একটি সৌরজগতের কথা বলা গেল জগতে এমন অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। আমরা আকাশে যে এক একটি নক্ষত্র দেখি, তাহারা এক একটি সূর্য্য—সূর্য্য অপেক্ষাও অনেকে অনেক গুণ বড় দূরে আছে বলিয়া এত ছোট বোধ হয়। সূর্য্য এখান হইতে একখানি থালার

মত দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়, দুচারি গুণ নয়, হাজার গুণও নয়, প্রায় ১৪ লক্ষ গুণ বৃহৎ।

নক্ষত্র সকল যদি এক একটি সূর্য্য হইল তাহাদের চারিদিকে আবার কত গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা রজনীতে অসংখ্য সৌরজগৎ দেখিতেছি তাহাতে কত অসংখ্য প্রকার সৃষ্টি আছে। রাত্রিকালে যে ছায়াপথ আমরা আকাশে দীর্ঘাকার দেখিতেপাই, যাহাকে 'যমের জাঙ্গাল' বলে তাহা আর কিছুই নয় দূরস্থ নক্ষত্র রাশিতে পূর্ণ। আমাদের দৃষ্টি কত টুকু আমরা দেখিতে পাই না এই জগতের এমন কত স্থান আছে তাহাতে আবার কত লোক মণ্ডল রহিয়াছে। এক জন ভাবুক ব্যক্তি এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, "যেমন সমুদ্রের তীরের একটি বালুকার কণা নষ্ট হইলে কম বেশী বোধ হয় না, এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে যদি আমাদের এই সূর্য্য, পৃথিবী আদি গ্রহ, চন্দ্র আদি উপগ্রহ এবং ধূমকেতু সকল লইয়া এককালে ধ্বংস হইয়া যায় তাহাতে কিছুই ক্ষতি বোধ হয় না"। বাস্তবিক এই রূপ বোধ হইতে পারে বটে। 'ব্রহ্মাণ্ড কি আশ্চর্য্য ব্যাপার।' ব্রহ্মাণ্ডপতির কি আশ্চর্য্য শক্তি, কি অসীম মহিমা!

চন্দ্র গ্রহণ।

আমাদের পুরাণে একটী বর্ণনা আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্র-মন্থন করিয়া এক ভাণ্ড অমৃত পান। অমৃত ভক্ষণ করিলে অমর হয়, এই জন্য দেবগণ দুষ্ট অসুরদিগকে কৌশলক্রমে বঞ্চিত করিয়া আপনারা তাহা পান করিতেছিলেন। রাহু নামে এক দৈত্য ছদ্ম বেশে দেবতা হইয়া তঁহাদিগের সঙ্গে ভোজন করিতেছিল; চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া পরিবেশন-কর্ত্তা বিষ্ণুর গোচর করিলেন। অমৃত অসুরের গলা অবধি গিয়াছে, এমন সময়ে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। ইহাতে তাহার মুখের ভাগটা অমর হইল এবং চন্দ্র ও সূর্য্য শত্রুতা করিয়াছে, এই জন্য তাহাদিগকে গ্রাস করিবে প্রতিজ্ঞা করিল। অতএব যখন সেই রাহুর মুণ্ড চন্দ্র ও সূর্য্যকে গিলিতে যায়, তখন চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হয়।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, এটী একটী উপকথা মাত্র। পুর্ব্বকালের সামান্য লোকেরা বিজ্ঞান শাস্ত্র না জানাতে কোন্ কার্য্যের কি কারণ অবগত ছিল না। কবিদিগের কল্পনা শক্তিটিই প্রবল ছিল; সুতরাং একটী অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলে মন-গড়া একটা গল্প তৈয়ার করিয়া ভ্রান্ত লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। এখন জ্ঞানের যত বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা সকল বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত জানি-

তেছি। সৌর জগতে বলা গিয়াছে, সূর্য্য এক বৃহৎ তেজোময় পদার্থ, পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ লক্ষগুণ বড়। চন্দ্রও একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর মত, দূরে আছে বলিয়া এত ছোট দেখায়। ইহারা জড় পদার্থ; কাহারও সহিত ইহাদিগের শত্রুতা মিত্রতা নাই; ঈশ্বরের অখণ্ড নিয়মে আকাশ পথে ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য, পৃথিবী এবং চন্দ্র এইটি তিন স্থান বিশেষে থাকাতেই গ্রহণ হয়। ইহা আর কিছু নয়, কেবল পৃথিবীর লোকেরা কিছু সময় চন্দ্র ও সূর্য্যকে দেখিতে পায় না—এই মাত্র।

প্রথমে চন্দ্র গ্রহণ কি রূপে হয় দেখা যাউক। পৃথিবী গোল, এইটি প্রমাণ করিবার সময় বলা গিয়াছে যে, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে গোলাকার দেখায় এবং তাহাতেই চন্দ্র গ্রহণ হয়। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিলেই আর কোন গোল থাকে না। আমরা জানি, সূর্য্য সৌর জগতের ঠিক্ মধ্যস্থলে আছে; পৃথিবী তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং চন্দ্র আবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যখন সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের সম-সূত্রপাত হয় অর্থাৎ সূর্য্য একদিকে ও চন্দ্র অন্যদিকে থাকে এবং পৃথিবী তাহার মাঝখানে আইসে; এবং এক গাছি সূতা সমান করিয়া ধরিলে ঠিক তিনটির মধ্যস্থল ভেদ করিয়া যায় তখনই চন্দ্র গ্রহণ হয়।

এইটী আর এক প্রকারে বুঝা যাইতে পারে। মনে কর, এক দিকে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে একটা গোলাকার বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে যদি সেই গোলাকার বস্তু ও অগ্নিকুণ্ডের মধ্য-স্থলে অন্য একটা বস্তু রাখা যায়, তবে সেই গোলাকার বস্তুর উপর আর আলোক পতিত না হইয়া মধ্য স্থলে যে বস্তুটী আছে, তাহার এক পৃষ্ঠে আলোক পতিত হইবে এবং তাহার অন্য পৃষ্ঠের ছায়া সেই গোলাকার বস্তুর উপর গিয়া পড়িবে। চন্দ্র গ্রহণও সেইরূপ। সূর্য্য একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় একদিকে রহিয়াছে। তা-হার সম্মুখে চন্দ্র রহিয়াছে। চন্দ্রের অর্দ্ধভাগে সূর্য্যের আলোক পতিত হইয়াছে এবং সেই আলো আবার পৃ-থিবীতে আসিতেছে। কিন্তু পৃথিবী যদি ঘুরিতে ঘুরিতে কোন সময় সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্য স্থলে উপস্থিত হয়; তাহা হইলে সূর্য্যের আলো চন্দ্রের উপর আর পতিত হয় না। পৃথিবীর এক দিকে সূর্য্যের আলো পতিত হয় এবং তাহার অন্য দিকের ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়। ইহাকেই চন্দ্র গ্রহণ কহে।

সকল সময়ে এই ঘটনা হইতে পারে না। চন্দ্র কখন পৃথিবীর এক পাশে, কখন অন্য পাশে এই রূপ নানা দিকে যাইতেছে; পূর্ণিমা তিথিতেই হইতে পারে। কিন্তু

আবার সকল পূর্ণিমাতে সম সূত্রপাত হয় না; সুতরাং সময় বিশেষ আবশ্যক করে।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেরও নিজের আলোক নাই; ইহা সূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বল দেখায়। রাত্রিকালে সূর্য্যের তেজ যখন পৃথিবী অন্য দিকে পড়ে তখন তাহা চন্দ্রের উপরেও যায়। পূর্ণিমা তিথিতে আমরা চন্দ্রের ঠিক্ অর্দ্ধ ভাগ আলোকময় দেখিতে পাই। গ্রহণের সময় পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের ঠিক্ মাঝখানে আসিয়া আড়াল করে, তাহাতেই সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রের উপর পড়িতে পারে না এবং পৃথিবীর ছায়া ক্রমশঃ চন্দ্র-মণ্ডলকে ঢাকিয়া ফেলে। একবারে কিছু সমুদায় ঢাকে না। পৃথিবীর ছায়া যখন চন্দ্রের একধারে পড়ে তখন তাহার অল্প স্থান ঢাকে সুতরাং অল্প গ্রাস হইল দেখায়। ক্রমে অর্দ্ধভাগ, পরে যখন সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায় তখন পূর্ণ গ্রাস বলে। আবার ঘুরিতে ঘুরিতে যখন উভয়ে সরিয়া পড়ে, তখন যে চন্দ্র সেই চন্দ্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞান লোকে মনে করে রাহুর গ্রাস হইতে চন্দ্রের মুক্তি হইল। সকল সময়ে সমুদায় চন্দ্র-মণ্ডল পৃথিবীর ছায়াতে ঢাকিয়া পড়ে না। হয়ত এক রেখা পড়িয়া উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ দিকে চলিয়া যায়, হয়ত অর্দ্ধেক ছায়া বা তাহার কিছু অধিকও পড়িতে পারে।

অতএব এখানে পৃথিবীর ছায়াটাই রাহুগ্রহ ; ছায়াতে অন্ধকার হওয়ার নামই গ্রাস।

চন্দ্র গ্রহণ সকল দেশে এক সময়ে হয় না। পশ্চিম দেশের লোকেরা যেমন সূর্য্যোদয় অনেক বিলম্বে দেখে, চন্দ্র-গ্রহণও সেই রূপ অনেক পরে দেখিতে পায়। নিম্নে যে ছবিটি দেওয়া গেল, ইহাতে

সু—সূর্য্য;
চ—চন্দ্র;
পৃ—পৃথিবী; ঘঙছ ছায়া।
কখগ—চন্দ্রের কক্ষ।

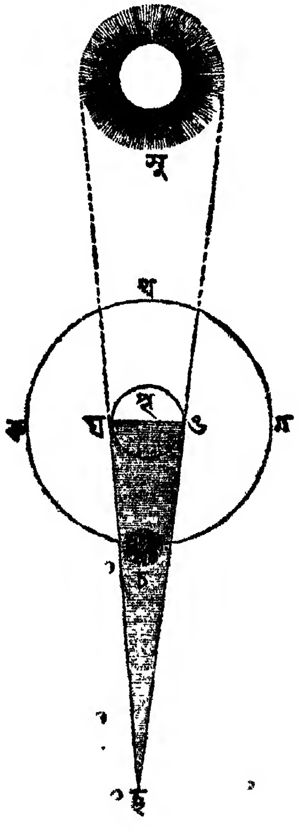

সূর্য্যগ্রহণ।

চন্দ্র গ্রহণের বিষয় লেখা হইল। সূর্য্যগ্রহণ কি প্রকারে হয় তাহার বিষয় লেখা যাইতেছে। সূর্য্য নিজে যেমন তেজোময়, পৃথিবী সেরূপ নহে, এই হেতু সূর্য্যের আলো পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে। কিন্তু যখন চন্দ্র, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া আড়াল করে তখনই সূর্য্য গ্রহণ হয়। চন্দ্র অমাবস্যাতেই সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু সকল অমাবস্যাতে সূর্য গ্রহণ হয় না, যে অমাবস্যাতে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক্ মধ্য স্থলে উপস্থিত হইয়া সমসূত্রপাত হয় তখনই সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ কখন পূর্ণগ্রাস হয় না। কখন কখন সূর্য্য গ্রহণের সম সূর্য্যকে এরূপ দেখা যায় যে মধ্যস্থলে অন্ধকার ও চারি ধার আলোময়।

সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্রকে যে দেখা যায় না ইহার কারণ এই যে, সূর্য্য নিজে আলোময়, চন্দ্র আলোময় নয়। সূর্য্যের আলো পাইয়া চন্দ্র প্রকাশিত হয়। সূর্য্য গ্রহণের সময় চন্দ্রের যে দিক্‌টা সূর্য্যের দিকে থাকে সেই দিক্‌টা আলোময় হয় আবার যে দিক্‌টা পৃথিবী অর্থাৎ আমাদের দিকে থাকে সে দিক্‌টা আলো না

পাওয়াতে চন্দ্র প্রকাশিত হয় না, এজন্য সূর্য্য গ্রহণের সময় অমরা চন্দ্রকেও দেখিতে পাই না। এইস্থলে যে ছবিটী দেওয়া গেল তাহা ভাল করিয়া বুঝিলেই সূর্য্যগ্রহণ কি প্রকারে হয় বুঝা যাইতে পারে।

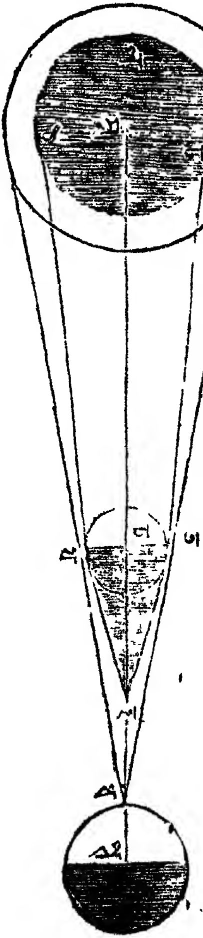

এই ছবিতে সূ—সূর্য্য ; চ-চন্দ্র ; পৃ—পৃথিবী ; ত থ হ—চন্দ্রেরছায়া; চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথবীর ঠিক মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া সমসূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্য গ্রহণ হইল।

আমাদের দেশের অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা বলিয়া থাকে যে শাস্ত্রকারেরা যে রাহুকেতু মানিতেন তাহা যদি অসত্য হইবে তবে আমাদিগের দেশের শাস্ত্রবেত্তারা রাহুকেতু মানিয়া যে গ্রহণ নির্ণয় করেন তাহা ঠিক হয় কেন ? এই ভ্রম অতি সহজে সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য কুসংস্কার-শূন্য জ্ঞানাপন্ন লোকেরা রাহু কেতু মানেন না তবে তাঁহারা যে গ্রহণ নির্ণয় করেন তাহা ঠিক হয় কেন? ইহার কারণ এই যে আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রবেত্তাগণ মনে করেন যে, রাহুকেতু সূর্য্য চন্দ্রের পশ্চাৎ যায়। আবার অন্য দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন যে পৃথিবীর ছায়া সূর্য্য চন্দ্রের পশ্চাৎ যায়, মর্ম্ম দুয়েরই এক ; তজ্জন্য গণনাও ঠিক হয়। তবে প্রভেদ এই যে আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রবেত্তাগণ পৃথিবীর ছায়া ও চন্দ্রের আড়ালকে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের কারণ না বলিয়া রাহুকেতু নামে সেই ছায়ার এক মিথ্যা নাম কল্পনা করিয়াছেন। ইটি যে কল্পনা তাহা আমাদিগের দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের লেখাতে

জানা যায়, তাঁহারা পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়াকেই গ্রহণের কারণ বলেন।*

প্রতি বৎসর নিশ্চয় দুইটী করিয়া সূর্য্য গ্রহণ হয় এবং সমুদায়ে সাতটী গ্রহণের বেশী কখন হয় না। চারটী সূর্য্য গ্রহণ, তিনটী চন্দ্র গ্রহণ কিম্বা পাঁচটী সূর্য্যগ্রহণ দুইটী চন্দ্র গ্রহণ। আর একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, প্রত্যেক আঠার বৎসর এগার দিনের পর পূর্ব্বের মত ঠিক্ পুনর্ব্বার গ্রহণ হইয়া থাকে।

---

* আমাদের দেশীয় জ্যোতিষে লিখিত আছে;

"ছাদকোভাস্করস্যেন্দুরধস্থোঘনবদ্ভবেৎ।
ভুচ্ছায়াপ্রাঙ্মুখশ্চন্দ্রোবিশত্যর্থোভবেদসৌ॥"

সূর্য্যের অধোদেশে চন্দ্রের ছায়া মেঘের ন্যায় সূর্য্যের আড়াল হয়। অতএব চন্দ্র সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে। পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের দিকে গিয়া চন্দ্র আচ্ছাদিত হয়, ইহাকেই গ্রহণ বলে।

বিজ্ঞান।

মেঘ ও বাষ্প।

জল-বহুরূপী।

অনেকে মানুষবহুরূপী দেখেছে তারা কখন বুড়ো, কখন সাহেব, কখন মোহন্ত নানা সাজ সাজে। কিন্তু জল যে কত রকম সাজ সাজিতে পারে তা অনেকে দেখে না। এই জল কখন ধোঁয়া হয়ে আকাশে উঠে, কখন মেঘ হয়ে নানা রঙ্ পরে, আবার বৃষ্টি হইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়, কখন শিশির হয়ে ঘাসের উপরে মুক্তা গুলির ন্যায় দেখায়, কখন কোয়াসা হইয়া দিক্-সকল অন্ধকার করে রাখে, কখন শীল হইয়া পাথরের নুড়ীর মত ঝড় ঝড়্ করিয়া পড়ে, কখনও বা বরফ হইয়া জলের উপর এমন জমাট হয় যে তাহার উপর দিয়া মানুষ হাতী অনায়াসে চলে যেতে পারে।

এসকল কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য্য হবেন, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র জানিলে সহজে বুঝা যায়। যে শাস্ত্রে, কি কারণে কেমন করিয়া কি রূপ ঘটনা হয় বুঝাইয়া দেয় তাহাকে বিজ্ঞান কহে। জল হইতে মেঘ ও বৃষ্টি কেমন করিয়া হয় প্রথমে বিবেচনা করা যাউক।

আমরা ছেলে বেলা অবধি শুনিয়া আসি যে ৬ মেঘ ও ৩৬ মেঘিনী আছে; মাঝে মাঝে তারা শাল পাতা খাইতে আইসে; এবং তাদের মুখের লাল পড়িয়া অভ্র হয়; ইন্দ্রের ঐরাবত সমুদ্র হইতে জল শুষিয়া যখন তাদের পিঠে ছড়াইয়া দেয় তাহারা চারি দিকে চালনা করিয়া বৃষ্টি করে এসকল কথা সত্য নয় গল্প কথা মাত্র।

মেঘ আর কিছুই নয় জলের এক রকম আকার মাত্র। জল ধোঁয়া হয়, ধোঁয়া হইতে মেগ হয়, মেঘ গলিয়া বৃষ্টি হয়। এক হাঁড়ী জল যখন গরম করা যায় তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতে থাকে। এই ধোঁয়ার উপর যদি খানিক ক্ষণ ধরিয়া হাত রাখাযায় তাহাহইলে হাত ভিজিয়া যায়, জল টস টস্ করিয়া পড়ে। এখানে ধোঁয়া জমিয়া জল হইয়া গেল। এই ধোঁয়া উপরে উঠিয়া মেঘ হয়। আকাশে যে এত মেঘ হয় তার কারণ এই সূর্য্যের তাপে সমুদ্রের জল গরম হয় তাহাতে খুব হালকা এক রকম ধোঁয়া উঠে কিন্তু সকল সময় চখে দেখা যায় না ইহাকে বাষ্প বলে। এই বাষ্প অনেক পরিমাণে আকাশে উঠিয়া যখন জমিতে থাকে তখন মেঘ হয়। সূর্য্যের কিরণ পড়ে মেঘে নানা রকম রঙ্ হয়। এই মেঘ সকল বড় অধিক দূরে থাকে না, উঁচু পাহাড়ে উঠিলে দেখা যায় ধোঁয়া বা কোয়াসার মত

নীচে দিয়া চলিয়া যায়। এই মেঘ সকল শীতল বাতাসে জমিয়া যখন ভারি হইয়া যায় তখন আর উপরে থাকিতে পারে না বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে থাকে। বাতাসে মেঘ সকল চলিয়া বেড়ায় তাহাতেই অনেক দূর অবধি বৃষ্টি ছড়াইয়া পড়ে। এখানে দেখ জল বহু-রূপী ধোঁয়া হইল, বাষ্প হইল, মেঘ হইল, আবার বৃষ্টি হইয়া যে জল সেই জল হইয়া গেল। আর আর কথা পরে বলিব।

শিশির।

জল-বহুরূপী।

জল বহুরূপী ধোঁয়া ও বাষ্প, মেঘ এবং বৃষ্টি হইয়াছে; শিশির কেমন করিয়া হয়, দেখা যাউক। শিশির কোথা হইতে আইসে? অনেকে মনে করিতে পারে স্বর্গ হইতে দেবতারা বুঝি বৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা এই পৃথিবীর জলভিন্ন আর কিছুই নয়। সূর্য্যের তাপে জল বাষ্প হইয়া উঠে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে; আরও অনেক কারণে অল্প বা অধিক বাষ্প পৃথিবী হইতে সর্ব্বদাই উঠিতেছে। ইহার সমুদায় কিছু মেঘ হয় না; অনেক বাষ্প বাতাসের সঙ্গে একত্র হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের তাপ যত হ্রাস হয়, পৃথিবী এবং আর আর

বস্তুর ভিতরের তাপ ততই বাহির হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সে সকল শীতল হয়। বাতাস শীতল হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। শীতল বস্তু সকলের সহিত বাতাসের সংযোগ হইলে ইহার মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা জমিয়া গিয়া শিশির হয়। অনেকে দেখিয়াছেন একখানা শীতল কাচ বা আয়না একটা গরম ঘরে লইয়া গেলে অথবা তাহার উপর মুখের ভাপ দিলে তাহা ভিজিয়া উঠে; কেননা বাষ্প শীতল বস্তুর সহিত মিলিত হইলে জমিয়া জল হইয়া যায়। শিশিরও ঠিক এইরূপে হয়।

সকলেই জানেন যে, যে রাত্রিতে ঝড় হয় বা আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন থাকে সে রাত্রে অধিক শিশির হয় না। ইহার কারণ এই, বাতাস অধিক বহিলে বাষ্প সকল ছড়াইয়া পড়ে সুতরাং তাহা জমিতে পারে না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকিলে পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয়, তাহা বরাবর চলিয়া যাইতে পারে না; বরং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাকে গরম করিয়া রাখে, কাজে কাজেই বাষ্প জমিয়া শিশির কি প্রকারে হইবে? আকাশ পরিষ্কার থাকিলে পৃথিবীর তাপ বাহির হইয়া বরাবর চলিয়া যায়, তাহাতেই ইহা অধিক শীতল হইতে থাকে এবং বাষ্প সকল ভাল করিয়া জমিয়া শিশির অধিক পড়ে।

শিশির সকল বস্তুতে সমান পড়ে না। যে বস্তু হইতে তাপ যত শীঘ্র বাহির হয় এবং যাহা তপ্ত হইতে যত অধিক সময় লাগে, তাহাতে শিশির তত অধিক হয়। ধাতু সকল অপেক্ষা কাচ শীঘ্র ভিজিয়া উঠে। আবার কাচ অপেক্ষা সজীব তৃণলতাতে শিশির অধিক জমে। শিশির না পাইলে অনেক গাছপালা মরিয়া যায়, এজন্য ঈশ্বর তাহার আশ্চর্য্য উপায় করিয়া দিয়াছেন।

যে রাত্রি যত অধিক শীতল হয় শিশির তাহাতে অধিক পড়ে। যে সকল দ্রব্য গাছের তলায় বা কোনরূপে ঢাকা থাকে তাহার তাপ বাহির হইতে পারে না সুতরাং তাহাতে শিশিরও জন্মিতে পারে না।

কোয়াসা শীল ও বরফ।

জল-বহুরূপী।

কোয়াসা এক প্রকার মেঘই বলিলে হয়। বিশেষ এই, ইহা পৃথিবীর নিকটে থাকে—মেঘ দূরে দেখা যায়। উভয়েই বাস্প ঘন হইয়া হয়। বায়ুর সহিত জলীয় কণা সকল মিশিয়া থাকে শীত অধিক হইলে—উষ্ণ এবং শীতল এই বিভিন্ন প্রকার বায়ু একত্র হইয়া কোয়াসা জন্মায়। আমাদের দেশে শীতকালেই কোয়াসা হয়, শীতল প্রদেশ এবং সমুদ্রাদির উপর ইহা প্রায় সকল

সময়ে দেখা যায়। কোয়াসাতে আম্রাদি বৃক্ষের মুকুল হয় এবং এমন কোন কোন দেশ আছে সেখানে বৃষ্টি হয় না কিন্তু গাঢ় কুজ্ঝটিকা হইয়া ভূমি সকল সরস ও বৃক্ষাদির অনেক উপকার করে।

শীল কি রূপে তৈয়ার হয় এখনও নিশ্চয় হয় নাই। কিন্তু এটি এক প্রকার ঠিক্, যে মেঘ সকল যখন বৃষ্টির ফোঁটা হইতে আরম্ভ হয়, হঠাৎ তাহাতে শীতল বাতাসের হলকা বহিলে শীল জমাইয়া ফেলে। শীলের আকার গোল বা ডিম্বের মত কিন্তু অনেক সময় অনেক প্রকার হয়। আকাশের উপরিভাগে শীলের আকার অতি ক্ষুদ্র থাকে কিন্তু যেমন নামিতে থাকে নিকটের বাস্পরাশি সঙ্গে সঙ্গে জমাট করিয়া বৃহৎ হয়। শীল বৃষ্টি হইয়া অনেক সময় বৃক্ষ আদির অনেক অনিষ্ট করে কিন্তু ইহা দ্বারা জগতের কোন না কোন প্রয়োজন ও মঙ্গল সাধন হয় সন্দেহ নাই।

বরফ বা হিমশীলা। জল শীতল হইয়া ক্রমে জমিয়া যায় এবং তাহাতে বরফ হয়। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত অত্যন্ত শীতল, সেখানকার সমুদ্র পর্ব্বতাকার বরফ রাশিতে আচ্ছন্ন থাকে। হিম-প্রধান ইংলণ্ড এবং আর আর দেশে শীতকালে বাস্প সকল মেঘ রূপ না ধরিয়া এক কালে বরফ হয় এবং তাহাই ভয়ানক রূপে বৃষ্টি হইয়া পথ ঘাট ছাদ জলাশয় এককালে ছাইয়া

ফেলে। আমাদের দেশ অনেক উষ্ণ, এজন্য এখানে তে-মন বরফ দেখা যায় না কিন্তু জল জমাইয়া তাহা এক প্রকার তৈয়ার করা যায়। হিমালয় পর্ব্বত অত্যন্ত শীতল বরফ সেখানে রাশি প্রমাণ হইয়া আছে। বরফ অতি শুভ্র এবং লঘু অর্থাৎ হালকা। সমুদ্র সকলের উপরি-ভাগে ইহা ছাদের ন্যায় ভাসিতে থাকে, জল-জন্তুগণ তাহার নিম্নে সুখে বিচরণ করে এবং শীত হইতে অনেক পরিত্রাণ পায়। বরফে অনেক বৃক্ষাদির মূল ও মুকুল সকল শীতের হস্ত হইতে রক্ষা করে, অনেক জল-শূন্য স্থান উর্ব্বরা করিয়া দেয় এবং চক্র হীন গাড়ী চালাই-বার জন্য সুন্দর পথ প্রস্তুত করে। বরফ জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং তাহার উপর দিয়া সচ্ছন্দে যাতা-য়াত করা যায়।

যে জলকে আমরা সামান্য বোধ করি তাহা কখন বাস্প, কখন মেঘ, কখন শিশির, কখন কুজ্ঝটিকা, কখন শীল এবং কখন বরফ এই রূপে বহুরূপী সাজিয়া কখন পৃথিবীতে, কখন আকাশে, কখন সমুদ্রে কত স্থানে কত কাণ্ড করিতেছে—এক এক আকারে কত বিশেষ বিশেষ উপকার করিতেছে। যিনি এক পদার্থ হইতে এই বহুরূপ উৎপাদন করিতেছেন কি বিচিত্র তাঁহার শক্তি! জগতের অসংখ্য পদার্থকে অসংখ্য রূপে রা-খিয়া তিনি যে ইহার মঙ্গলের জন্য কত উপায় বিধান

করিতেছেন তাহা আমরা সহজ চক্ষে দেখিতে পাই না। বিজ্ঞান যত শিক্ষা করা যায়, তাঁহার মহিমা কৌশল দেখিয়া মন ততই আশ্চর্য্য ও ভক্তি রসে আর্দ্র হয়।

রামধনু।

রামধনু সকলেই দেখিয়াছেন। তাহা কি মনোরম শোভাই ধারণ করে! এদেশীয় অনেকের বিশ্বাস আছে, রামধনু, রাম ও ইন্দ্রের ধনুঃ। কিন্তু উহা কাহারও ধনুঃ নহে এবং কোন প্রকার জড় পদার্থও নহে; কেবল কয়েক প্রকার রঙ্ ধনুর আকারে মিলিত হইয়া রামধনু উৎপন্ন হয়। তাহা যদি রাম অথবা ইন্দ্রের ধনুঃ হইত, তাহা হইলে কেবল বৃষ্টির সময়েই উদিত হইত না; অন্য সময়েও হইত। আর বৃষ্টির সময়েও সূর্য্যের আলোক ভিন্ন হয় না। অতএব সহজে ইহাই বোধ হয় যে, বৃষ্টি ও সূর্য্যের আলোক হইতে কোন প্রকারে তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাস্তবিকও তাহাই হয়।

সকল প্রকার রঙ্ই আলোকের অংশ বিশেষ মাত্র, অর্থাৎ আলোক কতকগুলি বর্ণের সমষ্টি বই আর কিছুই নহে। কিন্তু যেমন দুগ্ধের মধ্যে ছানাও থাকে, ঘৃতও থাকে, অথচ দুগ্ধের মধ্যে ঐ সকল দেখা যায়

না; সেইরূপ আলোকের মধ্যে রঙ্ সকল থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যেমন কৌশল করিয়া দুগ্ধ হইতে ছানা ও ঘৃত বাহির করা যায়, তদ্রূপ আলোক হইতেও রঙ্ সকল বাহির হইতে পারে। কতক বস্তু আছে, তাহাদিগকে আড়াল দিলেও আলোক আসিতে পারে। তাহাদিগকে স্বচ্ছপদার্থ কহে—যেমন জল, কাচ, অভ্র, বাতাস ইত্যাদি। ত্রিকোণ বা অন্য আকারের স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া আসিয়া, যদি তাহার কোন কোণ দিয়া আলোককে বাহির হইতে হয়, তাহা হইলে উহা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া নানা প্রকার বর্ণে প্রকাশিত হয়। এই কারণেই বিলোয়ারি ঝাড়ের ত্রিকোণ কাচ আলোকে ধরিলে তাহা হইতে নানা প্রকার মনোহর বর্ণ সকল বাহির হয়। জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ; তাহা যখন নানা প্রকার কোণ বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাতেও আলোক পড়িয়া ঐরূপ হইতে পারে। বৃষ্টির সময় জল বিন্দু সকল নানা প্রকার কোণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তখন তাহাতে সূর্য্যের কিরণ লাগিলে ঐরূপে নানা প্রকার বর্ণ বাহির হয়। ইহাই রামধনু।*

* রামধনু অনায়াসে তৈয়ার করিয়া দেখা যাইতে পারে। মুখের মধ্যে জল লইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে থুৎকার প্রদান করিলে সেই জল বিন্দু সকলে আলোক লাগিয়া নানা বর্ণের রামধনু বাহির হয়।

সূর্য্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হয়। কিন্তু মধ্যাহ্নে অর্থাৎ সূর্য্য আমাদের মস্তকোপরি থাকিলে তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে; একটী—থালে খানিক জল ঢালিয়া, তাহাতে আলতা অথবা অন্য কোন রঙ্ অল্প পরিমাণে গুলিয়া যদি থালের উপরি হইতে সোজা সুজি দৃষ্টি করা যায়; তাহা হইলে সেই রঙ্ প্রায় দৃষ্ট হয় না, কিন্তু থালের পাশ হইতে দেখিলে সেই রঙ্ সুন্দররূপ দৃষ্ট হয়। সেইরূপ, প্রাতঃকালের ও বৈকালের রামধনু আমরা পাশাপাশি দেখি বলিয়া তাহা সুন্দর-রূপ দেখা যায়। এবং মধ্যাহ্নের রামধনু আমাদের উপরে থাকে পাশা-পাশি দেখা যায় না, এজন্য তৎকালীন রামধনু দেখিতে পাই না।

এখন এই একটী প্রশ্ন হইতে পারে, রামধনু ধনুর ন্যায় বক্র হয় কেন? ইহার কারণ এই, যাহারা ভুগোল পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পৃথিবী কদম ফুল বা কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার। এবং ঐ লেবুর ছাল যেমন তাহার চারিদিকে বেড়িয়া থাকে, পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুরাশিও তদ্রূপ তাহাকে গোলাকারে বেড়িয়া আছে। ধনুর আকার গোল-আকারের অংশ মাত্র। বায়ুতে যে মেঘ থাকে তাহাও বায়ুর আকারে ধনুর ন্যায় বক্র থাকে। সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হইবার

সময় জলবিন্দু সকলও ধনুর আকারে থাকে। এজন্য তাহাতে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া, তাহা হইতে যে বর্ণরাশি (অর্থাৎ রামধনু) প্রকাশিত হয়, তাহাও ধনুরাকার হয় এই প্রকার রামধনু ধনুর ন্যায় বক্র হইয়া থাকে।

উপরি হইতে আরম্ভ করিয়া রামধনুকে এই সকল বর্ণ দৃষ্ট হয়। ১ম লোহিত, ২য় পাটল, ৩য় পীত, ৪র্থ হরিৎ, ৫ম নীল, ৬ষ্ঠ ধূমল, ৭ম বায়লেট। লোহিত ও পীত বর্ণে মিশিয়া পাটল হয়, এজন্য তাহা লোহিত ও পীতের মধ্যে এবং তদ্রূপ হরিতবর্ণ পীত ও নীলের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

কি সুন্দর ধনু, আজি গগণ উপরে।
নীল লাল নানা বর্ণে ঝকমক করে॥
পূবের আকাশ খানা যুড়ে রহিয়াছে।
কে যেন সোণার তারে তারে গাঁথিয়াছে॥
নীলকান্ত মণি দিয়ে গড়া তার দেহ।
ত্রিভুবনে হেন ধনু দেখে নাই কেহ॥
রামের ধনুক ইহা বলে সর্ব্ব জন।
কি সাধ্য গড়িবে রাম ধনুক এমন॥
হইয়াছে জলবিন্দু যাঁর ভুজ বলে।
যাঁর করে শূন্যোপরে চন্দ্র সূর্য্য চলে।
অম্বরের পুচ্ছে রঙ্ দিল যার কর।

যার কর চিত্র করে মক্ষি মধুকর ॥
নানা জাতি পুষ্প যাঁর করে বর্ণ পায়।
যাঁর কর সাজাইল আকাশের কায় ॥
আমাদের দেহ যাঁর করে করে দান!
তাঁ করে এ ধনুর হয়েছে নির্ম্মাণ ॥

ভূমিকম্প।

আমরা দেখিতে পাই, কখন কখন কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ এক এক বার ভুমিটা কাঁপিয়া উঠে এই কাঁপনিকে ভূমিকম্প বলে। ইহা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার; কিন্তু আমাদের এদেশে যেরূপ হয় তাহা কিছুই নয় বলিলেও বলা যায়। এক এক দেশে এরূপ ভূমিকম্প হয় যে তাহাতে ঘর দোয়ার সব পড়িয়া যায়; বড় বড় গ্রাম ও নগর মাটীর নীচে বসিয়া পড়ে; হাজার হাজার মানুষ, গরু ও আর কত জীব জন্তু মরিয়া যায়; আগে যে স্থান সমভূমি ছিল তাহা হয়ত গভীর জলাশয় হয়; এবং আগে যে স্থানে জলে পূর্ণ ছিল তাহার উপর হয়ত এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত দেখা যায়। ভূমিকম্পে আরও কত শত ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়। আমাদের দেশে যদি বড় অধিক হইল তাহা হইলে হয়ত দেয়াল প্রভৃতি ফাটিয়া যায় ইহার অধিক আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু উপরে

যে সকল ভয়ানক কাণ্ডের কথা বলা গেল তাহা ইউ-রোপের ইটালী প্রভৃতি এবং আমেরিকা খণ্ডের অনেক অনেক স্থানে কত শত বার হইয়া গিয়াছে। এসকল মনে করিতে গেলে আমাদের নিকট গল্প বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক এসব হইয়াছে এবং আজও মধ্যে মধ্যে হইতেছে। ভূমিকম্প হইবার আগে বাতাস ভারি স্থির হয় এবং জল অত্যন্ত নড়িতে থাকে। তাহার পর মাটীর ভিতর হইতে ঝন ঝন গুম গুম এইরূপ কামান বা বজ্র ধ্বনির ন্যায় এক প্রকার ভয়ানক গম্ভীর শব্দ উঠিতে থাকে। এই সময় সমুদ্র তোলপাড় হইয়া জলটা একবার তীর ছাপাইয়া অনেক দূর উঠে; আবার তীর ছাড়াইয়া অনেক নীচে গিয়া পড়ে; এই প্রকার বারম্বার হইতে থাকে। হয়ত কোন কোনটা পাৎকো এবং ফোয়ারা এক কালে শুকাইয়া যায়, আবার হয়ত কোনটা হইতে ময়লা জল ক্রমাগত বাহির হইতে থাকে। তাহার পর ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। ইহার প্রথম কাঁপনিটাই সচরাচর অত্যন্ত ভয়ানক এবং তাহাতেই অধিক অনিষ্ট ঘটে। সমুদ্রে ঝটিকা হইলে যেরূপ তরঙ্গ উঠিতে থাকে, ইহাতে মাটিটা সেইরূপ উচ্চনীচ হইয়া পড়ে এবং এপাশ ওপাশ করিয়া নড়িয়া বেড়ায়। ইহাতেই বাড়ী ঘর পড়িয়া যায়। তার পর হয়ত পৃথিবীর খানিক স্থানের মাটী ফাঁক হইয়া পড়ে এবং তাহার ভিতর

হইতে ধোঁয়া, গরমজল, কর্দ্দম প্রভৃতি পদার্থ মহা তেজে বাহির হইতে থাকে।

যখন এই প্রাকার বড় বড় ভূমিকম্প হয় তখন কম্পন একবার হইয়াই স্থির হয় না; হয়ত একটু একটু থামিয়া বারম্বার হইতে থাকে, এমন কি কোথাও কোথাও দুই তিন দিন ধরিয়া মাঝে মাঝে এই ভয়ানক ঘটনা হইয়া থাকে। ইহার পর, যদি নিকটে আগ্নেয় পর্ব্বত থাকে তাহাতে অত্যাচার আরম্ভ হয়। ধোঁয়া, আগুনের শিখা, গরম পাথর, রাশি রাশি ছাই এবং গলা ধাতুর স্রোত ইত্যাদি উহার ভিতর হইতে প্রবল বেগে নির্গত হয়। ইহাকেই অগ্ন্যুৎপাত কহে। এই অগ্ন্যুৎপাতে কত কত গ্রাম একবারে মাটীর নীচে পুতিয়া গিয়াছে। ইটালির একস্থান খুঁড়িয়া তাহার নীচে ঘর দোয়ার বাসন ও আর আর অনেক জিনিস পত্র পাওয়া গিয়াছে এবং সেখানে যে সকল মানুষ অগ্ন্যুৎপাতে মরিয়াছিল তাহাদের অবশিষ্ট হাড় মাথার খুলি দেখা গিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের তেজে কখন কখন পর্ব্বতের এক এক ধার ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং এক প্রকার দ্রব পদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাতে গ্রাম নগর ভরাট করিয়া ফেলে। অতএব ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত সকল ভূমিকম্প হইতে সংঘটন হয়।

এই ভূমিকম্প কি জন্য হয় ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, যাহারা বিজ্ঞান শাস্ত্র জানেন না তাঁহারা বলিবেন যে

বাসুকীর সহস্র ফণা আছে এক এক ফণায় পৃথিবীকে ১২ বৎসর করিয়া ধরিয়া রাখে; অতএব যখন এক এক বার মাথা বদলান তখন কাজে কাজেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। আর কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে " পৃথিবী ক্রমে ক্রমে পাপে ভারী হইতেছে এজন্য বাসুকীর কষ্ট বোধ-হয় এবং তিনি এপাশ ওপাশ করেন সুতরাং পৃথিবী কাঁপিয়া ভূমিকম্প হয়। " এসকল যে অলীক কথা তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোধ হইবে। একতঃ ১২ বৎসর কি ২০ বৎসর ভূমিকম্পের সময় নিরূপণ নাই হয়ত দশ বৎসর কিছুই নাই, হয়ত একবৎসরেও ২।৩ বার বা অধি-কও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদি বাসুকীর মাথা নাড়া-তেই এরূপ হইত তাহা হইলে বাসুকী সমস্ত পৃথিবী মা-থায় ধরিয়া আছে, সুতরাং পৃথিবীর সকল স্থান একবারে কাঁপিয়া উঠিত। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যে এক দেশে যখন ভূমিকম্প হয়, তাহার কিছু দূরের লোক কিছুই টের পায় না। তৃতীয়তঃ পৃথিবী কেমন করিয়া আছে। যাহারা এবিষয়ের যাথার্থ মত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহা বাসুকী বা অন্য কোন বস্তুর উপরে নাই, শূন্যে রহিয়াছে। অতএব বাসুকীর সহিত ভূমি-কম্পের কোন সম্পর্কই নাই।

ভূমিকম্প হইবার অন্য কারণ আছে। এই পৃথিবীর মধ্যে যেমন সোনা, রূপা লোহা ও কয়লা প্রভৃতির খনি

আছে, সেইরূপ গন্ধক, সোরা ও আর কতকগুলি বস্তুরও খনি আছে, তাহাদিগকে দাহ্যবস্তু বলে অর্থাৎ তাহারা একটু উত্তাপ পাইলেই গলিয়া যায়। আবার এদিকে চুণ তৈয়ার করিবার জন্য পোড়ান জোঙ্গরাতে জল দিলে যখন গরম হয় ও ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ যখন লোহার গুঁড়া ও গন্ধক একত্র করিয়া মাটীর নীচে পোতা যায় এবং তাহাতে একটু জল দেওয়া যায় তখন তাহা গরম হয় ও ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে যখন একটা কোন বস্তু আগে জমিয়া চাপ হইয়া থাকে পরে যখন গলান যায় তখন তাহা ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক জায়গা লয়। অতএব যখন গন্ধক লোহা কি অন্য কোন দাহ্যবস্তুর বৃহৎ চাপ সকল পৃথিবীর মধ্যে একটু জল পাইয়া গরম হয় ক্রমে তাহা গলিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং অধিক জায়গার জন্য তোল পাড় করিতে থাকে। ইহাতে কাছের বস্তু সকল ঠেকাঠেকি ও ঘষাঘষি হইয়া আরও অনেক দূর গোলযোগ উপস্থিত করে। সুতরাং ভূমি কাঁপিতে থাকে এবং কোন কোন স্থান ফাটিয়া সেই ভিতরের গরম বস্তু সকল বাহির করিয়া ফেলে। অতএব পৃথিবীর ভিতরকার বস্তু সকল গরম হইয়া ছড়াইয়া পড়িলেই ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভূমিকম্প হইবার আর একটি

কারণ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে। প্রথমে একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিলে তাহা সহজ হইবে। মনে কর যদি একটা ফাঁপা লোহার ভাঁটার মধ্যে জল পূরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, আর ক্রমাগত তাহা আগুনে তপ্ত করা যায় তাহা হইলে সেই ভিতরের জল গরম হইয়া ক্রমে বাষ্পের আকার ধারণ করিবে। জল বাষ্প হইলে বিস্তারিত হইবে এবং ভাঁটা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে। ভাঁটা সেই বেগ অনেকক্ষণ দমন রাখিতে পারে কিন্তু তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে ভাঁটাটি কাঁপিতে থাকিবে এবং তাহার যে দিক্ অশক্ত, বাষ্পরাশি সেই দিক্ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রবল বেগে বাহির হইয়া পড়িবে। যদি ভাঁটার সব দিক্ সমান শক্ত হয় তাহা হইলে তাহা চূর্ণ হইয়া যাইবে।

পৃথিবীর উপরিভাগটা সেই রূপ প্রস্তর মৃত্তিকাদি কঠিন ছালে ঘেরা আছে, কিন্তু ইহার গর্ভ অর্থাৎ ভিতর অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব পদার্থে পূর্ণ; সুতরাং তাহা হইতে বাষ্প ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে। পৃথিবীর ছাল অতি কঠিন বলিয়া অনেক দমন রাখে, কিন্তু উত্তাপ বেশী হইলে বাষ্প সকল অধিক বিস্তারিত হয় এবং পৃথিবীর ছাল যে দিকে অশক্ত থাকে তাহা ভেদ করিয়া বাহিরে আইসে। বাষ্প বাহির হইলে ভিতরটা সুস্থ হয়, পরে

ভগ্নস্থান প্রস্তরাদি দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সেই বাষ্পের এমন তেজ যে, যে স্থান দিয়া তাহা বাহির হয়, তাহার নিকটস্থ অনেক দূর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলে ইহাতেই ভূমিকম্প হয়। এবিষয়ে জর্ম্মণি দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হামবোল্‌ডের ন্যায় অনুসন্ধান কেহই করেন নাই। তাঁহার মতে সকল সময়েই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে ভূমিকম্প হইতেছে। যদি ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে যথার্থই পৃথিবীর ভিতর উষ্ণ দ্রব-পদার্থ থাকে এবং তাহা হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উঠিয়া পৃথিবীর ছাল ঠেলিতে থাকে তাহা হইলে এরূপ হইবার আশ্চর্য্য কি ?

যে যে স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮ এ মার্চ্চ ইটালিদেশের দক্ষিণ-ভাগে একটি ভূমিকম্প হয় তাহাতে ৩০ ক্রোশের মধ্যে একখানি ঘর রাখে নাই এবং প্রায় একলক্ষ লোক ধ্বংস করিয়াছে। ৩।৪ বিঘা পরিমাণ জমী আধপোয়া পথ দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। বৃহৎ বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। পর্ব্বত সকল উত্তর মুখ হইতে পূর্ব্ব মুখে, বৃক্ষ শ্রেণীসকল সরল রেখা হইতে বক্র রেখায়, এক জনের শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র অপরের উদ্যান মধ্যে, এক জনের বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান অন্যের ক্ষেত্র মধ্যেস্থাপিত হইয়াছিল।

ইটালির আরও অনেক স্থানে এরূপ ঘটনা হইয়াছে কিন্তু আমেরিকাতেই ভূমিকম্পের বিষয় অধিক শুনা যায়। আগে বলা গিয়াছে যে আমাদের দেশে এ উৎপাত প্রায় কিছুই নাই। যেখানে আগ্নেয় পর্ব্বত অধিক সেই খানেই ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব কিন্তু তথাপি ৩৪ বৎসর হইল এই ভারতবর্ষেই এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। যেখানে সিন্ধুনদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার ঠিক পূর্ব্বদিগে কচ্ছ নামে এক দেশ আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ঐ দেশের একধার প্রায় ১৩ হস্ত বসিয়া যায়। ঐ স্থানটি এক্ষণে জলে প্লাবিত রহিয়াছে। এবং তাহার নাম রন্ন হ্রদ হইয়াছে। উহার নিকট প্রায় ৫০ ক্রোশ স্থান আবার অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এবং তথায় অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়া সে স্থানটি "আল্লাবন্দর' অর্থাৎ ঈশ্বরের বাঁধ বলে। এইরূপ কতস্থানে কত ভয়ানক ব্যাপার হয়। সে সকলেই পরমেশ্বরের মহিমাতে পরিপূর্ণ। ভূমিকম্পদ্বারা পর্ব্বত ও দ্বীপ সকল উৎপাটিত হয় এবং ইহা না হইলে পৃথিবীর ভিতর সকল গোলযোগ হইয়া এককালে ভূমি জলে পূর্ণ হইতে থাকে।

জোয়ার ভাঁটা

প্রতি দিন দুই বার করিয়া যে সমুদ্রে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা কি প্রকারে সম্পন্ন হয় তাহাও জানা আবশ্যক। জলের ঐরূপ বৃদ্ধি ও হ্রাসকে জোয়ার ভাঁটা বলে।

চন্দ্রের আকর্ষণ প্রযুক্ত জোয়ারভাঁটার উৎপত্তি হয়। চন্দ্র পৃথিবীর স্থল ভাগকে যে পরিমাণে আকর্ষণ করিতেছে, জল ভাগকেও সেরূপ আকর্ষণ করিতেছে। জল তরল বস্তু, এই হেতু জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কিন্তু স্থল কঠিন এজন্য স্ফীত হয় না।

চন্দ্রই যে জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ, এবিষয় আমাদের দেশীয় পূর্ব্বকালের লোকদিগেরও অবিদিত ছিলনা। তাহার প্রমাণ এই যে, অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন লোকেরা বলেন, চন্দ্র সমুদ্রের পুত্র, তজ্জন্য চন্দ্রকে দেখিলেই সমুদ্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যদিও তাঁহারা চন্দ্রকে সমুদ্রের পুত্র বলিয়া কল্পনা করেন কিন্তু চন্দ্র দ্বারা যে, সমুদ্রের জল স্ফীত হয়; এবিষয় তাঁহারা যে অবগত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চন্দ্র যে দিকে সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে তখন সেই দিকেই জলের বৃদ্ধি অর্থাৎ জোয়ার হয় এবং চতুর্দ্দিগস্থ

জল সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ঐ সঙ্কোচের নাম ভাঁটা। এইহেতু চন্দ্রই জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ।

দিন রাত্রির মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীর একদিকে কেবল একবার মাত্র থাকে, এজন্য পৃথিবীর যে অংশটী যখন চন্দ্রের দিকে থাকে তখন সেই দিকেই জোয়ার হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা না হইয়া দিন রাত্রে দুইবার করিয়া জোয়ার হয়, ইহা আরও বিস্ময়জনক বলিতে হইবে। কি প্রকারে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হয় তাহা এই চিত্রের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতেছে।

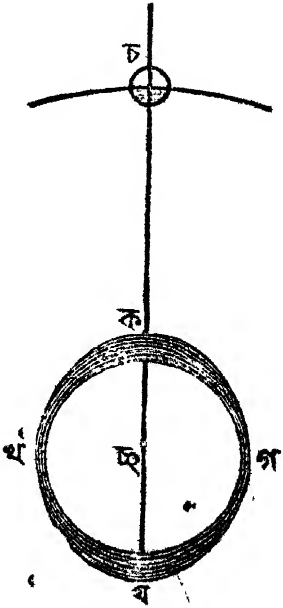

এই চিত্রে—চ—চন্দ্র, কখঘগ—পৃথিবী, —ছপৃথিবীর

কেন্দ্র। এইটী উত্তমরূপ বুঝিবার জন্য মনে কর পৃথিবী জল দ্বারা বেষ্টিত। এখন ক চিহ্নিত জলভাগ চন্দ্রের অধিকতর নিকট, এজন্য চন্দ্র ক চিহ্নিত জল ভাগকে অধিক বলে আকর্ষণ করাতে ঐ স্থানের জল স্ফীত এবং খ ও গ স্থানের জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য যখন ক স্থানে জোয়ার, তখন খ ও গ স্থানে ভাঁটা হইল। ঘ চিহ্নিত জল চন্দ্র হইতে কখগ অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী এজন্য চন্দ্র অন্যান্য জলভাগ অপেক্ষা ঐ জল ভাগকে অল্পবলে আকর্ষণ করে।

এখন পৃথিবীর কেন্দ্র ছ, ঘ অপেক্ষা চন্দ্রের দিকে অধিক বলে আকৃষ্ট হওয়াতে কিছুদূর উত্থিত হয়, অর্থাৎ উপরের জল বৃদ্ধি হওয়ায় কেন্দ্র আর পুর্ব্বস্থানে থাকে না; কিছু উপরে সরিয়া যায়। এ জন্য ঘ কেন্দ্র হইতে কিছু পরিমাণে দূরবর্ত্তী হওয়াতে তথায় পৃথিবীর আকর্ষণ অল্প হইয়া যায়। সেই স্থানের জল যে আকর্ষণ শক্তিতে বদ্ধ ছিল এখন তাহার হ্রাস হওয়াতে সেই জল নত হইয়া পড়ে সুতরাং জোয়ার হইয়া থাকে। এজন্য ঘ চিহ্নিত স্থানেও জোয়ার হয়। যখন ক চিহ্নিত জলভাগে জোয়ার হইল তখন তাহার বিপরীত ঘ চিহ্নিত স্থানেও হইবে। এবং ভাঁটাও ঐরূপ যখন খ চিহ্নিত জল ভাগে ভাঁটা হইবে তখন গ স্থানেও হইবে। এজন্য

২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীতে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হইয়া থাকে।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা গণনা দ্বারা কি প্রকারে জোয়ার ভাঁটার নিরূপণ করেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটা হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্র তিথি-অনুসারে যখন যে স্থানে থাকে, তখন সেই অনুসারে জোয়ার ভাঁটা হয়। দশমীর দিবস চন্দ্র ঠিক ৬ ঘণ্টা ৮ মিনিটের সময় আমাদের দিকে থাকে এজন্য গঙ্গায় ঐ সময় জোয়ার হয়, এবং প্রতি তিথিতে ৪৮ মিনিট অন্তর জোয়ার হইয়া থাকে, অর্থাৎ একাদশীর দিন ৬ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটের সময় জোয়ার হয়, দ্বাদশীর দিন ৭ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটের সময় হয়—ইত্যাদি।

চন্দ্রই জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ। কিন্তু সূর্য্য যে জোয়ার ভাঁটার কারণ নয় এরূপ নহে। সূর্য্য দ্বারাও জলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র অপেক্ষা এতদূরে আছে, যে তাহার আকর্ষণ দ্বারা অল্প পরিমাণে জলের বৃদ্ধি হয়।

কি প্রকারে জোয়ার হয় তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন দিন যে জোয়ার প্রবল হয় কেন, তাহার কারণ পরে লেখা যাইতেছে।—

যে সময় চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ে একত্র হইয়া এক

স্থানের জল আকর্ষণ করে, তখন সেই স্থানের জল অপেক্ষাকৃত অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে জোয়ার অতিশয় প্রবল হয়। অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্য ও চন্দ্র সমসূত্র-পাত থাকাতে উভয়ই এক দিগের জল আকর্ষণ করে, এজন্য অমাবস্যার জোয়ার অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে; ইহাকেই আমাদের দেশের লোকেরা কটাল বলে। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য বিপরীত দিকে থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চন্দ্র যে দিকে থাকে, সে দিকে ও তাহার বিপরীত দিকে জোয়ার হইয়া থাকে। সেই রূপ সূর্য্য যে দিক্‌কার জল আকর্ষণ করে সে দিক ও তাহার বিপরীত দিকেরও জল স্ফীত হইয়া উঠে। এখন দুই দিকের জল আবার উভয়ে আকর্ষণ করাতে অমাবস্যার ন্যায় জল অধিক পরিমাণে স্ফীত হয়, ইহাকেও সকলে কটাল কহে। তাহার পর হইতে প্রতি তিথিতে চন্দ্র সূর্য্য যতই সমসূত্রপাত হইতে বিভিন্ন হয় ততই জোয়ারের হ্রাস হইয়া যায়, সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে জোয়ারের কিছুই তেজ থাকে না।

জোয়ারের জল সকল স্থানে সমান দূর উঠে না, যে সকল জলাশয় অল্প বিস্তৃত তাহাতেই অধিক দূর উত্থিত হয়, কিন্তু অতিবিস্তৃত যে জলাশয় তাহাতে অল্প পরিমাণে জল উঠে। অত্যন্ত প্রশস্ত পাসিফিক্‌ মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপে জোয়ারের সময় ১। ১॥

হাত প্রমাণ জল বৃদ্ধি হয়; কিন্তু আমেরিকার আমেজন নদীর মুখ হইতে তাহার অভ্যন্তরে ২২০ ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক দূর জোয়ার হয়। ঐ জোয়ার শেষ হইতে এত সময় লাগে যে তাহার সমুদায় জল নির্গত না হইতে হইতে অন্য জোয়ারের জল নদী মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। যখন ভাঁটার সময় নদীর জল সমুদ্রের দিকে পড়ে তখন যদি সমুদ্রে জোয়ার হয়, তবে সেই ভাঁটা ও জোয়ারের জল পরস্পর প্রতিহত হইয়া অতিশয় উচ্চ হইয়া উঠে এবং সেই জল সতেজে নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতিশয় বেগে গমন করিতে থাকে, ইহাকেই বান কহে। বানের সময় জীব জন্তু, নৌকা প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার দিকে পড়ে তাহাই জলমগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতাস্থ গঙ্গা নদীর বানের সময় বড় বড় জাহাজ, নৌকা দুলিতে থাকে এবং কখন কখন নঙ্গর ছিঁড়িয়া যায়। উক্ত আমেজন নদীর বান এত ভয়ঙ্কর হয় যে, পর্ব্বতের ন্যায় ১৫০ হাত উচ্চ হইয়া প্রবল বেগে গমন করিতে থাকে।

উদ্ভিদ্ তত্ত্ব

বৃক্ষ, গুল্ম, তৃণ, লতা প্রভৃতি যাহারা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পত্র, পুষ্প ও

ফল প্রসব করে তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলা যায়। এই উদ্ভিদ্ সকল পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই আছে। বৃহৎ বৃহৎ অরণ্য সকল শত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে দগ্ধ মরুভূমি এবং বরফ রাশিতে আচ্ছন্ন অত্যন্ত শীত-প্রধান মেরু সন্নিহিত দেশেও ইহার কোন না কোন চিহ্ন পাওয়া যায়। পর্ব্বত সকলের গহ্বরে এবং সমুদ্র সকলের গর্ব্ভেও উদ্ভিদ্ সকল বিরাজ করিতেছে এবং পৃথিবীর উদর খনন করিয়া তন্মধ্যে ইহারদিগের রাশি প্রমাণ অবশেষ প্রস্তরাকারে রহিয়াছে দেখা যায়।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ না থাকিলে ইহার কিছুমাত্র শোভা থাকিত না এবং ইহাতে কোন জীবজন্তু বাস করিতে পারিত না। ইহারা সামান্য তৃণবেশ ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলকে কেমন হরিৎবর্ণ পরিচ্ছদে শোভিত করিয়াছে! কোথাও নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী ভূষিত উদ্যান, কোথাও লতামণ্ডপ বেষ্টিত উপবন, কোথাও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র এবং কোথাও বা সরোবরবিকীর্ণ, কত প্রকার জললতা হইয়া সৌন্দর্য্যে জগৎকে সুসজ্জিত করিয়াছে।

পৃথক্ পৃথক্ এক একটী উদ্ভিদেও শোভার অভাব নাই। ইহার নয়ন স্নিগ্ধকর হরিৎবর্ণ উজ্জ্বল পল্লব-সকল, কোমল কমনীয় চিত্র বিচিত্র কুসুমরাজি আল-

শ্বিত সুপক্ব ফলপুঞ্জ, সুমধুর গন্ধ ও সুশীতল ছায়ায় কাহার না চিত্ত হরণ করে ?

উদ্ভিদগণ কত জীবের বাসস্থান, আহার ও ঔষধ তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ইহারা মনুষ্য জাতিকে অশেষ প্রকারে উপকার করে। আমাদিগের খাদ্য, আমাদিগের বেশবিন্যাস, আমাদিগের বাসভবন, আমাদিগের গৃহ সজ্জা, আমাদিগের বিবিধ শিল্পযন্ত্র আমাদিগের বাণিজ্যপোত এবং আবশ্যকীয় আরও কতশত দ্রব্য উদ্ভিদ হইতেই প্রস্তুত হয়। ইহারা না থাকিলে আমাদিগের জীবন ধারণ ও সুখসচ্ছন্দ কিছুই হইত না।

এই উদ্ভিদ সকলের গঠন প্রণালী পরীক্ষণ এবং কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিলে মন প্রশস্ত ও উন্নত হয়, এবং সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসের সঞ্চার হয়।

আমরা আপাতত জন্তু ও উদ্ভিদগণের শারীরিক কার্য্যবিষয়ে যত প্রভেদ আছে মনে করি বস্তুতঃ তত নাই। জন্তুগণ যেমন পদচালনা করিয়া আহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, উদ্ভিদগণ সিকড় দ্বারা সেইরূপ করিয়া থাকে। ইহাদিগের শিকড় সকল যে দিকে পুষ্টিকর পদার্থ অধিক পরিমাণে পায়, সেইদিকে বৃদ্ধি হয়, যে দিকে তাহা না থাকে সে দিকে গমন করে

না। জন্তুগণ যেমন আপন আপন খাদ্য বাছিয়া লয়, বৃক্ষেরাও সেইরূপ এক ভূমি হইতে মিষ্ট কি তিক্ত যাহার যে খাদ্য গ্রহণ করে। জন্তুগণের যেমন পাক-স্থলী আছে ইহাদিগের শিকড়েই তাহার কার্য্য হয়। জন্তুগণের শরীরে যেমন রক্ত প্রণালী সকল আছে ইহাদের শরীরেও রস সঞ্চরণ করিবার সেইরূপ পথ সকল দেখা যায়। জন্তুদের রক্তের এবং ইহাদের রসের অনেক পদার্থই একরূপ। ইহাদিগের পল্লব সকল শ্বাসযন্ত্রের ন্যায়; তাহাদ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহন হয়। জন্তু ও উদ্ভিদ্‌দিগের উৎপত্তির নিয়মও এক প্রকার। ইহাদিগের পুষ্পের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ এবং সন্তান রক্ষার উপযোগী গর্ব্ভস্থলী সকলই আছে। এতদ্ভিন্ন জন্তুদের শরীর যেমন অস্থিচর্ম্মে নির্ম্মিত ইহাদের শরীরেও অবিকল সেইরূপ রচনা প্রতীত হয়। বস্তুতঃ স্পঞ্জ প্রভৃতি নিকৃষ্টশ্রেণীর জন্তু এবং অনেক উদ্ভিদের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহাদের মধ্যে প্রভেদ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সুকঠিন।

বৃক্ষশরীর।

বৃক্ষ-শরীরে শিকড়, ছাল, কাষ্ঠ, মজ্জা, রস, পত্র, ফুল, ফল, ও বীজ এই কয়েকটি প্রধান অংশ। এই গুলির বিষয় প্রথম আলোচনা করা যাউক। পরে কোন্

কোন প্রকার বৃক্ষে যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ আছে তাহারও পরিচয় দেওয়া যাইবে।

১ম।—শিকড়। উদ্ভিদ সকলের শিকড় দেখিতে সুন্দর নয়, এজন্য তাহা প্রায় ভূমির মধ্যেই লুক্কায়িত আছে। কিন্তু অনেক কুরূপ বস্তুর গুণ যে মহৎ, শিকড় সকল তাহার এক প্রমাণ স্থল। ইহাদের উপরে বৃক্ষের জীবন ও সমুদায় উন্নতি নির্ভর করে। ইহারা উদ্ভিদ্‌গণকে এক স্থানে অটল ও বদ্ধমূল করিয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে নলের ন্যায় প্রণালীসকল আছে, এবং তাহা দ্বারাই ভূমি হইতে রস আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষের সার আর আর সকল অঙ্গে সঞ্চারিত হয়, নতুবা সে সকল জীবিত থাকিতেও বৃদ্ধি হইতে পারে না। শিকড় সকল অসংখ্য প্রকার। কতকগুলি সরলভাবে গভীর মৃত্তিকার মধ্যেই নামিতে থাকে, কতকগুলি স্থূল বা সূক্ষ্ম হইয়া চারি পার্শ্বে ক্রমাগত প্রসারিত হইতে থাকে এবং কতকগুলি বা ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে। যে বৃক্ষের জন্য যেরূপ আবশ্যক, জ্ঞানময় জগদীশ্বর তাহাকে ঠিক সেইরূপই প্রদান করিয়াছেন। বৃক্ষের উপরে শাখা প্রশাখা যত দেখা যায়, এক এক স্থলের শিকড়ের শাখা প্রশাখা তাহা অপেক্ষা ন্যূন নয়। যাহা হউক স্থান বিশেষে শিকড় সকলের গতিপরিবর্ত্তন যারপর নাই আশ্চর্য্য। একটা শিকড় চলিতে চলিতে সম্মুখে

প্রস্তর দ্বারা বাধা পাইলে থামিয়া যায় না; কিন্তু বক্র হইয়া যে দিকে সহজ পথ খুঁজিয়া পায়, সেই দিকে গমন করে। ইহা মরুভূমিতে পতিত হইলে উর্ব্বরা ভূমির দিকে ধাবিত হয় এবং একটি কূপের প্রস্তরময় তটে থাকিলে একভাগ ঊর্দ্ধ দিকে ও একভাগ অধোদিকে চালনা করিয়া কোমল মৃত্তিকা অন্বেষণ করে। শিকড় সকল হইতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং তাহার কিছু না কিছু এদেশের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন।

২য়।—বৃক্ষের ত্বক্ বা ছাল। বৃক্ষের ছালের উপরে সূক্ষ্ম আর একটি আবরণ বা ছাল আছে। ইহা কোমল পুষ্পদল হইতে কর্কশ কন্টক পর্য্যন্ত বৃক্ষের সমুদায় ভাগ ঢাকিয়া রাখে, এজন্য ইহার রচনাও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই বাহিরের ত্বকের অনেক স্থলে ছিদ্র আছে এবং তাহা দিয়া বৃক্ষের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। ভিতরের ত্বক্ হরিৎবর্ণ। ইহা বৃক্ষের মাংসের ন্যায়, এবং কখন এক থাক, কখন বা দুই থাকও থাকে। বৃক্ষের ছাল অসভ্য লোকেরা পরিধান করিয়া থাকে আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিরা যে বল্কল ধারণ করিতেন তাহাও আর কিছুই নয়। কোন কোন বৃক্ষের ছাল চর্ম্মের ন্যায় ব্যবহার হয়। পরন্তু কুইনাইন প্রভৃতি মহৎ মহৎ ঔষধ সকল বৃক্ষের ত্বক্ হইতেই প্রস্তুত হয়।

৩য়।—কাষ্ঠ। কাষ্ঠই বৃক্ষদিগের অস্থি। ইহাকে আবার দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। প্রকৃত কাষ্ঠ ও ভারী কাষ্ঠ. এই শেষ ভাগটি নূতন পদার্থ সকল জমিয়া হয় এবং তাহা অপেক্ষাকৃত কোমল ও পাণ্ডুবর্ণ। ইহাই কঠিন হইয়া পরে প্রকৃত কাষ্ঠ হয়। কাষ্ঠের এক খণ্ড গুঁড়ি ভাগ ভাগ করিয়া ছেদন করিলে তাহাতে বৃত্ত অর্থাৎ গোলাকার রেখা সকল ক্রমে ক্রমে সাজান দেখা যায়। ইহাতে কাষ্ঠকে বড় সুন্দর দেখায়; কিন্তু ইহা দ্বারা আর একটি মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা বৃক্ষের বয়ঃক্রম গণনা করা যায়। অনেক বৃক্ষে এক এক বৎসর এক এক থাক কাষ্ঠ হয়, সুতরাং তাহাতে যত বৃত্ত, তাহার বয়সও তত বৎসর। কিন্তু কোন কোন বৃক্ষে এক এক থাক কাষ্ঠ হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প সময়ও লাগিয়া থাকে সুতরাং তাহাদের বয়স তদনুসারেই গণনা করিতে হয়। বৃক্ষের কাষ্ঠে মনুষ্যগণের রন্ধন, গৃহ নির্ম্মাণ, নানাবিধ যন্ত্র, গৃহসামগ্রী এবং আরও সহস্র সহস্র উপকার সাধন হয়।

৪র্থ।—অনেক কাষ্ঠের মধ্যে মজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পথ্যের জন্য যে সাগুদানা ব্যবহার করি তাহা এই প্রকার এক বৃক্ষের মজ্জা হইতে প্রস্তুত হয়। এই মজ্জা হইতে বৃক্ষদিগের যে কি উপকার তাহা এখনও সম্পূর্ণ রূপে জানা যায় নাই।

৫ম।—আমাদিগের শরীরে যেমন রক্ত, বৃক্ষদিগের শরীরে তেমনি রস। বস্তুতঃ জন্তুদিগের রক্তে যে যে পদার্থ আছে, বৃক্ষদিগের রসেও প্রায় সে সকল দেখা যায়। এই রস কোন বৃক্ষে মিষ্ট, কোন বৃক্ষে তিক্ত, কোন বৃক্ষে টক বা কষায় নানারূপ হয়, এমন কি এক বৃক্ষেরই নানা স্থানে নানা প্রকার দৃষ্ট হয়। ইহা কিরূপে উৎপন্ন ও পরিপাক হয় এবং বৃক্ষের সর্ব্ব স্থানে প্রবাহিত হইয়া তাহার সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল সাধন করে তাহা রস সঞ্চরণ কার্য্য আলোচনার সময় উল্লেখ করা যাইবে। বৃক্ষে রস যতক্ষণ, তাহার জীবনও ততক্ষণ; রস না থাকিলেই তাহা শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। বৃক্ষের ফুল, ফল এবং ছাল হইতে মধু, গুড়, চিনি প্রভৃতি কত প্রকার সুমিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গোপাদপ বৃক্ষের রসে দুগ্ধও পাওয়া যায়।

৬ষ্ঠ। পত্র।—আমাদের শরীরের মধ্যে যেমন কঙ্কাল অর্থাৎ অস্থিময় শরীর আছে এবং তাহার উপরে মাংস ও ছাল, এইরূপ রচনা বৃক্ষের গুঁড়ি ও শাখা প্রশাখাতেই নয়, ইহার প্রত্যেক পত্রেও দেখা যায়। বস্তুতঃ পত্র সকল শাখার এক প্রকার রূপান্তর মাত্র। আমাদের যেমন পিঠের দাঁড়া এবং তাহার দুই দিকে পঞ্জর সকল; পত্রের মধ্যস্থলে একটী মোটা কঠিন শিরা আছে এবং তাহার দুই দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায়

পঞ্জর সকল দেখিতে ঠিক যেন জালের ন্যায় বোনা। যখন পত্র জীর্ণ হইয়া বা পড়িয়া যায় তখন এই ছাঁদটি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এই পঞ্জর সকলের মধ্যস্থিত ছিদ্রগুলি এক প্রকার কোমল চর্ম্ম দিয়া পূর্ণ এবং সমুদায় পত্রটি একটি উপত্বক বা ছালে আবৃত। পত্রের উপর পিঠ ও নীচের পিঠ পরস্পর হইতে অনেক ভিন্ন এবং কখন কখন তাহাদিগকে দুই থাকে পৃথক্ করা যায়। উদ্ভিদ্ বিশেষে পত্র সকলের আকার যে কত প্রকার তাহার সংখ্যা করা যায় না। গোল, ত্রিকোণ, পঞ্চকোণ, শতকোণ, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বাকৃতি, তরবারের ন্যায় দীর্ঘ এবং করতলের ন্যায় প্রশস্ত ও অঙ্গুলিযুক্ত সকল আকারই দেখা যায়। ইহাদের ধার সকল কোথায়ও ঢেউ খেলাইতেছে, কোথাও যেন সূঁচ দিয়া সাজান রহিয়াছে এবং দুই তিন বা বহুখণ্ডে বিভক্ত। তেঁতুল প্রভৃতির এক একটী পাতা ২০।২৫ খণ্ড হইয়া তাহার এক এক খণ্ড এক একটী স্বতন্ত্র পত্রের ন্যায় বোধ হয় এবং মধ্যস্থলের শিরাটি ডাঁটার ন্যায় হইয়া ঐ উপপত্র গুলিকে ধারণ করিয়া রাখে। লতা সকল হইতে যে এক একটি দীর্ঘাকার সূত্র বাহির হইয়া জড়াইয়া থাকে, তাহাও পত্রের এক প্রকার গঠনমাত্র। পত্রের উপরিভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম থাকে তাহাতেই উহা এমত মসৃন বোধ হয়। পত্র

সকলের আকারের ন্যায় পরিমাণও ভিন্ন ভিন্নরূপ। শৈবালের পত্রত এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র না হইলে স্পষ্টরূপ দেখা যায় না ; আবার লঙ্কাদ্বীপে এক প্রকার তালবৃক্ষ আছে তাহার পরিধি অর্থাৎ বেড় ২০।২৫ হাত এবং তাহার আড়ালে ২০।২৫ ব্যক্তি লুকাইয়া থাকিতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ হইতে পত্র সকল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্খলিত হয়। কাহারও শীত, কাহারও গ্রীষ্ম বা শরৎ এবং কাহারও অনেক বৎসরের পর এই ঘটনা হয়। আমাদের দেশে শীতের অবসানেই অনেক বৃক্ষ পত্রহীন হয় এবং আবার বসন্তের আগমনে নূতন পল্লবে সজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে থাকে। পত্র সকলে বৃক্ষের কেবল সৌন্দর্য্য বা ছায়া দান হয় ইহাই নয়, তাহা দ্বারা রস পরিপাক এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া বৃক্ষের জীবন রক্ষা করে। এই কার্য্যের জন্য আমাদের শরীরের লোমকূপের ন্যায় ইহাদের পত্রের উপরে অসংখ্য ছিদ্র আছে, অণুবীক্ষণ দিয়া তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

৭ম। পুষ্প।—পুষ্পই বৃক্ষের অলঙ্কার। ইহা রূপে ও সৌরভে জগতের মন যেমন হরণ করে তাহা কাহার অবিদিত? পুষ্পের অনেকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। প্রথমে হরিৎবর্ণ বোঁটার সহিত একটি আসন তাহাতে

ঐ বর্ণের ৩ কিম্বা ৫টি পাতা থাকে। তৎপরে দল বা পাপড়ি সকল ভিতরের দিক্ ঘেরিয়া থাকে; এই গুলিই শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত এবং তাহাতেই পুষ্পের শোভা ও সৌগন্ধ। পাপড়ী সকল সংখ্যায় ৫।৭।৯।১১।১৫ এইরূপ বিযোড় দেখা যায় এবং এক দুই বা বহু শ্রেণীতে সজ্জিত হইয়া থাকে। পরে সূত্রের ন্যায় পদার্থ সকল; তাহাদিগকে কেশর বলে। ইহাদের মধ্যে যে গাছি সকল অপেক্ষা স্থূল তাহার নাম গর্ভ কেশর, আর আর গুলির নাম পরাগ কেশর। পুষ্পের রঙ্গিন পত্র গুলি না থাকিলে ক্ষতি নাই তাহারা কেবল ইহাদেরই রক্ষার জন্য। কিন্তু কেশর গুলি না থাকিলে ফল জন্মিতে পারে না, পরাগ কেশর সকলের উপরিভাগে এক প্রকার গুঁড় গুঁড় রেণু থাকে, গর্ভ কেশরে তাহা প্রবিষ্ট হইয়া নিম্নে বীজ কোষে পড়িতে পারিবে বলিয়া একটি নল আছে। ইহাতে পুষ্পের মধুও থাকে।

পুষ্প সকলের মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উৎপন্ন হয়; কতকগুলি একত্র স্তবকে স্তবকে শোভা পাইতে থাকে। ইহাদের গঠন ও পরিমাণ পত্র সকলের ন্যায় বিচিত্র। পদ্ম, চম্পক, গুলাব, অপরাজিতা, শেফালিকা, অশোক, ধূতূরা, বক এইরূপ গুটিকত নাম স্মরণ করিলেই বুঝা যায়। নারিকেলফুল, ঝুমকা প্রভৃতি কত

অভরণই পুষ্পের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। সকল ফুলের মধ্যে বিকুটোরিয়া পদ্ম ফুল অতি বৃহৎ দেখা যায়। বৃক্ষের পত্রের ন্যায় পুষ্পের পত্রেও ছিদ্র আছে এবং এই সকল দ্বারা তাহার শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ ও আকার প্রকারের বৃদ্ধি হয়।

৮ম। ফল।—ফল উৎপাদন করাই বৃক্ষের শেষ কার্য্য এবং তাহাই স্থায়ী হইয়া নূতন বৃক্ষ সকল উৎপন্ন করে। পুষ্পদল সকল কিছুকাল বিকসিত থাকিয়া শুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন গর্ভ কেশরের নিম্ন দেশে যে বীজকোষ থাকে তাহা স্থূল হইয়া ফলরূপে পরিণত হয়। ফলের মধ্যে সার পদার্থ বীজ। তাহারই রক্ষণ ও পুষ্টি সাধনের জন্য জগৎপাতার অনন্ত কৌশল দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। ফলের উপরি ভাগে ছাল থাকে তাহা হয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বা চর্ম্মের ন্যায় দৃঢ়। তাহার মধ্যে এক প্রকার শিষ থাকে এবং সেই শিষের মধ্যে বীজের অবস্থান। যে ফলের ছাল পাতলা তাহার শস্য পরিমাণে অধিক থাকে। ফলের আকার ও পরিমাণেরও সংখ্যা নাই। নারিকেল, তাল, খেজুর, আখ, জাম, তেতুল, পেয়ারা, আতা, আনারস, দাড়িম, কাঁটাল, লাউ এক একটী এক এক প্রকার। ইহাদের এক একটির বিষয় আলোচনা করিলে কত অদ্ভুত কৌশল প্রতীত হয়। কত

প্রকার আবরণে ও যত্নে ইহাদের বীজ গুলি রক্ষিত হয়। বড় বৃক্ষ হইলেই যে বড় ফল হইবে তাহার নিশ্চয় নাই, বৃহৎ বটবৃক্ষের ফল কত ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল। কুষ্মাণ্ড লতা হইতে কত বৃহৎ ফল জন্মে। ফল এক একটিও হয় এবং থলো থলো ও কাঁদি কাঁদিও ফলিয়া থাকে। কতকগুলি ফল পক্ব হইলে ফাটিয়া যায় এবং বীজ সকল আপনা হইতে ছড়াইয়া পড়ে, অন্য ফল সকল সেরূপ নয়। এই নিয়ম অনুসারে ফল সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন কোন ফল দুখানি ঢাকনিতে প্রস্তুত এবং তাহাদের মধ্যে একটি বা দুটি যোড়ন থাকে এবং বীজ সকল ঐ একটি বা দুটি যোড়নেই সংলগ্ন হইয়া থাকে।

৯ম। বীজ।—বীজের মধ্যে বৃক্ষের ভাবী অঙ্কুর থাকে, তাহাই বৃক্ষের মূল। ইহার রক্ষার জন্য ফলের ছাল ও শস্য মাত্র নহে। কিন্তু বীজেরও অতি কঠিন আবরণ আছে. এই আবরণ দুই থাক. কখন তিন থাক থাকে। তন্মধ্যে বাহিরের ছাল শিরাতে ব্যাপ্ত এবং অতি কঠিন ও মসৃন; তূলা প্রভৃতির বীজ লোম বা পক্ষযুক্ত। ভিতরের চর্ম্ম অতি পাতলা এবং শ্বেতবর্ণ। ছালের একধারে একটি গোলাকার শাদা দাগ দেখা যায়, কখন কখন ঐ স্থান হইতে একটি সূত্র ফলের সহিত সংযুক্ত থাকে। অঙ্কুরের যে স্থান হইতে শিকড়

বাহির হয় সেই স্থানে এবং বীজের শ্বেতবর্ণ চিহ্নের বিপরীত দিকে উভয় ছাল ভেদ করিয়া একটি ছিদ্র থাকে। লেবু প্রভৃতির বীজে উভয় ছাল যেখানে একত্রিত হয় সেই স্থানে একটি চিহ্ন থাকে এবং তাহা হইতে অপর দিকের চিহ্ন পর্য্যন্ত একটি শিরাও দেখা যায়। অঙ্কুর অতি কোমল পদার্থ এবং তাহার একটি স্বতন্ত্র আকার থাকে এবং চতুর্দ্দিকে মাংস তৈল প্রভৃতির ন্যায় পুষ্টিকর পদার্থ সঞ্চিত থাকিয়া তাহার পোষণ করে। অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়াই একদিকে শিকড়, অন্য দিকে কাণ্ড অর্থাৎ শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিতে থাকে।

উদ্ভিদ্ কার্য্য-প্রণালী।

উদ্ভিদ্ শরীর শিকড়, ছাল, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদিতে যেরূপ রচিত হইয়াছে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে, এখন উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে কি কি কার্য্য হয় এবং তাহা কি প্রকার প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা বলিতে অবশিষ্ট আছে। শরীর-রচনা পাঠ করা অনেকের পক্ষে নীরস বোধ হইতে পারে, কিন্তু কার্য্য প্রণালী জ্ঞাত হওয়া অধিক আনন্দকর।

১।—রস-সঞ্চরণ। বৃক্ষেরা শিকড় দ্বারা ভূমি হইতে

প্রথমে আপনাদের পোষণ উপযোগী তরল পদার্থ আ-কর্ষণ করে, তাহাই পরিপাক হইয়া রস হয়। এই রস বৃক্ষ শরীরের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে, এই জন্য শিকড়ের অগ্রভাগ হইতে রস-প্রণালী সকল উত্থিত হইয়াছে। ইহারা ঠিক্ জন্তুদের রক্ত প্রণালী সকলের ন্যায়। ইহারা কোমল কাষ্ঠের মধ্যদিয়া এবং মাজ্জের চারি দিকে গোলাকাররূপে স্থাপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখা এবং পল্লব সকল পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে বিস্তারিত হইয়াছে। জন্তুদের সমুদায় রক্ত যেমন হৃদয় যন্ত্রে একত্রিত হয় এবং নিঃশ্বাস বায়ুর সহযোগে আশ্চর্য্য কৌশলে সংশোধিত হইয়া থাকে। বৃক্ষদের সমুদায় রস সেইরূপ পত্র সকলে উপস্থিত হয় এবং তথায় বায়ুর সহযোগে বিশুদ্ধ হয়। জন্তুদের শরীরে রক্ত সংশোধন হইয়া কতকগুলি নূতন প্রণালী দ্বারা যেমন সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয় এবং তাহাতে অস্থি, মাংস, মজ্জা সকলের পুষ্টি সাধন করে। বৃক্ষদিগের সংশোধিত রসও কতকগুলি নূতন প্রণালী দ্বার পত্রের ডাঁটার মধ্যদিয়া ছালের ভিতর দিকে আইসে এবং সমুদায় বৃক্ষের পুষ্টি সাধন করে। ছালের মধ্যে নানাবিধ আশ্চর্য্য রসও সঞ্চিত হয়। তাহাতেই ওক বৃক্ষের বল্কলে চর্ম্মের গুণ, পেরুদেশীয় ছালে জ্বরঘ্ন কুইনাইন, দারুচিনিতে সুগন্ধ আস্বাদ এবং চন্দন কাষ্ঠে স্নিগ্ধকর মধুর সৌরভ উৎপন্ন হয়। প্রত্যা-

গত রসে নূতন ছাল সম্পূর্ণ বৰ্দ্ধন করে এবং তাহা হইতে রস নির্গত হইয়া পর বৎসরের জন্য ছাল প্রস্তুত হয়। রসের কিঞ্চিৎ অংশ ফুল ও ফলে যায়। কিন্তু পত্র দ্বারা যেমন সমুদায় বৃক্ষটির উপকার, ইহাদের দ্বারা সেরূপ হয় না। পত্রের ন্যায় পুষ্পেরও কোন কোন অংশ আ-লোক ও বায়ু শুষিয়া লয়; কিন্তু তাহা পুষ্প ও ফলেরই উপকারে আইসে। এইরূপ ইহাদের মধ্য হইতে যে কিছু রস নিঃসৃত হয়, তাহাও কেবল ইহাদেরই জন্য। যখন ইহাদের আবশ্যক কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়, তখন ইহাদের প্রণালী সকল বৃক্ষের অন্যান্য প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যায় এবং কাজে কাজেই পক্বফল বোঁটা সুদ্ধ বৃক্ষ হইতে পতিত হয়।

রস সঞ্চরণের বিবরণ মোটামুটি একরূপ জানা গেল; কিন্তু যখন ভাবিতে যাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রস কিরূপে সঞ্চারিত হয়? একই ভূমি হইতে খর্জ্জুর ইক্ষু প্রভৃতিতে মিষ্ট রস এবং নিম্ব ও বিল্বলতায় তিক্ত ও মারাত্মক গুণ কিরূপে উৎপন্ন হয়? তখন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয় এবং সেই অনন্তকৌশলকর্ত্তার অচিন্ত্য শক্তি ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যায় না। মনুষ্য হাজার বিদ্বান্

হইয়াও একটি তৃণ পত্রের রচনা আলোচনা করিতে গিয়া অবাক্ ও স্তব্ধ হয়েন !!

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

প্রথম দিবস।

(উপক্রমণিকা।)

সুশীলা। মা, আমরা অট্টালিকার উপর চিরকাল থাকি; কত রকমের সামগ্রীপত্রে বাড়ীঘর সাজান দেখি, যা যখন চাই, তা তখন পাই-কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু মা আজ এই বাগানটিতে এসে যে সুখ পাচ্চি এমন সুখত কখনই পাই নাই। চারিদিক্ কেমন নিস্তব্ধ! সম্মুখে নদীর জল কল কল করিয়া বহিতেছে, মন্দ মন্দ বায়ু হিল্লোলে শরীর শীতল হচ্চে; আবার কত প্রকার ফুল ফুটিয়া গন্ধে আমোদ কর্‌চে। দেখ মা, যত সন্ধ্যা হচ্চে পশ্চিম দিকটি কেমন সোণার রঙে উজ্জ্বল দেখাচ্চে—আমার বোধ হচ্চে ঐখানেই বুঝি স্বর্গপুরী। বা! সূর্য্য কত বড় মূর্ত্তি ধরেছে—রাঙ্গা যেন জবাফুল।

সত্যপ্রিয়! মা, আবার পূর্ব্বদিকটি পানে একবার চেয়ে দেখ, পূর্ণিমার চন্দ্র কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে

উঠ্‌ছে। এমন মনোহর ছবি খানিত কখনও দেখি নাই। যত দেখি দেখিয়া আশ মিটে না। ইহার কিরণে সমুদায় জগৎটি আনন্দময় দেখাচ্চে।

সু। মা, আমার এখান ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। এস আমরা এই খানেই থাকি।

মাতা। সৃষ্টির শোভা যে দেখে নাই তার চক্ষু বিফল। এর কাছে কি আর কোন শোভা আছে? আমরা হাজার কোঠা বালাখানায় থাকি, এমন নির্ম্মল বাতাস পাই না; এমন প্রসারিত আকাশ ও তাহার সৌন্দর্য্য কিছুই দেখি না। কেবল মানুষের হাতগড়া চিত্র বিচিত্রে আর কত সুখ দিবে? এখানে স্বয়ং জগদীশ্বর স্বভাবের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। যে দিকে চাই তাঁরই অদ্ভুত অনুপম রচনা! এই জন্য অনেক জ্ঞানী ঋষিগণ নগর ও লোকালয় ছাড়িয়া নির্জ্জনে বাস করেন। সৃষ্টির আশ্চর্য্য কার্য্যসকল আলোচনা করত সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত কালযাপন করেন। ইহার অপেক্ষা জগতে আর সুখ নাই।

সত্য। মা, আমরা কি গৃহে বসিয়া সৃষ্টির কার্য্য-সকল আলোচনা করিতে পারি না?

মা। সৃষ্টির অসংখ্য কার্য্যে জগদীশ্বরের অনন্ত কৌশল ও অপার মহিমা। আমরা চক্ষুতে তাহার কতটুকু বা দেখিতে পাই। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রের

আলোচনা করিলে জ্ঞানচক্ষে সমুদায় জগৎ দর্শন হয়, এবং তাহা হইলে গৃহে বসিয়াও অপার আনন্দলাভ করিতে পারি।

সু। বিজ্ঞানশাস্ত্র কি মা? তাকি আমরা বুঝ্‌তে পার্‌বো।

সত্য। পাঠশালের পণ্ডিত মহাশয় সে দিন ঐ শাস্ত্রটির নাম করেছিলেন এবং তিনি বল্লেন কিরূপে দিন রাত হয়, কিরূপে গ্রহণ হয়, কিরূপে ঝাড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত হয়, এই শাস্ত্রে সে সকল জানা যায়।

মা। দেখ সুশীলে! সত্যপ্রিয় তোমার ছোট ভাই হয়ে তোমার চেয়ে বেশী বুঝেছে। বোঝাবার ইচ্ছা থাক্‌লে আর বোঝাবার লোক থাক্‌লে কিছুই ভারি নয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে এই তিনটি বিষয় জানিতে পারিবে।—(১) জগতে যতপ্রকার পদার্থ আছে; (২) সেই পদার্থ সকল যত প্রকার কার্য্য করে; (৩) ঈশ্বরের যে অখণ্ড নিয়ম অনুসারে সেই কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়।—আর ইহা জানিতে পারিলেই সকল হইল।

সু। যা শিখলে এত জ্ঞান হয় তা আমাকে মা শেখাতেই হবে—অবোধ বলে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। তুমি বলেছ ইচ্ছা থাকিলে সবই হয় তা আমাকে এই জ্ঞান দেও আমি আর কিছুই চাই না।

স। মা! তুমি আমাকে কি শেখাবে না? শিক্ষক মহাশয় বলেন "বিদ্যালয়ে কি সকল শিখান যায়; ইংরেজদের ছেলেরা মাবাপের নিকটেই অধিকাংশ উপদেশ পায় এবং জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

মা। বৎসগণ। জ্ঞানশিক্ষার জন্য তোমাদের এত দূর প্রয়াস, ইহাতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। আজি রাত্রি হইয়াছে বাটীতে ফিরিয়া চল; কল্য হইতে তোমাদিগকে উপদেশ দিব। আজি এখানে যে সকল রমণীয় শোভা দেখিলে, তাহা মনে গাঁথিয়া রাখ এবং মনের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তাকে নমস্কার কর।

দ্বিতীয় দিবস।

পরমাণু।

মা। সুশীলে! সেই দিন যে কথা বলেছিলাম, তোমার মনে আছে?

সু। হাঁ মা, তুমি বলেছিলে বিজ্ঞান শাস্ত্রটী জানতে হলে ৩ টী বিষয় শেখা চাই;—(১) জগতে যত প্রকার পদার্থ আছে; (২) সেই পদার্থ সকল যত প্রকার কার্য্য করে; (৩) ঈশ্বরের যে অখণ্ড নিয়ম অনুসারে সেই কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়।

মা। সত্যপ্রিয়! একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতে পার?

সু। যেমত সূর্য্য একটি পদার্থ; ইহার কার্য্য আলোক ও উত্তাপ দেওয়া, আর প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে সূর্য্য উদয় হইয়া সেই কার্য্য করে, এইটি ঈশ্বরের অখণ্ড নিয়ম বোধহয়। অথবা যেমন বীজ একটি পদার্থ; তাহাহইতে বৃক্ষ হয়; আর বৃক্ষ জন্মাইবার জন্য বীজটিকে মাটীতে পুঁতিয়া জলদিতে হয় এই তাঁহার নিয়ম।

মা। তুমি বুঝিয়াছ: কিন্তু এটি জানিবে যে, পদার্থ অসংখ্য প্রকার, সুতরাং তাহাদের কার্য্যেরও সংখ্যা নাই। আর এক এক কার্য্যের জন্য অনেক নিয়ম আছে, বিজ্ঞান শাস্ত্র যত জানিবে ততই এ সকল বুঝিতে পারিবে। আজ এস আমরা পদার্থের বিষয়ে কথা বার্ত্তা কই।

সুশীলে! বলদেখি পদার্থ কারে বলে?

সু। আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ বলে। যেমন ঘটী, বাটী, কলম ছুরী ইত্যাদি।

সত্য। সুদ্ধ দেখিতে যা পাই তা ছাড়া কি আর পদার্থ নাই? বাতাস ত একটা পদার্থ কিন্তু বাতাসকেত দেখা যায় না। আমি বলি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা জানা যায় তাহা পদার্থ। চক্ষু দ্বারাই আমরা অনেক বস্তু জানি বটে, কিন্তু শব্দ কর্ণদ্বারা শুনিতে পাই, গন্ধ নাসিকা দ্বারা

টের পাই, রস জিহ্বা দিয়া আস্বাদন করি এবং বাতাস কি উত্তাপ ত্বক্ অর্থাৎ শরীরের ছাল দিয়া জানা যায়।

মা। ঠিক্ বলেছ, কিন্তু সত্যপ্রিয় জান এমন এক প্রকার পদার্থ আছে তাহা তোমার কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পার না ?

সত্য। আমিত এমন কিছু পদার্থ আছে বুঝিতে পারি না ?

মা। তুমি বোঝ কিসের দ্বারা ?

সত্য। কেন আমার মন আছে তাই বুঝিতে পারি।

মা। সেই মন্‌কে কি চক্ষু দিয়া দেখিতে পাও, না কাণ দিয়া শুনিতে পাও ?

সত্য। কই মা, মনত দেখাও যায় না, শুনাও যায় না, আর কোন ইন্দ্রিয় দিয়াও জানা যায় না। তবে ইহাকে কি প্রকারে জানি ?

মা। ভাবিয়া দেখ, মন কেবল মনেই বুঝা যায়। এই মন একটি পদার্থ। দেখ ক্ষুদ্র কীট হইতে মানুষ পর্য্যন্ত অসংখ্য জীবে এই মন কত প্রকার। আবার ঈশ্বর যিনি, তিনও আমাদের মনের ন্যায় অরূপী। তাঁহাকে কোন ইন্দ্রিয় দিয়া জানা যায়না, মন দিয়াই বুঝা যায়।

স। মা! তোমরা অনেক কথা বলিলে। ইহাতে আমার বোধ হয় পদার্থ দুইপ্রকার। কতক গুলিকে শরী-

রের ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায়, আর কতক গুলিকে মন-দিয়া বুঝা যায়। এই দুই প্রকার পদার্থের নাম কি কি?

মা। যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহা জড় পদার্থ; আর যাহা কেবল মনের গোচর তাহা জ্ঞান পদার্থ। তোমরা প্রথমে জড় পদার্থের বিষয় শিক্ষা কর, পরে জ্ঞান পদার্থের তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাইবে।

স। তবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাচ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাই জড় পদার্থ।

মা। সামান্যতঃ এইরূপ বলা যায় বটে, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রমতে যাহা কিছু পরমাণুদ্বারা প্রস্তুত এবং যাহার আকৃতি, বিস্তৃতি, অভেদ্যতা, অক্ষয়ত্ব, জড়ত্ব ও আকর্ষণ এই কয়েকটি গুণ আছে তাহাকে জড় পদার্থ বলে। তোমরা এক এক করিয়া ইহার বিশেষ বিবরণ না শুনিলে বুঝিতে পারিবে না।

স। পরমাণু কাহার নাম?

মা। মনে কর একটি মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মাটীর ডেলা যদি গুঁড়া করিয়া ফেলা যায়, তাহার একটি একটি গুঁড়া পিষিয়া আরও ছোট করা যাইতে পারে, সেই ছোটছোট অণু অর্থাৎ গুঁড়া যখন এত ক্ষুদ্র হয় যে আর কোন ক্রমেই ছোট হইতে পারে না, তখন তাহাকে

পরমাণু বলা যায়। এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু একত্রিত হইয়া শিশির বিন্দু হইতে মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং ধূলী কণা হইতে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত, পৃথিবী, সূর্য্য সকলই প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল বস্তু ভাগ ভাগ করিয়া আবার সূক্ষ্ম পরমাণু করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের অসাধ্য।

সত্য। বস্তু সকলকে কত ভাগ করা যায়?

মা। বস্তু সকল আমরা যত ভাগ করি আরও ভাগ করা যায়, যত সূক্ষ্ম অস্ত্র পাওয়া যায় ভাগ ততই ছোট হইতে পারে। কিন্তু যত ভাগ করা যাউক, অনুমানে বুঝা যায় যে শেষে কিছু অবশিষ্ট থাকিবেই; তাহাই পরমাণু। এই পরমাণু চক্ষেও দেখাযায় না, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করা যায় না বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়েরও গোচর হয় না। যাহা হউক বস্তু সকল কত সূক্ষ্ম হইতে পারে, গুটি কত দৃষ্টান্ত দেখিলে তাহার ভাব অনেক বুঝিতে পারিবে।

১।—এক বাটী জলে কিছু লবণ কি চিনি মিশাইলে সমুদায় জল লবণ বা চিনির স্বাদ হয়। সূঁচে করিয়া সেই জল এক বিন্দু তুলিলে তাহাতেও লবণ বা চিনির অংশ থাকে। সেই অংশ কত সূক্ষ্ম মনে কর।

২।—একটু আল্‌তা গুলিলে কত জল রক্তবর্ণ হয়। এই জলের এক এক কণায় আল্‌তার ভাগ আছে।

৩।—আমরা যে গন্ধ পাই তাহা গন্ধদ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু বাতাসের সহিত মিশিয়া নাশিকাতে সংযুক্ত হয় মাত্র। এই অণু কত সূক্ষ্ম অনুমান করা যায় না। একটি বৃহৎ গৃহ আধ রতি অর্থাৎ দুইধান প্রমাণ মৃগনাভির গন্ধে ২০ বৎসর পর্যান্ত পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তাহা কিছু মাত্র কমিয়াছিল বোধ হয় নাই। প্রতি দণ্ড বা মুহূর্ত্তে কি পরিমাণ মৃগনাভির অংশ বায়ুতে মিশিয়াছে মনে কর।

৪।—মাকড়সার জালের সূতা কত সরু দেখিতে পাও। কিন্তু একটি পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন যে, এক এক গাছি সূতাতে ২০ হাজার গাছি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র আছে।

৫।—সোণা পিটিয়া এত সরু সরু পাত করা যায় যে তাহার ৩,৬০.০০১ তিন লক্ষ ষাটি হাজার পাত উপর উপর রাখিলে এক বুরুলের মত মোটা হয়। প্লাটিনম্ নামে ধাতু হইতে এত সূক্ষ্ম তার করা যায় যে তাহার ৪২,০০, ০০ ০০০ বিয়াল্লিশ কোটি গাছি তার উপর উপর রাখিলে এক বুরুল মাত্র স্থূল হয়। রূপার তারের উপর সোণার হল করিলে সে সোণা কত সূক্ষ্ম হয় বলা যায় না।

৬।—অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একবিন্দু রক্তে এত কীটাণু দেখা গিয়াছে যে সমুদায় পৃথিবীতে তত মনুষ্য নাই,

এইরূপ লক্ষ লক্ষ কীট একত্র করিলে একটি বালুকাকণার মত হইবে। এখন ভাবিয়া দেখ সেই এক একটি কীটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পাকস্থলী ও রক্তবিন্দু আছে তাহা কত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম! মনে করিতে গেলে স্তব্ধ হইতে হয় এবং জগদীশ্বরের অপার কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া মন মোহিত হইয়া যায়। কিন্তু পরমাণু ইহা হইতেও অসংখ্যগুণে সূক্ষ্ম।

সু। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!!

সত্য। মা! এখন পরমাণু যে কত সূক্ষ্ম হইতে পারে তাহা বেশ বুঝিয়াছি। কিন্তু যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতেই এত অসংখ্য পরমাণু রহিয়াছে তখন একটি পর্ব্বত, কি এই পৃথিবী, কি সূর্য্য ইহাতে যে কত পরমাণু আছে তাহা কোন ক্রমে আমরা অনুমান করিয়াও উঠিতে পারি না।

মা। যাহা হউক, পরমাণু গুটিকত গুণ জানিয়া রাখ। পরমাণু গুলি যেমন ভাগ করা যায় না, সেইরূপ দগ্ধ করিয়া বা অন্য প্রকারে তাহা বিনষ্ট করিতেও কাহার সাধ্য নাই। তাহা চিরকাল একভাবে রহিয়াছে হ্রাসও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না। জড় জগতের সমুদায় বস্তু ও সমুদায় কার্য্য তাহাদিগের যোগাযোগেই হইতেছে। যখন তাহারা বিনষ্ট হইবে তখন জগৎও ধ্বংস পাইবে। একমাত্র ঈশ্বর তাহাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন,

তিনিই মনে করিলে তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারেন।

তৃতীয় দিবস।

মূলপদার্থ।

সত্য। মা। সে দিন যে তুমি বুঝায়ে দিলে যে এই জগতের সমুদায় জড় পদার্থ পরমাণুদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ত বুঝিয়াছি। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন যে পঞ্চভূতেরই সকল সৃষ্টি, সে কি?

মা। রসায়ন বিদ্যার কথা জানলে। ভাল তার মূলতত্ত্ব কিছু শিক্ষা কর। পূর্ব্বকালের লোকদের বিশ্বাস ছিল যে 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম' অর্থাৎ মাটী, জল আগুন, বাতাস আর আকাশ এই পাঁচটি ভূত অর্থাৎ মূল পদার্থে জগতের রচনা হইয়াছে, কিন্তু ঐমত সত্য নহে।

সু। মা, ভূত অর্থ কি মূল পদার্থ? আমি আর একটা কি ভাবিতে ছিলাম।

সত্য। তবে সকলের মূল বস্তু কি কি?

সু। কেন মা, ভূত অর্থ যদি মূল পদার্থ তবে মাটী, জল, বাতাস, আগুন দিয়াই ত সব জিনিস তৈয়ার হয়। দেখ, একখানা ইট, মাটী ও জল মিশাইয়া তৈয়ার হয়,

পরে রৌদ্র ও বাতাসে তাহা শুকাইয়া আগুন দিয়া পোড়াইলেই পাকা ইট হয়।

মা। তোমরা এই দুইটী কথা মনে রাখিবে। যে বস্তু একমাত্র, দুই কি অধিক পদার্থের যোগে প্রস্তুত হয় নাই, তাহাকে মূল, আদিম বা রূঢ় পদার্থ বলে। আর যে সকল বস্তু এই রূঢ় পদার্থ সকলের সংযোগে তৈয়ার হয়, তাহাদিগকে যৌগিক পদার্থ বলে।

মা। পঞ্চ ভূতকে মূল বা আদিম পদার্থ বলা যায় না। যেমন সামান্য লোকে মনে করিতে পারে যে একটা কোঠাঘরের মূল পদার্থ ইট, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা সেই ইট আবার মাটী, জল ইত্যাদিতে নির্ম্মাণ হইয়াছে। অতএব ইট যৌগিক পদার্থ। সেই-রূপ মাটী কি জলকে একটি রূঢ় বা মূল পদার্থ বলিলে দোষ হয়, তাহারাও যৌগিক পদার্থ। মাটীর মধ্যে গন্ধক, ধাতু প্রভৃতি অনেক মূল পদার্থ আছে। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বাতাস একত্র করিয়া জল তৈয়ার হয় এবং সেই জলকে সেই দুই মূল পদার্থে পৃথক্ করা যায়। তেজ অর্থাৎ আগুন সকল বস্তুর মধ্যে আছে, কিন্তু পৃথক থাকিতে পারে না, এইজন্য ইহা একটি স্বতন্ত্র মূলবস্তু বলিয়া গণ্য হয় না। বাতাসের মধ্যে অনেক প্রকার বাষ্প আছে। আর আকাশ অর্থাৎ শূন্য অর্থাৎ তাহা কিছুই নয়, শূন্যকে আর একটা পদার্থ বলিয়া

কি ধরা যাইবে? অতএব পঞ্চভূতে সকল সৃষ্টি হইয়াছে ইহা সামান্যতঃ বলা যায় বটে কিন্তু যথার্থ নয়।

সু। জল কি কি দুই বাতাসে তৈয়ার হয়?

মা। অম্ল-ন একটির নাম, কেন না ইহাতে অম্লের গুণ করে। আর একটির নাম জল-জন অথবা লঘু বায়ু।

সু। বাতাসে কি কি মূল বস্তু আছে?

মা। অম্লজন ও নৈত্রজন এই দুইটি প্রধান। ইহা ছাড়া আর আর পদার্থেরও অল্প পরিমাণ সহযোগ থাকে।

সত্য। তবে রূঢ় পদার্থ বোধ হয় অনেক গুলি আছে।

মা। পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত ৬০ টির অধিক রূঢ় পদার্থ আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। যথা, অম্লজন, জল-জন, অঙ্গার, ক্ষার, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র ইত্যাদি। যেমন বর্ণ মালায় ক খ প্রভৃতি বর্ণের যোগে সকল শব্দ হইয়াছে। সেইরূপ এই মূল পদার্থ গুলির যোগে সকল পদার্থই প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কালে ইহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক রূঢ় পদার্থ জানা যাইতে পারে।

সু। মূল পদার্থ সকল কি বাতাসের মত হইয়া

থাকে? না, আবার সোণা রূপার মত ভারী হইয়া থাকে?

মা। কতকগুলি স্বভাবতঃ বায়ু, কতকগুলি জলের ন্যায় দ্রব এবং কতকগুলি বা সোণা রূপা প্রভৃতির ন্যায় ঘন বা ভারী হইয়া থাকে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে ঘনকে দ্রব ও দ্রবকে বায়ু এবং বায়ুকেও ঘন বস্তু করা যায়।

সত্য। মূল পদার্থ তবে কি এক একটী পরমাণু নয়?

মা। পঞ্চভূতকে কি লোকে পরমাণু মনে করিত? সেইরূপ মূলপদার্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আছে কিন্তু এক এক প্রকার মূল পদার্থ রাশি প্রমাণ থাকিতে পারে। পরিমাণে যত ইচ্ছা তত অধিক হউক, কিন্তু তাহা এক প্রকারের পদার্থ যদি হয়, আর যদি তাহাতে অন্য কোন প্রকারের পদার্থ সংযুক্ত না থাকে তবে তাহাকে রূঢ় পদার্থ বলা যায়। আর একটি পদার্থ অল্প পরিমাণে থাকুক না কেন, তাহাতে নানাপ্রকার রূঢ় পদার্থ একত্রিত থাকিলেই তাহা যৌগিক পদার্থ।

সু। আচ্ছা মা, কোন্ পদার্থে কি রূঢ় পদার্থ আছে তা কি কেউ বলতে পারে?

মা। যাঁহারা রসায়নবিদ্যা যত জানেন, তাঁহারা বলিতে পারেন। তা না হইলে জল, বায়ুই তত্তই

ত্যাদি হইতে কিরূপে মূলবস্তু সকল বাহির হইল। চিকিৎসকেরা যখন রোগ পরীক্ষা, জল পরীক্ষা, কি বায়ু পরীক্ষা করেন তাহাও এই বিদ্যাবলে করিয়া থাকেন। আর শুনিয়াছ কাপড় হইতে চিনি বাহির করা যায়, তাহাও এইরূপে হইয়া থাকে।

সত্য। এ ত আমরা কখন দেখি নাই!

সু। বা কি আশ্চর্য্য! এ যে বাজীকরদের ভেলকীর মত বোধ হয়। তারা যেমন খাপরা টাকা করে, গোবর হইতে সূতা বাহির করে; কাপড় হইতে চিনি বাহির করাও ত সেইরূপ আশ্চর্য্য বোধ হয়।

মা। বাজীকরেরা যে কিছু করে, সে কেবল তাহাদের কৌশল দেখাইয়া আমাদের চক্ষে ধাঁধা দেয় মাত্র আমরা সহজে তাদের কৌশল ধরিতে পারি না। বস্তুতঃ সে সবই চাতুরী। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার সৃষ্টি-রাজ্যে নিয়ত যে বাজী দেখাইতেছেন তাহা সত্য এবং অনন্তকোটি গুণে চমৎকার। দেখ, তিনি যে কতকগুলি মূল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই সংযোগে পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, প্রাণী পতঙ্গ সকলই নির্ম্মাণ করিতেছেন, আবার সকলকে ভাঙ্গিয়া সেই মূল পদার্থে পরিণত করিতেছেন। যে মৃত্তিকা আমরা পদতল দিয়া মাড়াইয়া যাই তাহাই আবার সুন্দর ফুল ও সুপক্ব ফল হইয়া বৃক্ষশাখায় শোভা পাইতেছে, এমন কি মনুষ্যের

সুন্দর দেহ তাহাতেই রচনা হইতেছে। কিন্তু এ সকলি শেষে আবার যে মাটী সেই মাটী হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে ?

সত্য। মা, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি যে বলিয়াছিলে যে, যে পরমাণু-পুঞ্জে পদার্থ সকল প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একটিও নষ্ট হয় না, ঠিক্ কথা। দেখ মা, একটা গাছ পচিয়া মাটী হইল, সেই মাটী হইতে আবার কত গাছ হই-তেছে, সেই গাছ খাইয়া কত জন্তুর শরীর বাড়িতেছে। জন্তুর শরীর আবার মাটী হইয়া বৃক্ষের শাখা পত্র ও ফল ফুল হইতেছে।

সু। মা, আমাদের শরীর কি এর পর একটা গাছ হইবে ? সে না কেমন তর বোধ হয়।

মা। সুশীলে ! সেরূপ ত সর্ব্বক্ষণ হইতেছে। এই দেখ, একটা মশা আসিয়া আমার রক্ত পান করিয়া গেল সেই মশা মরিলে তাহার শরীরের রস অনায়াসে এক বৃক্ষে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার এই হস্তের রক্ত সেই বৃক্ষে গেল। আর এতই বা কেন ? মানুষ কি কোন জন্তু মরিয়া কি পচিয়া যাইতে দেখ নাই। তখন তার শরীর কোথায় যায় ? মাটী হইয়া পড়িয়া থাকে বা গাছ পালার সঙ্গে মিশিয়া যায়।

মা। আমার মনে বড় ভাবনা হল। তবেত আমরা কিছুই নয়।

মা। এমন মনে করিও না। আমাদের শরীরটা মাটী, মাটীই হইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের মন যাহা যথার্থ আমরা, তাহা চিরস্থায়ী ইহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। সাধুলোকে এইরূপে জগতের আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল দেখিয়া স্তব্ধভাবে সেই জগৎ কর্ত্তার মহিমা গান করেন। কিন্তু আবার সকল বস্তুর পরিবর্ত্তন ও অনিত্যতা চিন্তা করিয়া অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য ঈশ্বরকে অবলম্বন করত শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

চতুর্থ দিবস।

আকৃতি ও বিকৃতি।

মা। সুশীলে! বল দেখি, জড়পদার্থ কারে বলে?

সু। যাহা পরমাণু দ্বারা প্রস্তুত এবং যাহার আকার, বিস্তার, অভেদ্যতা, অবিনাশ্যতা, জড়ত্ব ও আকর্ষণ এই ছয়টি গুণ আছে তাহাকে জড় পদার্থ বলে।

মা। সকল জড় পদার্থ যে পরমাণু দিয়া তৈয়ার হইয়াছে তাহা তোমরা বুঝিয়াছ। এখন পদার্থের গুণ গুলি এক এক করিয়া বিবেচনা করা যাক্। আচ্ছা সত্যপ্রিয়! আকার কারে বলে বলিতে পার?

সত্য। মা, আমরা যত বস্তু দেখি সকলেরইত এক

একটি আকার দেখিতে পাই। চন্দ্রের আকার গোল, ঘরের আকার চারিকোণা, গাছের কত রকম আকারের কত পাতা; মানুষ, গরু ও জন্তুদেরও এক এক রকম আকার আছে।

সু।—আচ্ছা, বাতাসের কি আকার আছে?

সত্য। বাতাসের আকার আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু আমার বোধ হয় আকার এক প্রকার আছেই আছে। কিন্তু মা, সে কি প্রকার?

মা। যে সব বস্তু কঠিন, তার এক এক প্রকার আকার ঠিক্ থাকে; তাই তা লম্বা, গোল, তিন কোণা কি চারি কোণা ইত্যাদি বলিতে পারি। কিন্তু জল, বায়ু প্রভৃতি তরল বস্তু কোন ঠিক আকারে থাকিতে পারে না। দেখ জল যখন ঘটীর মধ্যে থাকে তখন সেই ঘটীর মত হইয়া থাকে, আবার বাটীতে ঢালিলে বাটীর মত, থালাতে ঢালিলে থালার মত হয়।

যাহাহউক, তাহাকে একটা না একটা আকার ধরিয়া থাকিতেই হইবে। বাতাসও সেইরূপ একটা ঘরের ভিতর থাকিলে তাহার আকার ঘরের মত, কলসীর ভিতর থাকিলে কলসীর মত এইরূপ বলা যায়। সমুদায় বাতাস যাহাকে বায়ু মণ্ডল বলে তাহার আকার গোল, পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। আর বায়ুর যে এক একটি সূক্ষ্ম কণা, তাহারও আকার আছে। আকার ছাড়া

জড় বস্তু নাই। এখন আকার কি, তোমরা বলিতে পার?

সত্য। আকার অর্থাৎ কোন পদার্থের চতুর্দ্দিকে সীমা বা চারি ধারের গঠন।

সু। আমরা পদার্থ সকলের নানা প্রকার রঙ দেখি তাহা কি তাহাদের আকার নয়?

সত্য। সে আকার কেন? ঘুড়ী সাদা, লাল, সবুজ কত রঙের আছে কিন্তু সকলেরই আকার চারি কোণা। অতএব নানা রঙে হইলেই আকার ভিন্ন ভিন্ন হয় না। আবার এক রঙের পদার্থ সকলও কত প্রকার আকারের দেখাযায়; তার দৃষ্টান্ত, সকল গাছের পাতায় সবুজ, কিন্তু কাহারও পাতা লম্বা, কাহারও গোল ইত্যাদি।

সু। আচ্ছা রঙ যেমন হউক, পদার্থ সকল ছোট বড় বলিয়াত আকার ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সত্য। ছোট বড় বলিয়া যে আকার ভিন্ন ভিন্ন হইবে এমত নয়। দেখ, রেকাব থালার চেয়ে কত ছোট, কিন্তু আকার দুয়েরই এক, দুয়েরই আকার গোল।

মা। সত্যপ্রিয় বেশ বলিতেছ। কিন্তু তোমরা এখন বস্তুর দ্বিতীয় গুণ যে বিস্তার, তাহারই কথা কহিতেছ।

সু। মা, ছোট আর বড় হওয়াকে কি বিস্তার বলে?

মা। বিস্তার অর্থ কোন বস্তু যত স্থান যুড়িয়া থাকে।

যে বস্তু অধিক স্থান যুড়িয়া থাকে তাহাকে বড় এবং যে অল্পস্থান যুড়িয়া থাকে তাহাকে ছোট বলা যায়। রেকাবের চেয়ে থাল অধিক স্থান যুড়িয়া থাকে এই জন্য রেকাবের চেয়ে থাল বড়।

সত্য। যেমন আকার নাই এমত বস্তু নাই, সেইরূপ স্থান যুড়িয়া নাই এমত পদার্থও নাই। আমার বোধ হয় আকার থাকিলেই বিস্তার থাকিবেক এবং বিস্তার থাকিলেই আকার থাকিবেক।

সু। বা! আকার যেন বিস্তারকে বেড়া দিয়া রাখিয়াছে।

মা। বিস্তারকে আর এক কথায় আয়তন বলে। বস্তুর আয়তন জানিতে হইলে তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধ জানা আবশ্যক। বস্তু লম্বে যত হয় তাহাকে দৈর্ঘ্য; চৌড়া বা ওসারে যতহয় তাহাকে প্রস্থ এবং এক পিঠ হইতে অন্য পিঠ পর্য্যন্ত যত পুরু হয় তাহাকে বেধ বলে। একখানা পুস্তকের আয়তন বা বিস্তার মাপিতে হইলে তাহা লম্বে কত, ওসারে কত এবং কত পুরু জানিলেই হয়।

সত্য। আচ্ছা এক একটা বস্তু খুব লম্বা এক একটা বস্তু খুব পুরু, তা কোন্‌টাকে বড় বলিব?

সু। যেটা খুব লম্বা তাকে লম্বে বড়, যেটা খুব পুরু তাকে বেধে অথবা পুরুতে বড় বলিব।

মা। একটা লম্বে বড় ও একটা বেধে বড় হইলেও হয়ত আয়তনে উভয়ে সমান হইতে পারে। একটি সোণার মোহর হইতে যদি ৬০ ক্রোশ দীর্ঘ সোণার তার প্রস্তুত হয়, তাহাতে তাহাদের আয়তনের বড় কমবেশী হয় না। তার যেমন লম্বে বড় আবার অতি সূক্ষ্ম; মোহর লম্বে বড় নয়, কিন্তু অনেক পুরু। অতএব উভয়ে সমান স্থান যুড়িয়া থাকে।

সত্য। আচ্ছা, পিটিলে কি আয়তন কমিয়া যায় না?

মা। পিটীয়া কিম্বা চাপিয়া বড় বস্তুকে ছোট করা যায় তা সচরাচরই দেখিতে পাও। কিন্তু স্বর্ণ প্রভৃতির ন্যায় কঠিনবস্তু পিটিলে অল্পই ছোট হয়। ইহাতে আরও দেখ তার লম্বা হইলেও মোহর অপেক্ষা অল্প-স্থান অধিকার করিতে পারে, কারণ পিটিয়া তাহার আয়তন কমান যাইতে পারে।

সু। একটি থাম কি খুঁটির দৈর্ঘ্য কি?

সত্য। তাদের উচ্চতাই তাদের দৈর্ঘ্য বোধ হয়।

মা। সকল পদার্থকে এক প্রকারে মাপা যায় না। গোল বস্তু হইলে তাহার পরিধি অর্থাৎ বেড় এবং ব্যাস অর্থাৎ মধ্যের পরিমাণ জানা চাই। কূপ কি পুষ্করিণী হইলে গভীরতাও মাপা আবশ্যক। পর্ব্বত কি প্রাচীরের উচ্চতা ধরিতে হয়।

সু। তবে যে পদার্থ যেরূপে যতস্থান অধিকার করিয়া থাকে সেই তাহার বিস্তার। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম হইলেও আবশ্যই কিছু না কিছু স্থান যুড়িয়া থাকিবে; অতএব তাহারও বিস্তার আছে সন্দেহ নাই।

সত্য। একটি বালুকা কণার বিস্তারের সঙ্গে এই পৃথিবী কি সূর্য্যের বিস্তার তুলনা করিলে কি আশ্চর্য্য হইতে হয়?

মা। আকাশের আমরা সীমা করিতে পারি না, যতদূর ভাবি তত দূর বিস্তীর্ণ বোধ হয়। ইহার মধ্যে কত সূর্য্য, কত পৃথিবী রহিয়াছে। সমুদায় বিস্তার আমরা মনে ধারণ করিতে পারি না। একটি পরমাণুও যে কত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম তাহাও আমাদের কল্পনায় আইসে না। বিবেচনা করিলে জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয়ই আশ্চর্য্য।

পঞ্চম দিবস।

অভেদ্যতা।

সু। মা। আকার ও বিস্তারের কথা শেষ হইয়াছে। জড় পদার্থের তৃতীয় গুণ কি বল?

মা। অভেদ্যতা।

সত্য। কেন মা! জড় পদার্থ সকল কি ভেদ করা

যায় না। মাটী, জল, বাতাস যে প্রকারের যত বস্তু সবই ত আমরা ভেদ হইতে দেখিতেছি। উদ্ভিদ সকল মাটী ফুঁড়িয়া উঠিতেছে; মাছ, কুমীর জলের ভিতর দিয়া সন্তরণ করিতেছে; আর বাতাসের ত কথাই নাই একটু ঘা পাইলেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

স্ব। একবার আমরা শুনিয়াছি, জগতের তাবৎ বস্তুই পরমাণু দ্বারা প্রস্তুত, সকলকেই ভাগ ভাগ করা যায়। আবার শুনি, পদার্থ ভেদ করা যায় না সে কেমন?

মা। সকল পদার্থই পরমাণু দ্বারা প্রস্তুত একথা সত্য এবং সকল পদার্থকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া শেষে পরমাণু করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই পরমাণু কি আর ভেদ হইতে পারে?

সত্য। না; পরমাণু অভেদ্য।

মা। এখানে অভেদ্যতাকে আর এক কথায় বাধকতা বলিতে পার। পরমাণু যে কেবল ভেদ হয় না তাহাই নয়; কিন্তু পরমাণু যত সূক্ষ্ম হউক না কেন একটি স্থান যুড়িয়া থাকে তাহাতে আর কিছুই আসিতে পারে না বাধা পায়। তাহার স্থান লইতে হইলে তাহাকে অন্য স্থানে সরাইয়া দিতে হইবে। "দুই বস্তু একই

সময়ে ঠিক্ এক স্থানে থাকিতে পারে না” জড় পদার্থ সম্বন্ধে এই একটি প্রধান নিয়ম মনে রাখিবে।

সত্য। “দুই বস্তু একই সময়ে ঠিক্ এক স্থানে থাকিতে পারে না” এ নিয়মটি পরমাণুতে খাটিতে পারে কিন্তু পদার্থেও কি খাটিবে?

সু। কেন একখানি বই যেখানে আছে ঠিক্ সেই খানেত আর এক খানি বই রাখা যায় না; তাই আগে কার বই খানিকে অন্য স্থানে সরাইয়া না দিলে আর হয় না। এক ঘটী জলের উপর আর এক ঘটী জল ঢালিলে ছাপাইয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু মা আমি দেখিয়াছি একটি বালিশ পোরা তূলা ছিল আবার তাহাতে অনেক তূলা ধরিল।

সত্য। তা সহজেই বুঝা যায়। তূলা একরাশি থাকিলেও অল্প স্থানে রাখা যায়, সুতরাং অবশিষ্ট স্থানে আরও তূলা ধরিতে পারে। আরও আমি দেখিয়াছি, অধিক তূলা দিলে বালিশ অধিক ফুলিয়া উঠে। কিন্তু একখানি কাষ্ঠে একটী প্রেক মারিলে কাষ্ঠ যেমন তেমনই থাকে, প্রেকও তাহার মধ্যে স্থান পায়। ইহার কারণ কি?

মা। সকল বস্তুর পরমাণু অভেদ্য ও তাহারা যতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহা অন্যের লইবার সাধ্য নাই। তবে কোন বস্তুতে পরমাণু সকল অধিক

ঘন ও কোন বস্তুতে অধিক ছাড়া ছাড়ি হইয়া থাকে। যাহাহউক সকল বস্তুতেই অল্প বা অধিক ছিদ্র আছে, এই জন্য পিটিয়া বা চাপিয়া সকল বস্তুকেই অল্প বা অধিক কমান যাইতে পারে। কাষ্ঠের ছিদ্র আছে এইজন্য কাষ্ঠের যেখানে প্রেক মারা যায়, সেইখানকার পরমাণু সকল চারিদিকে ঘেঁশাঘেঁশি করিয়া ঘন হইয়া যায়, তাহাতেই প্রেকের থাকিবার স্থান হয়। বোধ কর, ১০০ জন মানুষ একটি স্থান পূর্ণ করিয়া আছে, অন্য একজন লোক তাহাতে প্রবেশ করিলে পূর্ব্বকার লোকদিগকে একটু ঘেঁশাঘেঁশি করিয়া থাকিতে হইবে। কাষ্ঠে প্রেকের প্রবেশ হওয়াও ঠিক্ সেইরূপ।

সত্য। তবে আমরা বুঝিয়াছি পদার্থসকল কেহ কাহারও স্থান লইতে পারে না; আমরা যখন একটাকে অন্যের স্থানে যাইতে দেখি, হয় সে তাহাকে সরাইয়া দেয়, নয় তাহার পরমাণু সকলের মধ্যে যে স্থান পড়িয়া থাকে তাহাই অধিকার করিয়া লয়। এইজন্যই মাটী জল বাতাস সবই ভেদ হইতে দেখাযায়।

সু। আচ্ছা, মাটী কি জল সহজে ভেদ করা যায় না, একটু বাধা দেয়। কিন্তু বাতাসেরত বাধকতা বোধ হয় না।

মা। ঘন বস্তুর চেয়ে তরল বস্তুতে বাধা কম। মাটীর মধ্যে অঙ্গুলি বিদ্ধ করা সহজ নয়, জলের মধ্যে

অনায়াসে করা যায়। জলের চেয়ে আবার বায়ুতে বাধা কম, বায়ুর মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিলে কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু এক এক সময় বায়ুর বাধকতা বিলক্ষণ অনুভব হয়। তোমরা দেখিয়াছ জলের উপর একটি কলসী উপুড় করিয়া চাপিয়া ধরিলেও জল খানিক দূর উঠে, সমুদায় কলসীতে উঠিতে পারে না।

স্থ। হাঁ, কলসীর তলার দিক্ ফাক থাকে। সেখানে জল কেন উঠিতে পারে না?

সত্য। আমার বোধ হয় সেখানে বাতাস থাকে।

মা। ঠিক্ বলেছ, কলসীর সকল বায়ু সেই তলার দিকে থাকে। বাতাসেরও বাধকতা গুণ আছে এই জন্য জল তাহাকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। বাতাস যতক্ষণ অবধি বাহির করিয়া না দেওয়া যায় ততক্ষণ এক কলসী জল হইতে পারে না। কারণ দুই বস্তু এক সময়ে একস্থানে থাকিতে পারে না।

সু। একটা গাড়ু জলে ডুবাইলে তাহার নল দিয়া বক্ বক্ করিয়া শব্দ হয় কেন?

মা। এখানেও বায়ুর বাধকতা দেখ। প্রথমে এক গাড়ু বায়ু ছিল। জলে ডুবাইলে যেমন জল গাড়ুর মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে বায়ুও বাহির হইয়া যায়। বক্ বক্ শব্দ সেই বায়ু বাহির হয় তাহাতেই

হয়। যদি বায়ু বাহির হইয়া না যায়, তবে জল কেমন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবে?

ষষ্ঠ দিবস।

অবিনাশ্যতা।

সত্য। মা! জগতে কত আশ্চর্য্য কৌশল আছে। আমরা পদার্থের একটু সামান্য জ্ঞান পাইয়া কত সুখী হইতেছি। কিন্তু যত সুখ বাড়িতেছে, ততই আরও জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি মা! জড়পদার্থের ৩টি গুণ বলিয়াছ আকার, বিস্তার ও অভেদ্যত্ব। আজি অবিনাশ্যতা গুণের বিষয় আরম্ভ কর।

মা। সুশীলে তুমি বল দেখি, অভেদ্যতা গুণ কি বুঝিয়াছ?

সু। কেন মা! একটি জড়পদার্থ যেখানে আছে; তাহাকে ভেদ করিয়া অন্যে আর সেখানে থাকিতে পারে না। আগেকার জিনিসটাকে হয় ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে নয় তার পরমাণু সকলকে খুব ঘেঁশাঘেশী করিয়া সরাইয়া দিতে হইবে, তবে সেখানে অন্য একটা বস্তুর স্থান হইতে পারে। যেমন জল বাতাসকে বাহির করিয়া দিয়া গাড়ুর ভিতর যায়; আর একটা প্রেক কবাটের পরমাণু সকল ঘেঁশাঘেঁশি করিয়া দিয়া থাকি-

বার স্থান করিয়া লয়। দুইবস্তু ঠিক এক সময়ে একই স্থান যুড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না।

মা। ঠিক বলিয়াছ। আচ্ছা, এখন তোমরা অ-নাশ্যতার অর্থ কি বলিতে পার।

সত্য। অনাশ্যতা অর্থাৎ নাশ না হওয়া। কিন্তু কোন পদার্থের কি নাশ হয় না? সব বস্তু কি চিরকাল থাকে? কই সব বস্তুইত ক্ষয় পায়, ক্রমে সব বস্তুইত নষ্ট হয়। শুনিতে পাই, কালে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

মা। নাশ কি না, যা আছে তা না থাকা যেমন যা ছিল না, তাই করাকে সৃষ্টি বলে। তা, ঈশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষণেকে মহাপ্রলয় হইয়া সকলই ধ্বংস হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর ইচ্ছায় এই জগৎ আছে, ততক্ষণ ইহার কিছুরই ক্ষয় নাই, কিছুরই নাশ নাই। এই নিমিত্ত অনাশ্যতা বা অক্ষয়তা পদার্থের একটি প্রধান গুণ বলিতে হয়।

সু। ভাল মা! ব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস হয়, হইবে। কিন্তু সত্যপ্রিয় যে বলিয়াছে আর আর বস্তুরও নাশ হইতেছে, তা ত মিথ্যা নয়। দেখ, পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে বরাবর ধরিলে কত গাছপালা ছিল, কত জন্তু, কত মানুষ হইয়াছিল, সবই ত নাশ পেয়েছে? আর সামান্য

জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গেলেই ত ফুরাইল। কই কোথায় যার?

মা। তোমরা আগেকার কথা ভুলিয়া যাইতেছ। পরমাণুর কথা মনে করিয়া দেখ দেখি, পরমাণু কি ধ্বংস হইয়া যায়? গাছপালা ও জন্তু সকল মরিয়া যায়,জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া যায় সত্য; কিন্তু তাহাদের এক পরমাণুও নষ্ট হয় না। জন্তুর শরীর পচিয়া মাটী হয়, সেই মাটী হইতে গাছ হয়, সেই গাছ হইতে আবার জন্তুদের শরীরের পুষ্টি হয়— এইরূপে পরমাণু সকল যাতায়াত করিতেছে। একটা মাটীর ভাল যদি গুঁড়া করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কি তাহার নাশ হইল বলিতে পার?

সু। না, তবে সকল পরমাণু যখন রহিয়াছে, তখন তাহার নাশ বলা যায় না।

মা। সেইরূপ, গোলাকার মাটীর তালকে লম্বা চারি কোণা করিলে, কি তাহা হইতে দশটা জিনিস তৈয়ার করিলে তাহার নাশ হইল, বলিতে পার না। তার এক প্রকার আকার ছিল, আর এক প্রকার আকার হইল ইহাই বলিতে পার। কিন্তু নাশ কি না, 'যা আছে তা একেবারে না থাকা' এখানে ত তা হইতেছে না। শুধু এখানে কেন? নাশ কখন কোন খানেই দেখাইতে পারিবে না।

সত্য। আচ্ছা মা! এক পাজা কাঠ উনুনে দিলে,

তাহা পুড়িয়া ছাই হইলে, কাঠের আর সব পরমাণু কোথায় গেল? এক রাশি তূলায় যদি আগুন দেওয়া যায়, তাহা হইলে তার ত কিছু থাকে না বলিলেই হয়?

মা। আগুনে পড়িয়া গেলে পদার্থ সকল নষ্ট হইল, বোধ হয় বটে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহার একটি পরমাণুও ধ্বংস হয় না। কাঠ কি তূলা পুড়িলে কিছু ছাই বই কি আর কিছুই দেখিতে পাও না? আগুন লাগিলেই কত ধোঁয়া উড়িতে থাকে দেখিয়াছ? সে সকল কিছুই নয়, মনে করিওনা। ঐ কাঠের ও তূলার পরমাণু সকল ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যায়। তোমরা যদি কোন প্রকারে ঐ ধোঁয়া সকল জড় করিয়া পাঁশের সহিত ওজন করিতে পার, তাহা হইলে কাঠ ও তূলা যত ভারী ছিল, ইহাও ঠিক তত ভারী দেখিতে পাও।

সু। তা কি কখন হয়? ধোঁয়া কেমন করিয়া জড় করা যাবে? ওজন বা কেমন করিয়া হবে?

স। বোধ হয় হতে পারে। আমি এখন অনেক বুঝিয়াছি। তেমন কোন প্রকার যন্ত্র করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মা। পণ্ডিতেরা সেইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং ঠিক জানিতে পারিয়াছেন। একটা কাচের বোতলে খানিকটা তূলা অগ্নি সংযুক্ত করিয়া এবং

বোতলের মুখ উত্তমরূপে ছিপি দিয়া আঁটিয়া এবিষয় সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

সু। আচ্ছা! গ্রীষ্মকাল হলে আমাদের পুকুরটা শুকাইয়া যায়। তার সে জলত কোথায় যাইতে দেখি না, তবে তাহা ধ্বংস হইল বই আর কি বলা যাইবে।

সত্য। না, সে জল কখনই ধ্বংস হয় না। আমার বোধ হয় সূর্য্যের কিরণে তাহাও এক রকম ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যায়। কিন্তু মা! সে ধোঁয়া দেখা যায় না কেন?

মা। সূর্য্যের কিরণে জল এক রকম ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যায়, সত্য। কিন্তু সে ধোঁয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম এই বলিয়া চক্ষুতে দেখা যায় না; তাহাকে বাষ্প বলে। ঐ বাষ্প ঘন হইয়া মেঘ হইলেই দেখিতে পাও। আর শীতকালে যে কোয়াসা দেখ সেও ঐ বাষ্প শীতে ঘন হইয়া দেখা যায়। এখন বুঝিয়া দেখ পুকুরের জল এককালে নষ্ট হয় না, আবার হয় ত তাহা হইতেই বৃষ্টি পড়িয়া পুকুরকে পরিপূর্ণ করে।

সু। কোন বস্তুই যে ধ্বংস হইতে পারে না; এখন তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি কারণ একটি পরমাণুও বিনষ্ট হইবার নয়। তবে পদার্থ সকলের আকার নষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতেছে।

সত্য। পরমেশ্বর যে পরমাণু সৃষ্টি করিয়াছেন,

তাহাই রহিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাতেই এক গড়িতেছেন আর ভাঙ্গিতেছেন। এইরূপ পুরাতন বস্তু সকল গিয়া নূতন বস্তু সকল শোভা পাইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ সকলের মূলে সেই পুরাতন পরমাণুগুলি বহুরূপীয় ন্যায় নূতন বেশ ধরিয়া সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতেছে।

মা। জড় পদার্থের বিনাশ নাই দেখিয়া আমাদের মনে কেমন একটি আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির যখন এক কণামাত্র ধ্বংস হয়না তখন আমাদের আত্মারও বিনাশের কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু জড় পদার্থ সকল যেমন ভগ্ন হইয়া নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে, আত্মারা কি সেইরূপ হইতে পারে, কখন না। কারণ জড় পদার্থ অনেকগুলি পরমাণুতে প্রস্তুত, অতএব সেই পরমাণুগুলি পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আত্মার পরমাণু নাই, আত্মা একমাত্র জ্ঞান পদার্থ সুতরাং তাহা স্বতন্ত্র অর্থাৎ আপনাআপনি চিরকালই থাকিবে। এই জন্যই আত্মাকে অমর বলা যায়, মৃত্যু হইলে শরীর ধূলায় মিশায় কিন্তু আত্মা পরকালে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়া পরমপিতার ক্রোড়ে গিয়া শান্তিলাভ করিতে থাকে।

সপ্তম দিবস।

জড়গুণ।

মা। পদার্থের জড়ত্ব বলিয়া যে একটি গুণ আছে, আজি এসো তারই বিষয়ে কথা বার্ত্তা কই। এই গুণ থাকাতে জড় বস্তুকে যেখানে রাখ সেই খানেই থাকে, একবার তাহাকে থামাইয়া দিলে আর চলিতে পারে না। যদি অন্য কেহ তাহাকে নড়াইয়া না দেয়, তবে তাহা চিরকাল এক জায়গায় চুপ করিয়া থাকিবে।

সু। তা তো ঠিক্ কথা। আমরা থাল, ঘটী, বই, ছুরী যেখানে রাখি, সেখানেই থাকে। আবার যখন সরাইয়া দি, তখন অন্যস্থানে যায়। আমাদের মত তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে না।

সত্য। অনেক বস্তু যাইতে পারে না বটে, কিন্তু অনেককে আবার যাইতেও তো দেখা যায়। দেখ নদীর জল কেমন হু হু শব্দে চলিতে থাকে এবং তাহাতে জোয়ার ভাঁটা খেলে; গাছ থেকে ফল ভূমিতে পড়ে; ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠিয়া যায়; মেঘ সকল গর্জ্জন করিতে করিতে কত দূর গমন করে; বিদ্যুৎ এক পলকে সমস্ত দিকে চকমক করিয়া যায়; আর বাতাসের ত বেগ দেখিয়াছ, কোথায়ও কিছু নাই, ক্ষণেক প্রলয় করিয়া ফেলে।

মা। জল, ফল; ধোঁয়া, মেঘ বিদ্যুৎ ও বায়ু সকলই জড় পদার্থ। এরাও ইচ্ছা করিয়া একটু মাত্র চলিতে পারে না। তবে যে এরা চলে তাহার অন্য কারণ আছে, অন্যে ইহাদিগকে চালাইয়া দেয় বলিয়া চলিতে পারে। তোমরা যদি পৃথিবীর আকর্ষণের বিষয় জানিতে, তাহলে ফল কেন পড়ে বুঝিতে পারিতে। বল দেখি অন্য দিকে না গিয়া ফলটা মাটীর দিকেই পড়ে কেন?

সত্য। ফল যে ইচ্ছা করিয়া পড়ে তা বলা যায় না। সে ইচ্ছা করিয়া অন্যদিকেই বা যায় না কেন? তবে কি পৃথিবী তাহাকে টানিয়া লয়?

মা। হাঁ, পৃথিবীর টানেই ফল ভূমির দিকে আইসে। যখন আকর্ষণ গুণের কথা বলা যাইবে, তখন ইহা সবিশেষ বুঝাইয়া দিব। সেইরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে নদীতে জোয়ার ভাঁটা হয়। ধোঁয়ার চেয়ে বাতাস ভারী বলিয়া পৃথিবী বাতাসকে অধিক টানে, কাজেই ধোঁয়া উপরে না উঠিয়া থাকিতে পারে না। উত্তাপে বাতাসের পরমাণু সকল ছাড়া ছাড়ি হইয়া নানাদিকে ভ্রমন করে তাহাতেই ঝড় বহিয়া কিছুক্ষণ চারিদিক অস্থির করিতে থাকে। বাতাসেই মেঘ চলে। মেঘে মেঘে একপ্রকার ঘর্ষণেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, এবং তাহাতে এক প্রকার আকর্ষণে চলিতে থাকে।

যাহাহউক এটি নিশ্চয় জানিবে, জড় পদার্থকে না চালাইলে নিজে চলিতে পারে না।

সত্য। তা এখন বুঝিতেছি। আর এতো সহজেই সকলে মনে করে, তবে কারণ জানিতে পারে না বলিয়া অনেক পদার্থকে চলিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়। অনেক অজ্ঞান লোক হয় ত মনে করে, কলের গাড়ী আপনিই চলে; কিন্তু যাঁহারা বাষ্পের তেজ এবং ঐ গাড়ীর কল কৌশল জানেন তাঁহারা তাহার গতির কারণ বলিতে পারেন।

মা। আমি জড়ত্ব গুণের অর্দ্ধেক বলিয়াছি যে, কোন বস্তুকে থামাইয়া দিলে সে আপনি চলিতে পারে না। কিন্তু জড়ের আর এটি স্বভাব জানিবে, তাহাকে এক বার চালাইয়া দিলে আপনি আর থামিতে পারে না। যদি অন্যে না থামায়, তাহা ক্রমাগত চলিতে থাকে।

সু। মা, একথাটি বড় আশ্চর্য্য। আমিত কোন মতেই বুঝিতে পারিনা। একটা বস্তুকে একবার চালাইয়া দিলে সে থামিতে পারে না? তবে একখান চাকা একবার গড়াইয়া দিলে একটু পরেই থামিয়া যায় কেন? একটা ডেলা উপরদিকে ছুড়িলে খানিক উঠিয়া আর উঠিতে পারে না কেন?

সত্য। যে বস্তু চালাইয়া দেও, কিছুক্ষণ চলিয়া

ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া আইসে। চিরকাল কে চলে এমন পদার্থ কোথায় আছে?

মা। জড়পদার্থকে যখন থামাইয়া দিলে তাহা নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক চলিতে পারে না, তখন চালাইয়া দিলে তাহা কি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক চুপ করিতে পারে? না যে বেগ পাইয়াছে তাহাতে চলিতে থাকিবে, ইহাই অধিক সম্ভব বোধ হয়? এই পৃথিবীতে গতির অনেক প্রতিবন্ধক আছে, তাহাতেই পদার্থ চলিতে চলিতে থামিতে দেখি। পৃথিবীর যে আকর্ষণের কথা বলিয়াছি তাহাই একটি প্রধান কারণ? তদ্ভিন্ন ভূমির উচ্চনীচতা ও বাতাসের বাধা আছে। দেখ, একখানি চাকা গড়াইয়া দিলাম, ভূমির সহিত ঘর্ষণে তাহার কতক বেগ নষ্ট হইল. বাতাসেও একটু প্রতিবন্ধক হইল, তা ছাড়া পৃথিবীত তার সঙ্গে সঙ্গেই টানিতেছে। ডেলাও পৃথিবীর আকর্ষণে নামিয়া আইসে। যদি কোন বাধা না পায়, তাহা হইলে চাকা গড়াইয়া দিলে তাহা সমান বেগে একদিকে ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। ডেলাও উপরের দিকে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সকল ছাড়াইয়া উঠিবে, তথাপি থামিবে না। আচ্ছা, তোমরা দেখিয়াছ, বল দেখি, চাকা একখান ঘাসের উপর গড়াইয়া দিলে অধিক দূর যায়, না সমান ভূমির উপর অধিক দূর যায়?

সু। সমান ভূমির উপর অধিক দূর যায়।

সত্য। তাহার কারণ এই ঘাসে অনেক বাধা পায়, ভূমিতে তা পায় না।

মা। আবার বরফের উপর চালাইয়া দিলে আরও অধিক যাইবে এবং বায়ুশূন্য স্থানে তার চেয়ে অধিক। তবে দেখ, চাকার গতির যত প্রতিবন্ধক হয় তাহা তত শীঘ্র থামে, নতুবা তাহা চিরকাল চলিত।

সু; আচ্ছা, চিরকাল চলে এমন পদার্থ কি নাই?

মা। কত শত শত! আকাশে এই যে গ্রহ; চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল দেখিতেছ, তাহাদের গতি নিয়তই হইতেছে। ঈশ্বর তাহাদিগকে সৃষ্টিকালে যে বেগ দিয়াছেন, তাহারা সেই বেগেই ভ্রমণ করিতেছে। নিজে নিজে থামিতে পারে না, অন্যেরও তাহাদিগকে থামাইবার সাধ্য নাই। শূন্য পথে এইরূপ কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মণ্ডল সকল প্রতিক্ষণে দ্রুতবেগে চলিতেছে, কিন্তু পৃথিবীতে একটি ক্ষুদ্র বস্তু অল্পক্ষণ মাত্র চলিয়া থামিয়া যায়। যাহাহউক মনোযোগ করিয়া দেখিলে এই পৃথিবীতেই তোমরা জড়ত্ব গুণের অনেক দৃষ্টান্ত পাইতে পার।

দেখ, এক কলসী জল লইয়া শীঘ্র যাইতে যাইতে যদি হঠাৎ থামা যায়, তাহা হইলে খানিকটা জল সম্মুখের দিকে চলকিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই, কলসীর সঙ্গে

সঙ্গে জলও চলিতেছিল, কিন্তু কলসী বাধা পাইয়া থামিলেও জল চলিতে থাকে, এই জন্য তাহা বাহির হইয়া পড়ে।

যদি কোন ব্যক্তি ঘোড়া ছুট করিয়া চলে, আর ঘোড়া হঠাৎ থামে তাহা হইলে কি হয় জান?

সু। সে ঘোড়ার উপর হইতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যাইতে পারে। কেন না, ঘোড়া থামিলেও মানুষ বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু এক জন লোক নৌকার এক ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ নৌকাখানি যেমন চলিল, সে পাছুদিকে পড়িয়া গেল কেন?

সত্য। নৌকা প্রথমে চলিতে আরম্ভ হইলেই সেই ব্যক্তির মাথা অপেক্ষা পার দিকে অধিক বেগ হইল, পা নৌকার সঙ্গে চলিল সুতরাং শরীরের উপরের ভাগটা শরীরের জড়ত্ব গুণে পশ্চাতে পতিত হইল। মা, এই কি?

মা। তোমরা ঠিক্ বলিতেছ। আরও দেখিয়াছ, একখানা গাড়ী প্রথমে টানিতে ঘোড়াদের কত কষ্ট হয়, কিন্তু একবার টানিতে পারিলে তাহারা অনায়াসে ছুটিয়া চলে। প্রথমে জড়ত্ব গুণে গাড়ী চলিতে চাইতে ছিল না, কিন্তু পরে চলিতে আরম্ভ করিয়া সেই জড়ত্ব গুণে আবার থামিতে পারে না। তখন

পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়াইবার জন্য ঘোড়াদের যা কিছু বলের প্রয়োজন মাত্র।

তোমরা একদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিলে শীঘ্র অন্য দিকে ফিরিতে পার না। যে দিকে প্রথমে যাও, বেগে সেই দিকেই লইয়া যায়।

শিকারী কুকুরেরা যখন খরগোশ শিকার করিতে যায়, তখন ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। খরগোশ একদিকে দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ আর একদিকে ফিরে, সে দিকে আবার অধিক না চলিয়া অন্য দিকে যায়, কুকুর তাহার পশ্চাৎ একদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে বেগ ফিরাইতে পারে না। শশক এইরূপ কৌশলে অনেক সময় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

সু। আচ্ছা মা! পৃথিবীর আকর্ষণ কি অন্য প্রতিবন্ধক যদি না থাকিত তাহা হইলে ত অদ্ভুত কাণ্ড হইত। একবার একটি লাফ দিলে আমরা আকাশের দিকে উঠিয়া যাইতাম; একটা জিনিস হাত থেকে ছুড়িয়া দিলে তাহা চলিয়া কোন্ দেশে যাইত, আর পাইতাম না; জল সকল পাকিয়া হয়ত শূন্যেই থাকিত; শূন্যে কত শত বস্তু রাখা যাইত! এক বাতাসে সব বস্তু উড়াইয়া দিগ্ দিগন্তে ফেলিত!

সত্যপ। যাহাহউক জড়ত্ব গুণ বড় আশ্চর্য্য। জড়

বস্তু থামাইয়া দেও আর চলিতে পারে না, চালাইয়া দেও আর থামিতে পারিবে না! আচ্ছা, এ গুণ নাই এমন পদার্থ কি?

মা। সেই জ্ঞান পদার্থ বা মন। জড় পদার্থের নিজের ইচ্ছা নাই, স্বাধীনতাও নাই। চিরকাল পরাধীন হইয়া এক বেগে চালিত ও এক বেগে স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের নিজের ইচ্ছাতে যে দিকে ভাল বুঝি সেই দিকে যাইতে পারি মন্দ দিক্ হইতে নিবৃত্তও হইতে পারি। এই স্বাধীনতা পাইয়া সকল জড়জগৎ হইতে মনুষ্যের আত্মা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি অনেক মনুষ্যের আত্মা কেবল যেন জড় পদার্থের ন্যায় থাকে। তাহার নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দেখা যায় না। তাহা অন্যের ইচ্ছা, অন্যের কথা ও অন্যের ক্ষমতার একান্ত অধীন। দেখিও তোমরাও জড়পদার্থের ন্যায় হইও না। তোমরা আপনার জ্ঞানে যেমন বুঝিবে, আপনার ইচ্ছায় সেইরূপ কার্য্য করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব রাখিবে। অলসও হইও না, একান্ত চঞ্চলও হইও না। জড় পদার্থের গুণ জড় পদার্থেই দেখিয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য রচনার ধন্যবাদ দেও।

অষ্টম দিবস।

আকর্ষণ।

সু। আজ মা 'আকর্ষণ' গুণের কথাটি বলতে হবে। জড়পদার্থ আবার টানে কেমন করে।

মা। এই গুণটির বিষয় বলিবার পূর্ব্বে কে ইহার আবিষ্ক্রিয়া করিলেন এবং কিরূপে করিলেন শুনিলে বড় আমোদ হয়, অতএব মনোযোগ দিয়া শুন। নিউ-টন নামে একজন ইংরেজ ভারি বুদ্ধিমান্ এবং পণ্ডি-তের অগ্রগণ্য ছিলেন। একদিন তিনি একাকী বা-গানে বসিয়া আছেন হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে গাছ হইতে একটি আতাফল পড়িয়া গেল। দেখিয়াই নিউটন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ফলটা মাটীতে পড়িয়াছে, মাটীতে কেন পড়িল? ইহা কেন উপরের দিগে উঠিয়া গেল না, কেন চারি পাশের একদিকে চলিয়া গেল না, ইহা নীচেই কেন পড়িল? ইহার নিজের এমন কি শক্তি আছে, যাহাতে ভূমিতে আসিয়া পড়ে? অথবা আর কাহারও শক্তিতে এইরূপ ঘটিল। নিউটন এইরূপ ভাবিয়া অনুমান করিলেন এই পৃথি-বীর একটি আকর্ষণ শক্তি আছে, তাহা চখে দেখা যায় না অথচ তাহাতেই আতা পড়িয়াছে।

সত্য। আচ্ছা ভারি বস্তু হইলেই ত শূন্যে থাকিতে

পারে না, নীচের দিকে পড়িয়া যায় একথা কেন মনে করিলেন না?

মা। অবোধ ছেলে! জড়বস্তু কি আপনার ইচ্ছায় চলিতে পারে? শুনেছ ত, আর কেহ না চালাইলে চলিতে পারে না, না থামাইলে থামিতে পারে না, এই জন্যই তারা জড়। যারা কিছু জানে না, তারাই ঐরূপ মনে করে, বস্তু ভারী বলিয়াই পড়িয়া যায়। কিন্তু বল দেখি এই পৃথিবীর চেয়ে আর ভারী জিনিস কিছু এখানে কি দেখিতে পাও?

সু। মা! পৃথিবীতে কত পাহাড় পর্ব্বত রহিয়াছে। আর এর বেড় ১১০০০ ক্রোশ, তবে এটি ফাঁপা নয়, কঠিন মাটীতে পোরা। এযে কত মন ভারি তা কি কেউ ওজন করিতে পারে।

মা। এত ভারী যে পৃথিবী, এ কিসের উপর আছে জান।

স। ভূগোলে পড়েছি, পৃথিবী শূন্যে আছে; নাবিকেরা এর চারিদিক ঘুরিয়া আসিতেছে, কিন্তু এর কোন দিকে কিছু ঠেকা কি আধার দেখিতে পায় না।

মা। দেখ, পৃথিবী ভারী অথচ পড়িয়া যায় না। এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও প্রত্যেক নক্ষত্র এক একটা বৃহৎ বৃহৎ পৃথিবী, এরাও নীচে পড়ে না। তা যদি হইত তাহা হইলে এত দিনে সমুদায় সৃষ্টি চূর্ণ হইয়া যাইত।

অতএব একটা ক্ষুদ্র আতাফল ভারেতেই কি পড়িয়া যায়?

স্ন। নিউটন তবেত ঠিক মনে করেছেন, পৃথিবী টানে বলিয়াই আতা পড়িয়া যায়।

মা। এইরূপ পৃথিবী তাহার উপরস্থ সকল বস্তুকেই টানিতেছে। পরমেশ্বরের এই একটী নিয়ম যে বড় বস্তু ছোটকে আকর্ষণ করে। এই পৃথিবীকেও সূর্য্য আকর্ষণ করিতেছে?

স। তবে ফলটা যেমন মাটীতে পড়িয়া যায়, পৃথিবী কেন সূর্য্যে গিয়া ঠেকেনা?

মা। পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক গতি আছে। তাহাতে সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরে যায়, কিন্তু সে যত যাইতে চাহিতেছে, সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া ততই আপনার দিকে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহাতেই পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে অথচ সূর্য্যে গিয়া স্পর্শ করে না। যেমন একটা ডেলা একটা দড়িতে বাঁধিয়া যদি তাহা ছাড়িয়া দেওনা যায় অথচ দড়ী হাতে থাকে। তাহা হইলে যেমন ডেলাটা আমার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে।

স। ভাল। ছোট বস্তুর কি আকর্ষণ শক্তি নাই?

মা। আকর্ষণ যখন জড় পদার্থের সাধারণ গুণ, তখন যত কেন সূক্ষ্ম পদার্থ হউক না, তাহাতেও আক-

র্ষণ শক্তি আছে সন্দেহ নাই। চুম্বকের কাছে একটা লোহা রাখিলে তাহা চুম্বকে লাগিয়া যায়। কোন পাহাড়ের উপর হইতে এক খণ্ড পাথর বাঁধিয়া দড়ী ঝুলাইয়া দিলে পাথর পাহাড়ের একটু পাশ ঘেঁশিয়া ঝেঁকিয়া থাকিবে। পাঁচ ফোটা জল কাছা কাছি থাকিলে একত্র মিলিয়া বড় এক ফোঠা হইয়া যায়। পুষ্করিণীর যেখানে কিছু অধিক পানা থাকে, চারিদিক হইতে পানা আসিয়া প্রায় সেই খানেই জমে। তবে জান, পৃথিবীর আকর্ষণ অধিক, এই জন্যই ছোট ছোট বস্তুর টান বড় প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে ছোট ছোট বস্তুর মধ্যেও কত আকর্ষণ রহিয়াছে। একটি বস্তু যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, পরমাণু সকলের যোগে তৈয়ার হইয়াছে, অতএব পরমাণু সকল পরস্পর টানিয়া কেমন একত্র হইয়া থাকে দেখ।

স। তবে ত সব জিনিসেই আকর্ষণ শক্তি আছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ভার পড়িবার কারণ নয়, তবে ভারী বস্তু শীঘ্র এবং হালকা বস্তু এত বিলম্বে পড়ে কেন।

মা। সমান দূর হইতে একটি টাকা এবং একটী পালক ফেলিলে উভয়েই ঠিক্ এক সময়ে ভূমিতে পড়িবে। কিন্তু আমরা টাকাটিকে আগে পড়িতে দেখি, তাহার কারণ কেবল বায়ুর বাধকতা। টাকাতে অধিক

পরমাণু বলিয়া বাতাস তাহাকে অধিক বাধা দিতে পারে না, কিন্তু পালকে অল্প পরমাণু বলিয়া তাহাকে ভাসাইয়া রাখে। কিন্তু একটি কাচপাত্র যদি বায়ু নির্ষাণযন্ত্র* দ্বারা যদি বায়ুশূন্য করা যায়, আর তাহার ভিতর টাকা ও পালক ফেলা যায়, উভয়ে ঠিক্ এক সময়ে নীচে পড়িবে। নিউটনও এই পরীক্ষা দ্বারা ভার যে পতনের কারণ নয় স্থির করেন।

সু। যাহা হউক, নিউটন বড় মহৎ লোক। তিনি একটী সামান্য আতাফল দেখিয়া জগতের এরূপ একটি আশ্চর্য্য নিয়ম প্রকাশ করিলেন।

স। তাই ত আমরা কত সময় আতা ফল পড়িতে দেখি, ও ভাব আমাদের মনে আসে না।

মা। ঈশ্বরের এই জগৎ সত্যেতে পরিপূর্ণ। জ্ঞানী লোকেরা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে সত্য লাভ করিয়া জগতের কত উপকার করেন। নিউটন কেবল পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, এই উপগ্রহাদি সহিত সমুদায় সৌরজগৎ এই নিয়মের অধীন প্রমাণ করিলেন। তখন বুঝিতে পারিলেন, যে আকর্ষণ শক্তিতে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহাতেই ফল পড়িতেছে এবং

---

* যে যন্ত্র দ্বারা কোনস্থান হইতে বাতাস বাহির করিয়া শূন্য করা যায়।

শিশির বিন্দু সকল একত্রিত হইয়া দূর্ব্বাদলের উপর মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পায়। আকর্ষণ শক্তি সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

নবম দিবস।

মধ্যাকর্ষণ।

মা। আকর্ষণ জড় জগতের সর্ব্ব স্থানেই রহিয়াছে এবং তাহা না থাকিলে প্রায় কোন কার্য্যই চলিত না। পরমাণু সকল পরস্পর পৃথক হইয়া নানা দিকে চলিয়া বেড়াইত, কিছুতেই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বিবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারিত না। এবং তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ড কেবল পরমাণুপুঞ্জ বিশৃঙ্খলাতেই পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু আকর্ষণ থাকাতেই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রগণ আকাশ পথে সুশৃঙ্খলরূপে ভ্রমণ করিতেছে, সমুদ্র হইতে বাস্প ও মেঘোৎপত্তি এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হইতেছে। আমাদের শরীরের অঙ্গ সকল পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে এবং শ্বাসক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন ও দেহ পুষ্টির কার্য্য সকল চলিতেছে। আর আমাদের চারিদিকে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহাতেও আকর্ষণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সু। আচ্ছা মা! তুমি বলিতেছ আকর্ষণ সব জায়-

গায় আছে, কিন্তু সেটা কি জিনিস আমারাত দেখিতে পাই নাই। সে কি বাতাসের মত?

সত্য। নাই বা দেখিতে পাইলাম, কাজ দেখিয়া তাহা মানিতে হয়। আর তাহা বায়ু মত একটা বস্তুও নয়, পদার্থের শক্তি বা গুণ মাত্র। আগুনের যে উত্তাপ শক্তি তাহাত চখে দেখা যায় না, কিন্তু গায় লাগিলেই বুঝিতে পারি। সেইরূপ যখন একটা উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাই, তখন পৃথিবীর টানটি কেমন বুঝা যায়।

মা। ঠিক্ বলিয়াছ আকর্ষণ গুণটি দেখিতে না পাইলেও তাহার কাজ দেখিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন আর একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে। আকর্ষণ নানা প্রকার আছে। যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী ও সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থ সকলকে আপন আপন দিকে টানে, তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। যে শক্তি দ্বারা একখণ্ড স্বর্ণ আর একখণ্ড স্বর্ণের সহিত একত্র হয়, তাহাকে যোগাকর্ষণ বলে। যে শক্তি দ্বারা চূর্ণ ও হরিদ্রাতে মিশিয়া পাটলবর্ণ হয় তাহাকে রাসায়নিক আকর্ষণ বলে। যে শক্তি দ্বারা একটী পলিতা দিয়া তৈল উঠিয়া প্রদীপকে জ্বলন্ত রাখে তাহাকে কৈশিক আকর্ষণ বলে। যে শক্তি দ্বারা চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, তাহার নাম চুম্বার্ষণ, আর যাহাদ্বারা ধাতু বিদ্যুতকে আকর্ষণ করে, তাঁহার নাম তাড়িত আকর্ষণ।

সত্য। পৃথিবীর আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ কেন বলে? মধ্যের দিকে কি টানে সেই জন্য? পৃথিবীর ত সব-দিকেই টান আছে।

মা। আকর্ষণটা মাঝ খানের দিকেই হয়। চাকার যেমন মাঝখানে আল আর তাহা হইতে চারিদিকে কাষ্ঠের শলাকা থাকে। পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলেই যেন সকল আকর্ষণ শক্তি জমিয়া আছে, তাহা হইতে টান সকল দিকেই হয়। কাজে কাজেই বাহিরের বস্তু সকল নানাদিক দিয়া আকৃষ্ট হইয়া সেই মাঝখানে যাইতে যায়, কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঠেকিলেই বাধা পাইয়া আর যাইতে পারে না। এই জন্যেই কদমফুলে কেশর সকল যেমন হেলিয়া থাকে, পৃথিবীর সমুদায় পদার্থ ও জন্তু সকল সেইরূপ ভাবে রহিয়াছে।

সু। তবে আমাদের উল্‌টা দিকে যে সকল লোক থাকে, তাদের পা আমাদের দিকে, মাথা নীচের দিকে, পৃথিবীর টান আছে বলিয়াই বুঝি তাহারা পড়িয়া যায় না?

সত্য। পড়িয়া কোথায় যাইবে? আমরা তাহা-দিগকে যেমন ভাবিতেছি তারাও আমাদিগকে সেইরূপ ভাবিতে পারে। ফলে উভয়েই পৃথিবীর টানে পৃথি-বীর দিকেই আকৃষ্ট হই। কিন্তু মা, বস্তু সকলের যে

একটা ভার আছে, সেটা তুমি গুণের মধ্যে ধর নাই। আমি বোধ করি সেটা আকর্ষণ হইতেই হয়।

সু। তাহা হইলে ত ভার কিছুই নয়।

মা। বাস্তবিক ভার কেবল আকর্ষণ আছে বলিয়াই। আকর্ষণ না থাকিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বস্তুরও কিছু-মাত্র ভার বোধ হইত না। পৃথিবী যে বস্তুকে যত আকর্ষণ করে তাহা তত ভারী।

সু। আচ্ছা, পৃথিবী কোন্ বস্তুকে কত আকর্ষণ করে, কেমন করিয়া জানিব। বড় বস্তুকে অধিক টানে, ছোট বস্তুকে কম টানে তাহাও বলিতে পারি না। দেখ একটি ছোট লোহার ভাঁটা এক বোঝা তূলার চেয়েও ভারী।

সত্য। আমার বিবেচনায় যাতে অধিক পরমাণু আছে, পৃথিবী তাহাকে অধিক আকর্ষণ করে। তূলার বোঝা দেখিতে বড়, কিন্তু লোহার ভাঁটায় যত পরমাণু আছে, ইহাতে তত নাই। এই জন্য পৃথিবী লোহার ভাঁটাকে অধিক টানে এবং তাহা অধিক ভারী বোধ হয়।

সু। এই ঠিক বটে। কিন্তু আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। পৃথিবী যদি সকল বস্তুকেই আকর্ষণ করে, তবে ধোঁয়া নীচে না নামিয়া উপরে উঠিয়া যায় কেন?

মা। তোমরা যা বলিতেছিলে তাই ধরিয়া আর একটু গেলেই বুঝিতে পারিতে। ধোঁয়াকেও পৃথিবী আকর্ষণ করে কিন্তু পৃথিবীর উপরি ভাগে যে বায়ু মণ্ডল রহিয়াছে তাহা ধোঁয়া অপেক্ষা অধিক ঘন, এই জন্য ধোঁয়া অপেক্ষা তাহাতে পৃথিবীর টান অধিক। সুতরাং যেমন জলের মধ্যে শোলা রাখিলে জল তাহাকে ভাসাইয়া তুলে, বাতাসও সেইরূপ ধোঁয়াকে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া দেয়। যেখানকার বাতাস ধোঁয়ার সমান ঘন ধোঁয়া সেইখানে গিয়া থামে। ধোঁয়া ঘন হইয়া জল হইলেই পুনর্ব্বার বৃষ্টি হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

আকাশ ও আকাশস্থ পদার্থ।

প্র। আমরা যে আকাশ দেখি তাহা কি পদার্থ?

উ। আকাশের অর্থ শূন্য। তাহাকে কোন পদার্থের মধ্যে গণনা করা যায় না, তাহাকে স্থান বলা যায়। উপরে যে মেঘ দেখ তাহা আকাশ নয়। এই আকাশে মেঘ, বায়ু, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও অসংখ্য নক্ষত্র রহিয়াছে।

প্র। আকাশ টা কত বড়?

উ। উপরে অতিদূরে যে নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহারও পরে আকাশ এবং নিম্নে যে দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় ততদূরে আকাশ। আকাশের আমরা সীমা করিতে পারি না, এমন স্থান মনে করিতে পারি না যেখানে আকাশ নাই। সুতরাং আকাশকে অসীম বলিতে হয়।

প্র। আকাশ যদি কোন পদার্থ নয়, তবে তাহা নীলবর্ণ দেখায় কেন? এবং যেন ঢাকনীর মত হইয়া চারিদিকে পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে বোধ হয় কেন?

উ। আকাশের যে নীল রঙ দেখা যায়, সে বায়ুর রঙ। পৃথিবীর চারিদিকে বায়ু অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের ন্যায় হইয়া আছে। সমুদ্রের জল যেমন হাতে তুলিয়া লইলে কোন বর্ণের বোধ হয় না, কিন্তু একত্র রাশীকৃত হইয়া থাকিলে নীলবর্ণ দেখায়। আমাদের নিকটের বায়ু পরিমাণে অল্প বলিয়া দেখা যায় না, দূরের বায়ু একত্র রাশীকৃত হইয়া নীলবর্ণ দেখায়। আকাশ যে ঢাকনীর মত পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে বোধ হয়, সে আমাদের দৃষ্টির নিয়মাধীন। আমাদের চক্ষু মধ্যস্থলে থাকিয়া উপরের ও চারিদিকের আকাশ সমান দূর দেখিতে পায় ইহাই তাহার কারণ।

প্র। নক্ষত্র সকল কি?

উ। নক্ষত্র সকলের অধিকাংশই সূর্য্যের ন্যায় আলোক বিশিষ্ট ও পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহৎ।

সূর্য্যের ন্যায় তাহাদের চারিদিকে কতশত গ্রহ উপগ্রহ ভ্রমণ করিতেছে। কতগুলি নক্ষত্র পৃথিবীর ন্যায় এক একটী গ্রহ। তাহারা সূর্য্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে এবং তাহা হইতে আলোক পায়।

প্র। কোন্ গুলি নক্ষত্র ও কোন্ গুলি গ্রহ কিরূপে জানা যায়?

উ। নক্ষত্র সকলের আলোক স্থির ও রক্তবর্ণ এবং তাহারা অধিক দূরে থাকে। গ্রহগণের জ্যোতিঃ চঞ্চল ও ম্লান। আমরা যাহাকে সন্ধ্যার তারা ও শুক তারা বলিয়া জানি তাহা গ্রহ।

প্র। রাত্রিকালে আকাশে অনেক উচ্চে যে শাদা রেখা যায়, যাহাকে "যমের জাঙ্গাল" বলে, তাহা কি?

উ। তাহার নাম ছায়াপথ। অনেক দূরে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র একত্র হইয়া দেখায় বলিয়া ঐরূপ বোধ হয়। পণ্ডিতেরা আবার অনুমান করেন যে, এতদূরে নক্ষত্র সকল আছে যে তাহাদের আলোক আজিও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে নাই। সেই সকল নক্ষত্র পরে দেখা যাইবে।

প্র। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে যত নক্ষত্র দেখা যায়, শুক্লপক্ষে তত দেখা যায় না কেন?

উ। শুক্ল পক্ষে চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণে তারা নক-

লের প্রভা ম্লান হইয়া যায়, এইজন্য অনেক তারা অদৃশ্য হয়।

প্র। দিনের বেলা একটি তারাও দেখা যায় না কেন ?

উ। চন্দ্রের আলোক অপেক্ষা সূর্য্যের জ্যোতিঃ আরও প্রখর, এইজন্য নক্ষত্রগণের অল্প অল্প কিরণ এককালে প্রভাহীন হইয়া অদৃশ্য হয়। এক এক সময় সূর্য্য গ্রহণে সূর্য্যমণ্ডল ঢাকা পড়িলে দিনের বেলাও নক্ষত্র দেখা যায়।

প্র। দিনের বেলা কূপের জলের নিম্নে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না, কিন্তু নক্ষত্র সকলের প্রতিবিম্ব কেন দেখা যায় ?

উ। নক্ষত্র সকলের কিরণ ঠিক্ সরল রেখায় পড়ে এই জন্য জলে প্রতিবিম্ব হয়। সূর্য্যের কিরণ বক্র ভাবে পড়ে বলিয়া হয় না।

প্র। রাত্রিকালের সময় তারা খসিয়া পড়িতে দেখা যায় তাহা কি ?

উ। নক্ষত্র সকল যখন পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহত্তর, তখন তাহা খসিয়া পড়িলে কি পৃথিবীর রক্ষা থাকে ! কোন পৃথিবীর কেন, তাহা হইলে সমুদায় সৃষ্টি বিষম বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বাতাসের সঙ্গে অনেক প্রকার বাষ্প ও ধাতুর পরমাণু থাকে তাহাই একত্র হইয়া

জ্বলিয়া উঠে এবং অধিক ভারী হওয়াতে নীচে পড়িয়া যায়। ঐ আলোকময় পরমাণু সকল কখন বাতাসে মিশাইয়া যায়, কখন উল্কাপিণ্ড হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়।

প্র। আচ্ছা, গ্রহ নক্ষত্র সকল আকাশে কিরূপে আছে?

উ। গ্রহ নক্ষত্র সকল কোন আধারের উপরে নাই, শূন্যে রহিয়াছে। পৃথিবীর আকর্ষণ আছে বলিয়া আমরা ইহার নিকটে কোন বস্তু শূন্যে রাখিলে ভূমিতে পড়িয়া যায়। মহাশূন্যে যে পদার্থ যেরূপে রাখিবে সেইরূপে থাকিবেক। জগদীশ্বর গ্রহ নক্ষত্রদিগকে শূন্যে রাখিয়া গতিশক্তি এবং পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার শক্তি দিয়াছেন; ইহাতে উপগ্রহগণ এক এক গ্রহকে, গ্রহগণ এক এক সূর্য্যকে এবং (এরূপ অনুমান করা হয়) সূর্য্যগণ এক এক মহাসূর্য্যকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে!

প্র। নক্ষত্র সকল চিক্‌মিক্ করে কেন?

উ। উহাদের কিরণ পড়িয়া বায়ুতে এক প্রকার গতি হয়, সেই গতি কিরণের সহিত সংযুক্ত হইয়াই চিক্‌মিক্ করিতে থাকে।

প্র। রাত্রিকালে উত্তর মুখ হইয়া ক্রমাগত ভ্রমণ করিলে যে সকল তারা প্রথমে অদৃশ্য থাকে তাহাদিগকে

ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে দেখা যায় এবং যাহারা উপরে থাকে ক্রমে ক্রমে নামিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হয়, ইহার কারণ কি ?

উ। পৃথিবী গোল বলিয়াই এইরূপ হয়। গোল বস্তুর একদিকে থাকিলে অন্য দিকের কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, মাঝে আড়াল পড়ে। এই জন্য একদিক্ হইতে অন্যদিকের নক্ষত্র দেখা যায় না। যত অগ্রসর হওয়া যায়, নূতন নক্ষত্র সকল ততই দৃষ্ট হয়, এবং পূর্ব্বের নক্ষত্র সকল আড়ালে পড়িয়া অদৃশ্য হয়।

প্র। আমরা কত তারা দেখিতে পাই ?

উ। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, কেবল চক্ষু দিয়া দেখিলে দশ সহস্রের অধিক তারা দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদের আলোকে চক্ষুর ভ্রম জন্মায়, তাহাতেই আরও অনেক অধিক বলিয়া বোধ হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে অনেক নূতন নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্র। আকাশে যে এত গ্রহ নক্ষত্র রহিয়াছে, ইহাদের প্রয়োজন কি ?

উ। আমরা এই একটি পৃথিবী দেখিতেছি। ইহাই ঈশ্বরের বিচিত্র রচনা ও অসীম মহিমাতে পরিপূর্ণ। ইহাতে চেতন অচেতন ও উদ্ভিদ কত অসংখ্য পদার্থ

রহিয়াছে। অতএব পৃথিবীর তুল্য ও তাহা অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ লোকমণ্ডল যে শূন্যে রহিয়াছে, সাধারণের কখনই বোধ হয় না। গ্রহ নক্ষত্র সকলে জগদীশ্বরের নূতন নূতন সৃষ্টি ও তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গল ভাবের নূতন নূতন নিদর্শন রহিয়াছে ইহাই প্রতীত হয়।

সময় ও গতি।

প্র। সময়, দিন মাস, বৎসর ইত্যাদিতে বিভক্ত হইয়াছে কেন?

উ। পৃথিবী এবং চন্দ্রের গতি দ্বারা এইরূপ সময় নিরূপিত হয়। যেমন, পৃথিবী আপনা আপনি একবার ঘুরিলে একদিন হয়। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিক একবার ঘুরিয়া আসিলে এক মাস হয়। আর পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিক একবার প্রদক্ষিণ করিলে এক বৎসর হয়।

প্র। ৬০ দণ্ডে এক দিন হয় কেন?

উ। পৃথিবীর আপনা আপনি একবার ঘুরিতে ৬০ দণ্ড অথবা ২৪ ঘন্টা সময় লাগে।

প্র। দিবা এবং রাত্রির কারণ কি?

উ। পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে ইহার যে ভাগ সূর্য্যের সম্মুখে যখন থাকে তখন সেখানে দিবা হয়। যে ভাগ সূর্য্য হইতে অন্য দিকে চলিয়া যায় সেখানে রাত্রি হয়।

প্র। আমাদের দেশে যখন প্রাতঃকাল বিলাতে তখন দিবা না রাত্রি ?

উ। বিলাতে তখন দুই প্রহর রাত্রি। আর এখানে যখন দুই প্রহর বেলা, বিলাতে তখন প্রাতঃ-কাল।

প্র। দিবা ও রাত্রি ছোট বড় হয় কেন ?

উ। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে একটু বক্র হইয়া ঘুরিতেছে। এই জন্য পৃথিবীর এক ভাগে আলোক কখন অধিক কখন অল্প পড়িয়া থাকে। আলোক অধিক দূর পড়িলে সেখানে দিবা বড় ও রাত্রি ছোট হয়। আলোক কম পড়িলে রাত্রি বড় ও দিবা ছোটহয়।

পৃথিবীর মধ্যস্থল রেখা ভূমিতে সকল সময়ে সমান আলোক পড়ে, এই জন্য সেখানে ঠিক্ ১২ ঘন্টা দিন ও ১২ ঘন্টা রাত্রি। পৃথিবীর এক কেন্দ্রে ছয় মাস ক্রমা-গত আলোক থাকে ও ছয়মাস নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। এইজন্য সেখানে ৬ মাস দিবা ও ৬ মাস রাত্রি ক্রমাগত বিরাজ করিতে থাকে।

প্র। ৩০ দিনে মাস বলে কেন ?

উ। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিক্ ঘুরিয়া আসিতে প্রায় ৩০ দিন লাগে।

প্র। ১২ মাসে এবং ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয় কেন ?

উ। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর যত সময় যায়, তত সময়ে চন্দ্র পৃথিবীকে ১২ বার প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। এই জন্য ১২ মাসে বৎসর। আর সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন লাগে, এই জন্য ৩৬৫ দিনে বৎসর। ঠিক্ এক বৎসর গণনা করিতে হইলে ৩৬৫ দিন আরও প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরিতে হয়।

প্র। এক মাসে দুই পক্ষ, কৃষ্ণ ও শুক্ল। আচ্ছা এক এক পক্ষে প্রতিপদ, দ্বিতীয়া এইরূপ ১৫ টি করিয়া তিথি ধরা হয় কেন ?

উ। চন্দ্রের নিজের আলোক নাই। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পড়িয়া এক কলা, দুই কলা এইরূপ ক্রমে ক্রমে দেখা যায়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন তিথি। চন্দ্রের যে অর্দ্ধ ভাগ নিয়ত আমাদের দিকে থাকে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে সূর্য্যের আলোক পাইলে পূর্ণিমা হয়। আর তাহাতে মূলে সূর্য্যের আলোক না পড়িলে অমাবস্যা হয়।

প্র। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এইরূপ ঋতু ভেদ হয় কেন ?

উ। পৃথিবীর বার্ষিক গতি দ্বারা ইহার সকল অংশে সূর্য্যের কিরণ সমানরূপে পড়িতে পায় না, এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঋতু হইয়া থাকে। পৃথিবীর এক কেন্দ্রে যখন শীত, অন্য কেন্দ্রে তখন গ্রীষ্মকাল।

প্র। পৃথিবী গ্রীষ্মকালে সূর্য্য হইতে অনেক দূরে থাকে, আর শীতকালে নিকটবর্ত্তী হয় কেন?

উ। গ্রীষ্মকালে পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে থাকিলেও ইহার কিরণ সকল ঠিক্ সরল ভাবে পড়ে ইহাতেই তাপ অধিক হয়। শীতকালে সূর্য্যের কিরণ বক্র হইয়া পড়ে এই জন্য তাহার তেজ থাকে না। আরও পৃথিবী সূর্য্যের নিকটস্থ হইলে তাহার গতিও অধিক দ্রুত হয়. এই জন্য তাপ সঞ্চিত হইতে পারে না।

প্র। একদিনে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় পৃথিবী কত চলে।

উ। পৃথিবীর পরিধি ১১০০০ ক্রোশ। পৃথিবীর একদিনের গতি সেই ১১০০০ ক্রোশে। সুতরাং ইহা এক ঘন্টায় প্রায় ৫০০ ক্রোশ চলে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক গতিও আছে। বার্ষিক গতি আহ্নিক গতি অপেক্ষা ৬৪।৬৫ গুণ অধিক!

প্র। একজন লোক যদি ঘন্টায় ৫০০ ক্রোশ করিয়া পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিকে চলে তাহা হইলে কি হয়?

উ। পৃথিবী পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রতি ঘন্টায় ৫০০ ক্রোশ চলিতেছে। সুতরাং সে মনুষ্য প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে সকল সময়েই তাহার প্রাতঃকাল থাকিবে। তাহার মধ্যাহ্ন অপ-

রাহু, কি রাত্রি কিছুই হইবে না। এবং সূর্য্যকে এক স্থানে স্থির দেখিতে পাইবে।

প্র। একখানি গাড়ী একটু চলিলে আমরা কত শব্দ শুনিতে পাই। আর পৃথিবী এত দ্রুত গতিতে চলিতেছে তথাপি তাহা টের পাওয়া যায় না কেন?

উ। পৃথিবী যেমন চলিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডল ও মেঘ এবং ইহার উপরিস্থ সকল বস্তুই চলিতেছে সুতরাং পৃথিবীর সহিত কোন বস্তুর ঘর্ষণ হয় না। ঘর্ষণ না হইলে শব্দও উৎপন্ন হইতে পারে না। জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে পৃথিবী ও আরও অসংখ্য অসংখ্য গ্রহ তারা মহা শূন্যে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।

সূর্য্য বিষয়।

প্র। পৃথিবী ও আর আর গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে গোলাকার পথে ঘুরিতেছে কেন?

উ। পরমেশ্বর গ্রহগণকে ঠিক সরল রেখায় চলিতে একটি গতি দিয়াছেন, তাহাতে গ্রহগণ ঠিক সোজা বরাবর চলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু তাহাদের উপর সূর্য্যের আবার আকর্ষণ আছে এই জন্য তাহারা যে দিকে সরল রেখায় চলিতে চায়, সূর্য্য সেই দিক্ হইতে টা-

নিয়া আপনারদিকে আনে ইহাতেই গোলাকার পথ হয়। কিন্তু এই পথ ঠিক্ গোল নয়, ডিম্বাকার। তাহার কারণ এই যে সূর্য্যের আকর্ষণ ছাড়া গ্রহগণের পরস্পরের আকর্ষণও পরস্পরের উপরে আছে।

প্র। সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ সকল যদি গোলাকার, তবে চাপ্টা দেখায় কেন?

উ। ঐ সকল জড় পিণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যে কিরণ আইসে তাহা অত্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পড়ে, ইহাতেই দূরবর্ত্তী স্থান নিম্ন ও নিকটবর্ত্তী স্থান উচ্চ বোধ হয় না। দূর হইতে একটা গোল থাম দেখিলে তাহা চাপ্টা বোধ হইয়া থাকে।

প্র। সূর্য্য ও চন্দ্র উদয় ও অস্ত হইবার সময় এত বড় দেখায় কেন?

উ। তখন তাহারা এক পার্শ্ব হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের কিরণ অধিক বক্র ও বিস্তারিত হইয়া পড়ে। ইহাতে তাহাদের আকারও অধিক বিস্তারিত দেখায়, ইহার আরও একটি কারণ আছে। উদয় ও অস্ত হইবার সময় তাহারা যেন পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে বোধ হয়, ইহাদের পৃথিবীর আর আর বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া, আমরা তাহাদের আকার বড় বলিয়া মনে করি।

প্র। সূর্য্য ও তারাগণের উদয়াস্ত কেন হয়?

উ। পৃথিবী আহ্নিকগতি দ্বারা ২৪ ঘন্টায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে একবার আপনা আপনি ঘুরে, ইহাতেই সূর্য্য ও তারাগণের পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখা যায়। একখানি নৌকা দ্রুত বাহিয়া চলিলে তীরস্থ বৃক্ষ আদি যেন উলটাদিকে ছুটিতেছে বোধ হয়।

প্র। সূর্য্যের উদয় ও অস্ত কিরূপে হয়?

উ। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে। আমরা পৃথিবীর যে ভাগে আছি সেই ভাগ যখন পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া সূর্য্যের সন্মুখে যায়, তখন সূর্য্য যেন পূর্ব্বদিক হইতে উঠিল, এইরূপ আমাদের চক্ষুতে ভ্রম জন্মে। আবার আমরা যে ভাগে আছি, তাহা যখন আরও পূর্ব্বদিকে গিয়া সূর্য্য হইতে দূরে পড়ে, তখন সূর্য্য যেন পশ্চিমে অস্ত গেল এইরূপ ভ্রম হয়।

প্র। পৃথিবী যদি ঘুরিতেছে, তবেত আমাদের মাথা একবার উপর ও একবার নীচেরদিকে যাইতেছে। মাথা নিচেরদিকে গেলে আমরা কেন পড়িয়া যাই না?

উ। পৃথিবীর আকর্ষণই আমাদিগকে টানিয়া রাখে, আমাদের মাথা নীচে গেলেও পৃথিবীর আকর্ষণ ঠিক্ সমান থাকে। আমরা মাথার দিক্‌কে উপর ও পারদিক্‌কে নীচে বলি, কিন্তু আমাদের উল্‌টাদিকে পৃথি-

বীতে যে সকল লোক বাস করে তাহাদের পা আমাদের পায়ের দিকে কিন্তু মাথা নিম্নদিকে ঝুলিতে থাকে, পৃথিবীর টান আছে বলিয়া তাহারা পড়িয়া যায় না।

প্র। সূর্য্যের উদয় হইবার পূর্ব্বে এবং অস্ত হইবার পরে যে এক প্রকার আলোক দেখা যায় তাহার কারণ কি?

উ। সূর্য্যের উদয় হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতে এবং অস্ত যাইবার কিছু পরক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কিরণ উপরিস্থ বায়ু-মণ্ডলে পতিত হয়, তাহাই প্রতিফলিত হইয়া অর্থাৎ বেঁকিয়া পড়িয়া অস্পষ্ট আলোক উৎপাদন করে।

প্র। এই অস্পষ্ট আলোকের প্রয়োজন কি?

উ। হঠাৎ আলোক হইতে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার হইতে আলোকে পড়িলে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আলোক হইতে অন্ধকার ও অন্ধকারের পর আলোক দর্শন করিলে চক্ষুর কোন কষ্ট হয় না।

প্র। সূর্য্য কি উপকার করে?

উ। সূর্য্য থাকাতেই সৌর জগৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে, নচেৎ সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিয়া উদ্ভিদ্ ও জীবগণের কল্যাণ সাধন করে এবং সমুদ্র ও অন্য অন্য

স্থান হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টি ও শিশিরের জন্য মেঘ প্রস্তুত করে।

প্র। মধ্যাহ্ন অপেক্ষা অপরাহ্ন ২ ঘটিকা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত উত্তাপ এত অধিক হয় কেন?

উ। মধ্যাহ্নের সূর্য্য কিরণ এই সময় একত্রীভূত হয় এবং অন্যান্য পদার্থের তাপও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে পৃথিবী অনেক স্নিগ্ধ থাকে এবং মধ্যাহ্নের সূর্য্য কিরণ পড়িতে পড়িতে প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না।

প্র। সূর্য্যোদয়ের একঘন্টা পূর্ব্বেও সকল দিবা রাত্রির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীতল হয় কেন?

উ। পূর্ব্বদিন পৃথিবীর উপর সূর্য্যের যে কিরণ পড়িয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইয়া এই সময়ে প্রায় কিছুই থাকে না।

প্র। পর্ব্বতের উপরভাগ সূর্য্যের অধিক নিকট হইলেও তথায় শীত অধিক হয় এবং বরফ জন্মিয়া থাকে ইহার কারণ কি?

উ। সূর্য্যের কিরণ বাতাসের ভিতর দিয়া আসিবার সময় উত্তপ্ত বোধ হয় না, কিন্তু পৃথিবীতে পড়িয়া জমিতে থাকে ও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। পর্ব্বতের উপরে যত টুকু কিরণ পড়ে, তাহার উত্তাপ বাতাসে নষ্ট হয়,

সুতরাং তথায় শীত স্থায়ী হইয়া বাষ্পসকলকে বরফ করিয়া ফেলে।

প্র। সূর্য্য গ্রহণ হয় কেন?

উ। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র এক এক সময় আসিয়া থাকে, তাহাতেই সূর্য্যমণ্ডল ক্রমে ক্রমে ঢাকিয়া যায়, ইহাতেই সূর্য্যগ্রহণ হয়।

প্র। একখানি ঝাড়ের কাচ বা কলম চখে দিয়া রৌদ্রের পানে চাহিলে নানাবিধ সুন্দর রঙ্ দেখায় কেন?

উ। সূর্য্যের কিরণের মধ্যে সকল প্রকার রঙ্ আছে, সেই গুলি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নীল, পীত, হরিৎ, লোহিত ইত্যাদি নানা বর্ণ দেখা যায়। মুখে জল পুরিয়া সূর্য্যের দিকে ফুৎকার করিলে ঐরূপ বিবিধবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নীতি ও ধর্ম্ম ।

যাহার যেমন অবস্থা তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

(যাদুমণি ও তাহার মাতার কথোপকথন।)

মাতা। যাদুমণি ! আজি পাঠশালা হইতে আসিতে এত দেরী হইল কেন ? আর তুমি ও গাড়ী চড়িয়া কোথা হইতে আসিলে ?

যাদু। মা ! জমীদারদের মেয়ে চপলা আমাদের সঙ্গে পড়ে, আমি তাকে পড়া শুনা বলিয়া দি তাই সে আমার সঙ্গে 'সই' পাতাইয়াছে। আজি সে আমাকে তার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, অনেক ক্ষণ ধরিয়া সব সামগ্রী পত্র দেখাইল এবং পরে বেলা হইয়াছে দেখিয়া এই গাড়ীতে করিয়া পাঠাইয়া দিল।

মাতা। সেখানে কি দেখিলে ?

যাদু। মা ! কত রকমের যে কত জিনিস দেখিলাম তা কি বলিব ? কেমন কলের পুতুলগুলি কত সাজ গোজ পরা। কেমন সাজান ঘর সকল তায়, কত সিন্দুক বাক্স আর কত রকম সামগ্রী নামও জানি না ; কেমন

পোষাক গহনা, তুমি যদি মাতা দেখ তাহা হইলে যে কত খুসী হও বলিতে পারি না।

মাতা। আচ্ছা সকলের চেয়ে কোন্ টা তোমার খুব্ ভাল লাগল ?

যাদু। তা জানিনা। যা দেখিলাম তাহাই চমৎকার, সব দেখিয়াই সমান আমোদ পাইয়াছি। কিন্তু বোধ হয় এই যে গাড়ী চড়া ইহাতে সকলের চেয়ে বেশী সুখ। আমাদের ঐ রকম একখান গাড়ী কর না কেন ? আর চপলার মত খেলনা সামগ্রী ও কাপড় গয়না আমারে কেন দেও না ?

মাতা। বাছা! আমরা অত টাকা কড়ী কোথায় পাব ? চপলার বাপের মত তোমার বাপ ত বড় মানুষ নয়! আর যদি আমাদের যা কিছু আছে সব উহাতেই দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে খাওয়া পরা না পাইয়া সকলে মরিয়া যাইব ?

যাদু। বাবা কেন তেমন বড় মানুষ হন না ?

মাতা। চপলার বাপ বাপের জমীদারী পাইয়াছেন তাহাতেই তাঁর টাকার অভাব নাই। তোমার বাপ আপনার পরিশ্রমে যা কিছু রোজকার করেন তায় আর কি হবে ?

যাদু। অনেকেত চাকরী করিয়া বড় মানুষ হইয়াছে।

তা বাবা সেই ১০ টা থেকে ৪ টা অবধি খাটেন শুনিতে পাই কেন তবে তিনি টাকা পান না?

মা। তুমি কি জাননা যে তাঁর চেয়ে বেশী পরিশ্রম করিয়াও কত লোক আমাদের চেয়ে কষ্টে আছে?

যাদু। কই এমন কি আছে?

মা। তুমি কি জান না, আমাদের চারি দিকে কত দুঃখি-লোক আমাদের সুখের শিকির শিকিও তারা ভোগ করিতে পায় না। দেখ যারা চাস করে, দাঁড় বায়, মজুরী করে, তাদের এত দুঃখ কেন? কখন কি তাদিগকে আলস্য করিয়া থাকিতে দেখিতে পাও?

যাদু। না মা, তারা সেই রাত পোহাইলে খাটিতে আরম্ভ করে, আর সমস্ত দিন প্রায় তাদের হাত কামাই দেখিতে পাই না।

মা। মনে কর দেখি তাদের পরিবার কেমন করিয়া বাঁচে? তুমি কি তাদের মত হইতে চাও।

যাদু। ছি! তারা ছেঁড়া নেকড়া পরে, স্লেচ্ছ থাকে।

মা। যথার্থ, তারা ভারি দুঃখী এবং আমাদের চেয়ে অনেক কষ্ট পায়।

যাদু। কেন মা?

মা। তারা ক্ষুধার সময় পেট ভরিয়া ভাত, কি ভাল সামগ্রী কিছু খাইতে পায় না। শীতের সময় এক রত্তি

কাপড় না পাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। তুমি কি এসকল সহিতে পার?

যাদু। তারা ভাল খাইতে পায় না কেন? আমি দেখেছি তারা খুদ রাঁধিয়া খায় তুমি এক দিন সেই রাঁধিয়াছিলে সে খাইতে যেন অমৃত।

মা। আ অবুঝ মেয়ে! আমি সে যে কত মিষ্ট দিয়া, দুধ দিয়া পায়স করিয়াছিলাম সে ভাল লাগিবে না কেন? তারা সুধু ভাতের মত সিদ্ধ করিয়াই খায়, সে বোধ হয় তুমি মুখে দিতে পার না। তাই আবার পেট ভরিয়া কোথায় পাইবে? আমি দেখিয়াছি ফরাসী দেশের একটি রাজ কন্যা দুঃখি-লোকদের অবস্থা যেমন জানিত তুমিও সেইরূপ জান।

যাদু। সে কি মা বল না শুনি।

মা। এক বছর ঐ দেশে ভারি মন্বন্তর হওয়াতে অনেক দরিদ্র লোকের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়। একটা বড় ঘটনা হইলে সকল ঠাঁই তার তোলপাড় হয়, সুতরাং ঐ কথা রাজ বাটীর মেয়েদেরও কাণে উঠিল। একটি রাজকন্যা বলিলেন কি আশ্চর্য্য। এরা এত নির্ব্বোধ যে না খাইয়া মরিয়া গেল; আমি অন্ততঃ রুটী পনির খাইয়া থাকিতাম। ইহাতে তাঁহার একটি দাসী বলিল রাজকন্যা জান না, তামার বাপের বেশী ভাগ প্রজা চিরকাল যৎকুৎসিত পোড়ারুটী খাইয়া প্রাণ

ধারণ করে, এখন তাও পায় নাই বলিয়া মরিতেছে। খাবার জন্যে লোকেরা যে এত কষ্ট পায় রাজকন্যা এটি কখনও ভাবেন নাই। এখন দয়াতে তাঁর মন এমনি ভিজিয়া গেল যে তিনি আপনার গার গহনা ও পোষাক বেচিয়া দুঃখিদের সাহায্য করিতে টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

যাদু। আমার বোধ হয় খাওয়া না পেয়ে আমাদের দেশে কেহ মরে না?

মা। তুমি ছেলেমানুষ খবর রাখ না বলিয়া এমন কথা কহ। ১২৪০ সালে কত লোক মরিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ছয় সাত বৎসর হইল পশ্চিম দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া হাহাকার উঠিয়াছিল, এখনও আমাদের নিকটে অনাহারে কত ঠাঁই কতলোক মরে কে তার খবর লয়? আর যদিও না মরে তবু কষ্ট পায় এমন কত লোক আছে, তাদের প্রতি দয়া করা সকলের উচিত।

যাদু। তবেত চপলার অত জিনিস পত্র রাখা অন্যায়। দিলে কত লোকের উপকার হয়।

মা। তা বলিতে পার না। তিনি যেমন বড় মানুষ সেই রূপ যদি কতক টাকায় আপনার পোষাক খেলনা ও আর আর সামগ্রী করেন, আর যদি কতক

টাকা লোকের উপকারের জন্য দেন তাহা হইলে তাহাতে দোষ নাই।

যাদু। কিন্তু আমার যেমন সামগ্রী পত্র তিনি কেন তাই রাখিয়া সন্তুষ্ট হন না, তাহা হইলে ত আরও অনেকের উপকার করিতে পারে।

মা। তুমি তাঁকে এই যে কথাটা বলিলে, মনে কর দেখি সেই কালি আমাদের বাটীতে যে মেয়ে দুটী আসিয়াছিল, তারা কি তোমারে সেই রূপ বলিতে পারে না?

যাদু। কে মা? সেই আমাদের ধান ভানে যে গোয়ালিনী তার মেয়েরা? তারা কেন বলিবে?

মা। চপলার সামগ্রী পত্র যেমন তোমার চেয়ে অধিক, তোমার জিনিস পত্র সেই দুঃখী মেয়েদের চেয়েও কি সেই রূপ অধিক নয়? তোমার মত কাপড় চোপর খেলনা তারা জন্মে পায় না।

যাদু। হাঁ মা তা আমি দেখেছি সেদিন আমি ভাঙ্গা পুতুল গোটাদুই ফেলে দিতেছিলাম ঐ মেয়ে দুটী তাহা পাইয়া কত আহ্লাদ করিয়া লইয়া গেল। আর সেই ছোট মেয়েটি আমার হাতে যেমন বালা, এই রকম এক যোড়া পাইবার জন্য তার মার আচল ধরিয়া কত কাঁদলে তার মা তাকে ধমকাইয়া উঠিল।

মা। আহা তারা কোথায় পাবে? পেটে চারিটি

ভাত পায় এই যথেষ্ট মনে করে। এখন তুমি দেখ সেই দুঃখী মেয়েদের মত যদি তোমাকে হইতে বলা যায়, তোমার মনে, কত দুঃখ হয় তবে চপলা কেন তোমার মত হইতে যাইবে? যার যেমন অবস্থা সে তেমনি চালে চলিবে। অবস্থার চেয়ে বেশি চালে চলিতে চাহা দোষ এবং সে হইয়াও উঠে না।

যাদুণ আচ্ছা মা আমাদের কি রকম অবস্থা?

মা। তোমার বাপ যা রোজকার করেন তাতে সংসারটী এক রকম করিয়া চলিতে পারে, তার জন্য বড় কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু বোধ কর তুমি যদি ভাল খেলনা চাও পোষাক চাও গাড়ী চড়িতে চাও তা দিতে গেলে খাওয়া পরার কষ্ট হয়। যদি আর কিছু বেশী টাকা হয় তাহা হইলে তোমাদের ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখান যায়, ঘর সংসারের বন্দেজ করা যায় এ সকল আগে দরকারী। আর এখন হইতে তোমাকে যদি বড়মানুষী শেখান যায়, তাতে তোমার ভাল না হইয়া মন্দই ঘটে।

যাদু। মন্দ কেন হবে?

মা। যা এখন যদি তুমি চপলার মত পোষাক পরিতে শেখ এর পরে মন্দ কাপড় পরিতে তোমার কি কষ্ট বোধ হবে না? এই রূপ এখন যদি তোমার জন্য গাড়ী পাল্কী করিয়া দেওয়া যায় এর পরে তা কি

ত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি এমন কি ভাগ্যবন্তের ঘরে পড়িবে যে তোমাকে কোন দুঃখ কষ্ট পাইতে হইবে না? আর তাতেই বা বেশী সুখ কি পাইবে? অভ্যাসে আবার সব পুরাতন হয়, ক্রমে আরো বেশি সুখ না হইলে আর মন সন্তুষ্ট হয় না।

মা। একি তোমার বোধ হয় না যে তুমি এক-দিন গাড়ী চড়িয়া যেমন সুখ পাইলে চপলা তেমন পায় না?

যাদু। কৈ সেতো মনে করিলেই গাড়ী চড়িতে পারে কিন্তু সে সর্ব্বদা চড়িতে ভাল বাসে না। গাড়ী চড়িলেও তার কৈ বেশী একটা আহ্লাদ কিছু দেখা যায় না।

মা। এখনি বুঝিবে যে বড় মানুষেরা ভাল খায় পরে বলিয়া যে মনে একটা বেশী সুখ পায় তা নয়। কিন্তু বোধ কর একটু কষ্ট হইলে কার অধিক লাগে। যদি চপলাকে আর তোমাকে হাঁটিয়া চলিতে বলা যায় তিনি দু পা চলিয়া বসিয়া পড়িবেন তুমি স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া আসিবে। অতএব দেখ সুখ অভ্যাস করিলে একটু দুঃখে কত কাতর হইতে হয়। আমাদের মত লোকের আরও, কষ্ট অভ্যাস করা ভাল কেন না যদি অবস্থা কিছু মন্দ হয় তাতেও কাতর হইতে হইবে না। যারা আপনার অবস্থা না বুঝিয়া ভাল খাব, ভাল

পরব, আঁক অনেক দেখাইব এই রূপ নানা সুখ চায় তাদের চেয়ে নির্ব্বোধ আর নাই। এরূপ মেয়েমানুষ লক্ষ্মী ছাড়া হয়।

যাদু। মা তুমি যে কথা গুলি বলিলে ঠিক আমার সত্য বোধ হইতেছে। আর আমি বড়মানুষী করিতে চাইব না।

মা। বাছা এখন এগুলি যাতে মনে থাকে এমন করিবে। বড় মানুষদের দেখিয়া সেরূপ হইতে চাহিও না, অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। বরং দুঃখী লোকদের অবস্থা দেখিয়া আপনার সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। আর যখন যে অবস্থায় পড় সেই মত হইয়া চলিবে, মন সন্তুষ্ট থাকিলে সকল অবস্থাতেই সুখ পাওয়া যায়।

কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ।

(উপক্রমণিকা।)

বৎসে হেমাঙ্গিনি! তুমি এখন অল্প বয়স্কা বালিকা। ঈশ্বর প্রসাদে তুমি অতি সুন্দর সময়ে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। এখন সর্ব্বত্র বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এখন স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতেছে।

যে স্ত্রীলোকেরা এক সময়ে নির্ব্বোধ ও অল্পবুদ্ধি বলিয়া সকল লোকের ঘৃণার পাত্রী ছিল, এখন তাহারা জ্ঞান শিক্ষা করিয়া বিদ্বান্ পুরুষদিগের নিকট আদরণীয়া হইতেছে ; এখন পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহুবিধ সুখ ভোগেও সমর্থ হইতেছে। অতএব অন্য অন্য বালিকাদিগের ন্যায় তুমিও এখন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সুশীলা ও বিদ্যাবতী হও। আমি যখন বালিকা ছিলাম তখন আমাদিগের দেশে এপ্রকার বিদ্যার আলোচনা ছিল না। পুরুষদিগের মত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহাও আমরা জানিতাম না। শৈশবকালে আমি যখন পিত্রালয়ে ছিলাম, তখন আমার ভ্রাতাদিগকে আমি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে যাইতে দেখিতাম। তখন মনে মনে ভাবিতাম যাহারা পুরুষ, তাহাদিগের কেবল লেখা পড়া শিখিতে হয়, আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিতে নাই, কেবল গৃহকর্ম্ম ও পুরুষদিগের সেবা করিতে হয়। কিছু দিন পরে আমার বিবাহ হইল ; তোমার পিতা আমাকে লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন "পুরুষেরা যেমন বিদ্যা শিক্ষা করে, স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ করা উচিত।" কিন্তু আমি তাঁহার কথা শুনিতাম না, মনে মনে ভাবি-

তাম মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শিখিয়া কি হইবে? তোমার পিতা আমাকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি তাহা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ আমার পাঠ অভ্যাস করিতে অতিশয় বিরক্তি বোধ হইত, কিন্তু আমি ক্রমে ক্রমে যত অধিক শিখিতে লাগিলাম ততই বিদ্যা শিক্ষা করিতে আমার অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। কিছু দিন এই রূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যখন তাহার আস্বাদ বুঝিতে পারিলাম, তখন মনে বিবেচনা হইতে লাগিল যে হায়! আমি এত দিন বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছি; বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া আমি এত দিন পশুর মত হইয়াছিলাম। আহা! আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া কত অসুখী হইয়া রহিয়াছে! তাহারা এই পৃথিবীর কিছুই জানিতে পারে নাই! তাহারা চক্ষু থাকিতেও অজ্ঞানে অন্ধের মত হইয়া রহিয়াছে। এই যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি ইহার আকার কি প্রকার; ইহার কোন্ স্থানে কত প্রকার মনুষ্য বসতি করে; কোথায় কোন্ প্রকার দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়; কাহার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়; কি প্রকার কার্য্য করিলে যথার্থ ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়; শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতু সমুদায়; মেঘ, বৃষ্টি, ভূমিকম্পা প্রভৃতি ঘটনা সকল কোন্ কোন্

কারণ হইতে কি প্রকারে হইতেছে ইত্যাদি বিবিধ বিষয় তাহারা কিছুই অবগত নয়। তাহারা আপনারা বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নয়। পুরুষেরা যদি কোন মন্দ কার্য্যকে ভাল কার্য্য বলে, তথাপি তাহারা তাহাকে ভাল জ্ঞান করে। হায়! তাহারা বিদ্যাভাবে এত অজ্ঞান হইয়াছে যে যাহারা তাহাদিগের শত্রু, তাহাদিগকে তাহারা সুহৃদ জ্ঞান করিতেছে। মূর্খ ও নির্দ্দয় পুরুষগণ তাহাদিগকে এমন অমূল্য ও অশেষ সুখকর বিদ্যাধন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি তাহারা দাসীর মত হইয়া তাহাদিগেরই সেবা শুশ্রূষা করিতেছে এবং যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে তজ্জন্য তাহারা ব্যস্ত রহিয়াছে। আমাদিগের দেশের মূর্খ স্ত্রীলোকেরা কত প্রকার ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে! তাহারা মনে করে, আমরা যদি ধনবান্ স্বামী পাই এবং নানাবিধি স্বর্ণ অলঙ্কার দ্বারা শরীরকে ভূষিত করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগের জীবন সার্থক হয়। কেহ কেহ বিবেচনা করেন আমি যদি সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি এবং দাসীর মত পরিপাটীরূপে সকলেরই সেবা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সফল হয়। কেহ কেহ মনে করেন আমার যদি অনেক গুলি সন্তান সন্তুতি হয় এবং তাহাদিগের উত্তমরূপে ভোগ বিলাস করাইতে

পারি তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয়। এই প্রকার ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া তাহারা অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছে। যথার্থ সুখ যে কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহা তাহারা অবগত নয়। তাহারা যে সকল বিষয় ভোগ করিলে সুখী হইব মনে করিতেছে তাহাতে যথার্থ সুখ কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মনুষ্য হইয়া তাহারা জ্ঞান-হীন পশুর ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। আহা! আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দর্শন করিলে আমার মন অতিশয় দুঃখিত হয়। হেমাঙ্গিনি! তুমি মনোযোগ দিয়া আমার উপদেশ সকল শ্রবণ কর; এ সময়ে যেন বিদ্যা শিক্ষায় ঔদাস্য করিয়া চিরজীবনের মত দুঃখিনী না হও। তুমি বিদ্যাবতী হইয়া তোমার প্রতিবাসিনীগণকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া তাহাদিগের উপকার করিতে যত্নশীল হও।

আমি অধিক বয়স্কা হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য নানামত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি নাই। তুমি শৈশব অবস্থাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, পরিশ্রম ও মনঃসংযোগ করিয়া শিক্ষা করিলে আমার অপেক্ষা অধিক শিক্ষা করিতে পারিবে। এখন অনেক স্থানে অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর দশ বার বৎসর কাল পরে তোমরা সকলে বিদ্যাবতী

হইলে এই মলিন বঙ্গদেশের এক নূতন শ্রী হইবেক। হিংসা, দ্বেষ, কলহ প্রভৃতি রহিত হইবে; পিতা ও পুত্রের, মাতা ও কন্যার, এবং স্ত্রী ও স্বামীর ও পরস্পর অসদ্ভাব থাকিবে না। সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সুখে কালযাপন করিবে।

হেমাঙ্গিনি! তুমি যেমন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জ্ঞানবতী হইবে, সেইরূপ যে সকল নীতি উপদেশ পাও তদনুসারে কার্য্য করিয়া সৎকর্ম্মশীলা ও সচ্চরিত্রা হইবে, দুঃখিজনদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে এবং সকলের মঙ্গল সাধন করিতে সর্ব্বক্ষণ যত্নবতী থাকিবে।

বৎসে! জীবন অমূল্য ধন; ইহা কখন বৃথা ক্ষেপণ করিও না। কিছু দিন পরে তোমাকে শ্বশুর ঘর করিতে হইবে, কত গুরুতর ভার সকল বহন করিতে হইবে। এই বেলা শান্ত ও ধীর হইয়া আপনার কর্ত্তব্য তুমি শিক্ষা কর। আমাদিগের মাতা পিতা আমাদিগের প্রয়োজনীয় কোন কর্ম্মই ভাল করিয়া শিখান নাই, নীতি উপদেশ সকলও ভাল করিয়া দেন নাই এ জন্য আমরা যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা আর কি বলিব। পাছে সেই সকল যন্ত্রণা তোমাকেও ভোগ করিতে হয় এই জন্য বার বার বলিতেছি অতি সাবধান হইয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক

হইবে এবং চিরকল্যাণ লাভ করিবে। বাছা! ইহা অপেক্ষা মাতার আর সুখের বিষয় কি আছে!

প্রথম উপদেশ।

(বিদ্যা শিক্ষা।)

বৎসে হেমাঙ্গিনি! আমি তোমাকে সে দিবস যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম তাহা তুমি যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতেছ তো? আমার নিতান্ত বাসনা যে অবকাশ ক্রমে সময়ে সময়ে তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করি, কিন্তু গৃহ-কর্ম্মে এমনি ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে,সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। তুমি যেমন বিদ্যালয়ে নানা বিধ জ্ঞান শিক্ষা কর, তেমনি আমার দ্বারা যদি গৃহে সদুপদেশ প্রাপ্ত হও তাহা হইলে তোমার জ্ঞান ও চরিত্র উভয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়। অদ্য এখন আমি সাংসারিক কার্য্য হইতে অবকাশ পাইয়াছি, এখন আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। তোমার বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠসকল অভ্যাস হইয়াছে, এখন আমি যাহা বলি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। তুমি অতি অল্পদিন বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছ, বিদ্যা যে কি পরম ধন তাহা তুমি এখন বুঝিতে পার নাই। বিদ্যার সীমা নাই, বিদ্যা যত শিক্ষা করিবে

ততই তাহা শিক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হইবে। যে সন্তান শৈশব কালে বিদ্যাশিক্ষা করিতে অবহেলা করে সে চিরকাল মূর্খ হইয়া অতি দুঃখে কাল যাপন করে। অতএব তুমি আলস্য করিয়া পাঠে অনাবিষ্ট হইও না। যখন তুমি অতি শিশু ছিলে, কথা কহিতে পারিতে না, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার শক্তি ছিল না, আপনার খাদ্য দ্রব্য আপনি খাইতে পারিতে না, তখন আমি কত যত্নের সহিত কত স্নেহের সহিত তোমাকে লালন পালন করিয়াছি, এবং সর্ব্বক্ষণ যত্ন পূর্ব্বক তোমাকে ক্রোড়ে রাখিয়া নানাবিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। যখনি তোমার ক্ষুধা হইয়াছে তখনই স্তনদুগ্ধ দিয়া তোমার ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছি, তোমার অসুখ হইলে আমরা ভাবনা চিন্তাতে অস্থির হইয়াছি এবং পীড়া নিবারণ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি। নিদ্রা না হইলে পাছে তোমার পীড়া হয় এই ভয়ে কত প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে, তোমাকে ঘুম পাড়াইয়াছি। এইরূপ নানা প্রকার কষ্ট করিয়া শিশুকালে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি এবং এখন তুমি ক্রমে বড় হইতেছ; এখন তোমাকে অন্নবস্ত্র পুস্তকাদি দিয়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি যদি বিদ্যাবতী ও সুশীলা না হইয়া আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের

মত মূর্খ ও নির্ব্বোধ হও, তাহা হইলে আমি কত অসুখী হইব! তুমি বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া আপনার জীবন সার্থক করিবে এবং আমার মুখ উজ্জ্বল ও স্বদেশস্থ দুর্ভাগা স্ত্রীগণের সৌভাগ্য সাধন করিবে, আমার চিরদিনের এই আশা যেন বিফল করিও না। আমি যে তোমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি তুমি সচ্চরিত্রা ও বিদ্যাবতী হইলে সে সকল আমার সার্থক হইবে।

বিদ্যাধন উপার্জ্জন করিতে হইলে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এই দুইটি গুণ নিতান্ত আবশ্যক. যিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যা শিক্ষা না করেন, তিনি যত কেন বুদ্ধিমান্ হউন না উত্তমরূপে বিদ্যালাভ করিতে পারেন না। অনেকের একপস্বভাব যে প্রথমতঃ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু কিছু দিন পরে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে। যাহারা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত না হয় তাহাদিগেরই প্রায় এই রূপ হইয়া থাকে। অতএব হেমাঙ্গিনি! তুমি এই সময় হইতে সাবধান হও, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকে বিদ্যা শিখিবার প্রধান উপায় জানিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিদ্যাব্রত পালন কর।

বিদ্যাশিক্ষাকরা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা না করাতে আমাদিগের দেশের যে

কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা তুমি এখন বুঝিতে পার নাই; যেমন চক্ষু না থাকিলে মনুষ্য কোন বস্তু দেখিতে পায় না, সেই রূপ বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত না হইলে কিসে অকল্যাণ হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তুমি বিদ্যাবতী হইলে দেশের দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া উহার মঙ্গল সাধন করিবার জন্য দিবানিশি যত্ন ও পরিশ্রম করিবে।

তুমি বিদ্যারসের আস্বাদন পাইলে কি প্রকার সুনিয়মে সাংসারিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিপ্রকারে সন্তান সন্ততিগণের প্রতিপালন করিতে হয়, কিপ্রকার আচার ব্যবহার করিলে পরিবার মধ্যে সকলের সদ্ভাব হয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় উত্তমরূপে জানিতে পারিবে। তুমি জ্ঞান শিক্ষা পাইলে আমাদিগের দেশের মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের মত পরিবার মধ্যে ঝগড়া কলহ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে না এবং যে যাহা বলিবে তাহাই বিশ্বাস করিয়া তুমি নিরর্থক অসুখ ও বিপদে পতিত হইবে না।

দেখ মূর্খ স্ত্রীলোকেরা সন্তানগণের পীড়া হইলে কতপ্রকার বৃথা কার্য্য করিয়া বিপদ্ আনয়ন করে। কখন সা-ফকিরদের মালা গলায় দিয়া, কখন মন্ত্র দ্বারা ঝাড়াইয়া, কখন স্বস্ত্যয়ন করাইয়া পীড়ার সুচিকিৎসা করে না। ইহাতে কত অনিষ্ট হয়! তাহারা যদি জ্ঞান

শিক্ষা পাইত তাহা হইলে কখন এ প্রকার হাস্যকর কার্য্য করিত না।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাচর্চ্চা না করাতে আমাদিগের দেশের যে কত অমঙ্গল হইয়াছে তাহা বলিয়া কত জানাইব। যদি তুমি মনোযোগ দিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর তবে দেশের হীন অবস্থা দেখিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিবে না।

অনেক পুরুষ আছে তাহারা সুদ্ধ অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা করে, বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার, ভ্রম, আলস্য ইত্যাদি কিছুই দূর হয় না। অশিক্ষিত লোকেরা যেরূপ অসৎকার্য্য সকল করে, তাহারা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াও সেইরূপ সর্ব্বদা অসৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এবং ন্যায় অন্যায় পথ বিবেচনা না করিয়া যে প্রকারে হউক অর্থ উপার্জ্জন করিতেই জীবন ক্ষয় করে। পুরুষদিগের মত অনেক স্ত্রীলোকও এরূপ আছে তাহারা বাল্যকালে পিত্রালয়ে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করে, পরে বিবাহ হইলে শ্বশুর বাটী গিয়া এক কালে বিদ্যালোচনা পরিত্যাগ করে, যদি কখন পড়িতে ইচ্ছা হয়, তবে বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি অতি কদর্য্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়া কুপ্রবৃত্তির আলোচনা করে। যাহারা এইরূপে বিদ্যা শিক্ষা করে তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা করিয়া

কোন ফল হয় না, লাভের মধ্যে কেবল অহঙ্কার হয়, এরূপে বিদ্যাভ্যাসকরা অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকা ভাল। কারণ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া লোকে নম্র বিনীত, শান্ত, সচ্চরিত্র, দয়ালু ও পরোপকারী হইবে এবং সর্ব্বক্ষণ সত্যবান্ হইয়া আপনার প্রতিবাসীগণের স্বদেশস্থ ব্যক্তিদিগের এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যের মঙ্গলসাধন করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টান্বিত থাকিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এরূপ কার্য্য সকল না করে কেবল বিদ্বান্ হইয়াছি বলিয়া লোকের নিকট অহঙ্কার করে এবং অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া যাহা-ইচ্ছা কার্য্যে তাহা ব্যয় করে, জগতের কোন উপকার সাধন করে না তাহার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কি ফল হয়? যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এরূপ অসৎচরিত্র হয় সে মনুষ্য নামের যোগ্য নয়, তাহাকে পশুতুল্য বলা যাইতে পারে।

অতএব হেমাঙ্গিনি! তুমি যেন এইরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিদ্যানামে কলঙ্ক দিও না। তুমি বিদ্যাবতী হইয়া সত্য মিথ্যা বিবেচনা পূর্ব্বক কুসংস্কার ও ভ্রম হইতে মনকে পরিশুদ্ধ রাখ, দয়াবতী হইয়া পরোপকার সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা কর, দেশের মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের মন হইতে কুসংস্কার ভ্রম ও অসদ্ভাব সকল দূর করিয়া যাহাতে দেশের যথার্থ মঙ্গলের পথ স্থাপিত

করিতে পার তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্নশীলা থাক এবং স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া এইরূপ বিবিধ সৎকর্ম্ম সাধন দ্বারা যাহাতে দুর্ল্লভ মানবজীবন সার্থক করিতে পার এই-রূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে যত্নশীলা হও।

দ্বিতীয় উপদেশ।

(কুসংস্কার।)

"হেমাঙ্গিনি! বাছা অদ্য তোমাকে পুনর্ব্বার উপ-দেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অদ্য তোমাকে কুসংস্কারের বিষয় উপদেশ দিব। কুসংস্কার কাহাকে বলে বোধ করি তুমি জান না। উহার বিষয় যাহা বলিতেছি শ্র-বণ করিয়া তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কর। আমাদিগের এই বঙ্গভূমির মুখশ্রী যে এত মলিন হইয়াছে ইহার এ-কটি প্রধান কারণ কুসংস্কার।

কুসংস্কার দোষে আমাদিগের দেশের রাশি রাশি শ্রমসাধ্য ধন অনর্থক ব্যয় হইতেছে; কুসংস্কার দোষে কত শত ব্যক্তি এমন অমূল্য সময় রত্নকে কত অসৎ বিষয়ে নিরর্থক ক্ষেপণ করিতেছে; কুসংস্কার দোষে আমাদিগের বঙ্গদেশে দুঃখ ও পাপের ভার অ-শেষরূপে বৃদ্ধি হইতেছে। অত্যল্প শ্রম, অর্থ ও সময় দ্বারা যে কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে আমা-

দিগের দেশস্থ কুসংস্কারাপন্ন ও অজ্ঞান স্ত্রীপুরুষেরা তাহা বহু ব্যয়ে ও বহুকষ্টে অতি জঘন্যরূপে সম্পন্ন করে। কুসংস্কার দ্বারা আমাদিগের বঙ্গদেশের যে কি পর্য্যন্ত অমঙ্গল হইতেছে তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না।

যে সকল মনুষ্য জ্ঞানবান্ হন তাঁহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার সকল প্রায় দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের কুসংস্কার দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন। মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইলে কুসংস্কারশূন্য হয় বটে কিন্তু এমন অনেক কুসংস্কার আছে যাহা শৈশব কালে অজ্ঞান অবস্থায় অভ্যাস হইলে যখন জ্ঞানোদয় হয় তখনও তাহা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য হয়। বৎসে। তুমি এখন সকল কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিতে সক্ষমা হও নাই। সাবধান হও, দেখিও যেন সকল বিষয়কেই হঠাৎ সত্য কিম্বা মিথ্যা জ্ঞান করিও না। কারণ যে বিচার না করিয়া কোন বিষয় বিশ্বাস কিম্বা অবিশ্বাস করে তাহার মনে প্রায় সচরাচর কুসংস্কার জন্মে।

এই বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া রাখিও যে 'আমি এখন শিশু, যত দিন আমার ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা বিচার করিবার শক্তি না হইবে তত দিন আমি কোন বিষয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিব না, যখন সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, বিচার করিবার জ্ঞান হইবে তখন যাহা সত্য ও

ভাল বোধ হইবে তাহা বিশ্বাস করিব এবং যাহা অসত্য ও মন্দ বোধ হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব।

যে বিষয় বাস্তবিক সত্য তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করা এবং যে বিষয় বাস্তবিক মিথ্যা তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকে কুসংস্কার কহে। যে সকল ব্যক্তির কুসংস্কার আছে তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন বলে। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা অনেক মিথ্যা বিষয়কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং অনেক সত্য বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, পৃথিবীতে কোন কালে ভূত নাই, ডাইন নাই, মন্ত্রাদির কোন শক্তি নাই, জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরা তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং আমরা পৃথিবীর ঘটনা সকল দেখিয়াও অক্লেশে বুঝিতে পারিতেছি যে এ সকল কেবল বৃথা শব্দ মাত্র বাস্তবিক ভূত প্রভৃতি এমন কোন কিছু পৃথিবীতে নাই, কিন্তু যে সকল ব্যক্তির বাল্য অবস্থায় অজ্ঞান লোকদিগের মুখে ভূত ইত্যাদির কথা শুনিয়া কুসংস্কার জন্মিয়াছে তাহাদিগকে অতি উত্তমরূপে যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে ভূত ইত্যাদি নাই তথাপি তাহারা বলিবে এ সকল আছে। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা যাহা পূর্ব্ব অবধি ভাল বলিয়া জানে তাহা যদি মন্দ হয় তবু তাহাকে মন্দ

বলিবে না, এবং যাহা মন্দ বলিয়া জানে তাহা যদি ভাল হয় তবু তাহাকে ভাল বলিবে না। তাহার দৃ-ষ্টান্ত এই, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, বিদ্যা শিখিলে তাহারা ধীর, শান্ত, সচ্চরিত্র হয়, কাহার সহিত বিবাদ কলহ করে না, পরনিন্দা, পর হিংসা করে না, সকলকে ভাল বাসে এবং সকলের ভাল করিতে যত্নবতী হয়, কাহার প্রতি অপ্রিয় ও কটু বাক্য প্রয়োগ করে না; আলস্য করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে না, আর বিবেচনা করিয়া ব্যয় করিতে পারে, মূর্খ স্ত্রী পুরুষদিগের মত ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের প্রতারণা বাক্যে ভুলিয়া যায় না, গণক, রোজা, বাজিকর প্রভৃতি প্রবঞ্চক সকল ফাঁকি দিয়া তাহাদিগের নিকট অর্থ লইতে পারে না। কারণ বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ কোন বিষয় বিশ্বাস করেন না, বিচার দ্বারা যাহা সত্য বোধ হয় তাহাই বিশ্বাস করেন কিন্তু মূর্খ স্ত্রীলোকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য করে। ফাঁকি দিয়া অর্থ লইবার জন্য প্রতারক ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে যাহা বলে তাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় তাহাই করে। একবার মনে ভাবিয়াও দেখে না যে ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কি মিথ্যা। যদি বুঝিয়া দেখে তবে অনায়াসে বুঝিতে পারে যে ইহারা আমাদিগকে নির্ব্বোধের ন্যায় ভুলাইয়া অর্থ লইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিলে এই প্রকার কত উপকার হয় এবং শিক্ষা না দিলে এইরূপ কত অপকার হয় ইহা সকল মনুষ্যই প্রতিদিন দেখিতেছেন এবং সকল ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করেন যে বিদ্যা দ্বারা মঙ্গল এবং মূর্খতা হইতে অমঙ্গল হয়। কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা তথাপি বলিবে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিলে কোন ফল হয় না, তাহাতে বরঞ্চ অনিষ্ট হয়।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সকল শিশু গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করে তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা বিদ্যালয়ে পাঠ করে তাহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি, সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট হয়। গুরু মহাশয়েরা সুশিক্ষিত লোক নয়, তাহাদিগের পাঠশালায় শিক্ষা করিলে শিশুগণ অসচ্চরিত্র হয়, অপহরণ করিতে শিক্ষা করে, মিথ্যা কথা কহে, শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে পারে না, সর্ব্বদা অপ্রিয় বাক্য কহে, সকলের সঙ্গে বিবাদ কলহ করে। বিদ্যালয়ে পড়িলে সুশীল শান্ত ও মিষ্টভাষী হয়, শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে সকল লোক কুসংস্কারাপন্ন তাহারা তথাচ গুরুমহাশয়ের পাঠশালাকে উত্তম শিক্ষাস্থান জ্ঞান করে এবং তথায় সন্তানদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে নিযুক্ত করে। আমাদিগের দেশের মূর্খ ও প্রাচীন ব্যক্তিরা প্রায় কুসংস্কারাপন্ন।

তাঁহারা বলেন টিকুটিকী ডাকিলে কোন স্থানে উঠিয়া যাইতে নাই, বৃহস্পতিবারের বৈকালে কোন কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, প্রাতঃকালে রজকের মুখ দর্শন করিলে সমস্ত দিন অসুখে গত হয়, কোনস্থানে যাইবার সময় কেহ হাঁচিলে তৎকালে সে স্থান যাইতে নাই। তাহাদিগের অশেষ প্রকার কুসংস্কার এইরূপ আছে। তুমি যদি সর্ব্বদা তাহাদিগের নিকট থাক তাহা হইলে জানিতে পারিবে। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা স্পষ্টরূপ দেখিতেছে যে তাহারা যে সকল কথা বলে তাহা কার্য্যে কখন সত্য বোধ হয় না, তাহারা যে সময় কার্য্য করিলে সিদ্ধ হয় না বলিয়া থাকে সেই সময় কার্য্য করিয়া কত লোক কৃতকার্য্য হইতেছে, কিন্তু কুসংস্কারের এমনি দোষ যে তাহারা তথাপি আপনাদিগের ভ্রম পরিত্যাগ করে না।

কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা এই রূপ অশেষবিধ মন্দ কর্ম্মকে ভাল এবং ভাল কর্ম্মকে মন্দ জ্ঞান করে এবং সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। যে দেশের লোকের অধিক কুসংস্কার আছে সে দেশের শীঘ্র উন্নতি হয় না। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা পূর্ব্বে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই করে নূতন কোন বিষয় প্রচলিত করিতে চাহে না। যে কর্ম্ম করিলে দেশের উপকার হয় তাহা যদি প্রচলিত না থাকে তবে তাহা

কখন করে না। যে দেশের লোকেরা অধিক অজ্ঞান সে দেশের লোকেরা অধিক কুসংস্কারাপন্ন হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হইলে জ্ঞানবান্ হইলে প্রায় কুসংস্কারাপন্ন হয় না। মূর্খেরাই অধিকাংশ কুসংস্কারাপন্ন হয়। দেখ বিলাতের লোকেরা বিদ্যার অধিক আলোচনা করে, তথাকার অধিক লোক জ্ঞানী এবং কুসংস্কারশূন্য। যে কর্ম্ম করিলে দেশের উপকার হইবে, আপনাদিগের মঙ্গল হইবে, সে কর্ম্ম তাহারা অবিলম্বে সম্পন্ন করে। এই নিমিত্ত বিলাতের এত উন্নতি হইয়াছে, তথাকার অধিবাসীগণ সভ্য হইয়াছে এবং সুখে কালযাপন করিতেছে।

আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোক কুসংস্কারাপন্ন এ জন্য এ দেশের উন্নতি হইতেছে না। যখন এ দেশে স্ত্রী পুরুষ, ধনী নির্ধন, সকল লোকেরমধ্যে বিদ্যার আলোচনা হইবে তখন ইহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার সকল দূর হইবে, দেশের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকিবে এবং সকলে সুখে কালযাপন করিবে।

অতএব হেমাঙ্গিনি! কুসংস্কার কাহাকে বলে এখন তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। অজ্ঞান লোকদিগের মত তুমি কুসংস্কারাপন্ন হইও না। যে কর্ম্ম ভাল বলিয়া বুঝিতে পারিবে যাহা করিলে দেশের উপকার হইবে, সকলের সুখ বৃদ্ধি হইবে তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করিবে। সেই

সৎকার্য্য সাধন করিতে ঔদাস্য করিলে তুমি পাপগ্রস্ত হইবে। যে কার্য্য সাধন দ্বারা অসুখ ও অনিষ্ট ব্যতীত উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা কোন মতে করিবে না। অজ্ঞান ও নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন হইয়া মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ জ্ঞান করিও না।

তৃতীয় উপদেশ।

(জ্ঞান ও কার্য্য।)

মা হেমাঙ্গিনি! গতবারে আমি তোমাকে কুসংস্কারের বিষয় কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম। সংক্ষেপে তাহার বিষয় যাহা বলিয়াছি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে তোমার মন ভবিষ্যতে আর ভ্রমে আচ্ছন্ন হইবে না, এবং ভাল মন্দ, সত্য অসত্য বিষয় সকল অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু মন হইতে সুদ্ধ কুসংস্কার সকল দূর হইলেই মনে করিও না যে বিজ্ঞ ও সৎ মনুষ্য হওয়া হইল, কুসংস্কারশূন্য হইলেই যে মনুষ্য মহৎ ব্যক্তি হয় এমত নয়। মনুষ্য কুসংস্কারশূন্য হইলে ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা বিচার করিতে সমর্থ হয় ইহা সত্য বটে, কিন্তু যিনি যে বিষয় ভাল বলিয়া জানেন অথচ কাজে তাহা করেন না, কিম্বা যিনি কোন বিষয় সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে

বিশ্বাস করেন না, তাঁহার কুসংস্কারশূন্য হইয়াও যে ফল, না হইয়াও সেই ফল।

কারণ যেরূপ জ্ঞান জন্মে সেইরূপ যদি কাজ না হয় তবে সে জ্ঞানে কি ফল? মনে কর, আমি এক জন মূর্খ ব্যক্তি আর এক জন অতি বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত; সুতরাং তিনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়ের সদ্বিচার করিতে সমর্থ, আমার অপেক্ষা তাঁহার বাক্পটুতা আছে, আমার অপেক্ষা তিনি সর্ব্বাংশে জ্ঞানবান্। কিন্তু তাঁহার যেরূপ জ্ঞান তাহার মত কাজ নয়। তিনি অপর লোকদিগকে উপদেশ দেন মিথ্যা কথা বলা অতি অন্যায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং কার্য্যে শত সহস্র-বার মিথ্যা কথা কহেন, তিনি মুখে বলেন দুঃখিলোক-দিগের প্রতি দয়া করা উচিত, কিন্তু কাজের সময় দুঃখিলোকদিগকে দেখিলে দয়া প্রকাশ করেন না, তিনি উত্তম রূপে জানেন যে অকারণে রাগ করা অনুচিত, কিন্তু অতি সামান্য দোষে দাস দাসীদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। অতএব আমি মূর্খ আর তিনি বিদ্বান্ বলিয়া কি প্রভেদ হইল। আমি যেমন বুঝি সেইরূপ কার্য্য করি, আমার মুখে এক রকম কাজে অন্য রকম নয়, কিন্তু তিনি ভিতরে এক রকম ও বাহিরে অন্য-রকম হইয়া প্রতারকের ন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহাকে ছদ্ম বেশধারী বহুরূপী বলা যাইতে পারে। জ্ঞানের

অনুরূপ কার্য্য না করিলে তাহাতে অধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। যিনি জ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য না করেন তিনি লোকের নিকট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হন না, বরঞ্চ সকলে তাঁহাকে ভণ্ড ও অধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া থাকে।

আমাদিগের এই ভারতবর্ষের এক্ষণে উত্তমরূপ বিদ্যার আলোচনা হইতেছে, এখন অনেক লোক বিদ্বান্ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষের উন্নতি হইতেছে না ইহার কারণ কি? ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে এতদ্দেশীয় লোক সকল যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে সেরূপ কার্য্য সকল করিতেছে না। ইহাদিগের বক্তৃতাই সর্ব্বস্ব, কাজ কিছুই নয়। একারণ এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের এই অপবাদই হইয়া গিয়াছে যে তাঁহাদিগের "কাজ অপেক্ষা কথা অধিক।"

আমাদিগের দেশের কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি না বুঝিয়াছেন যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অতি আবশ্যক; কিন্তু প্রায় অধিকাংশ লোকই আপন আপন স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে মূর্খ করিয়া রাখিয়াছেন তথাপি কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়েন না। তাঁহারা আবার আপনাদিগকে সভ্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। হায় কি আক্ষেপের বিষয়! আমাদিগের দেশের লোক সকল জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্রূপ কার্য্য না করাতে দেশের কত

অমঙ্গল হইতেছে। প্রিয়ে কুমারি! তুমি যদি আমাকে বল যে আমি কারপেটের ফুল বুনিতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমি যদি তোমাকে ফুল বুনিতে বলি এবং তুমি তাহা বুনিতে না পার তাহা হইলে তোমার ফুল বুনিতে শিখা যেমন কোন কর্ম্মের হয় না, সেইরূপ যে সকল জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিবে তাহার মত কার্য্য করিতে না পারিলে সে জ্ঞান ও উপদেশ লাভে কোন ফল নাই। অতএব বাছা যেরূপ জ্ঞান লাভ করিবে সেইরূপ কার্য্যও করিবে। আমি এমত অনেক বালক বালিকা দেখিয়াছি তাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করে—সকলকে ভাই ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়, দীন হীন অন্ধ জনদিগের সাধ্যমত উপকার করা কর্ত্তব্য, কোন জীব জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না; কিন্তু তাহারা যে মাত্র বিদ্যালয় হইতে বাটী আসে তৎক্ষণাৎ হয়ত কোন খাবার দ্রব্য কিম্বা খেলিবার বস্তুর জন্য ভাই ভগ্নী, মাতা পিতাকে কটুবাক্য কহে, এবং পক্ষির বাসা হইতে পক্ষিশাবক আনিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয় এবং পথিমধ্যে অন্ধ ব্যক্তিকে দেখিলে 'কাণা' বলে কিম্বা তাহার গাত্রে কোন দ্রব্য ছুড়িয়া দিয়া তাহাকে মনোদুঃখ কষ্ট দেয়। এ প্রকার অসচ্চরিত্র বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষা করা নিরর্থক। তাহাদিগের পিতা মাতা বৃথা তাহাদিগের

নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যে প্রকার শিক্ষা পাইবে সেইরূপ কার্য্য যদি বাল্যকাল হইতে করিতে চেষ্টা না কর তবে বয়স বৃদ্ধি হইলে অত্যন্ত জ্ঞান লাভ করিলেও তাহার মত কাজ কখন করিতে পারিবে না। কারণ বাল্যকাল একটি কোমল লতার ন্যায়। যেমন লতাকে যে দিকে নোয়াইতে ইচ্ছা কর সেই দিকেই অনায়াসে নোয়ান যায়, সেইরূপ লতার ন্যায় কোমল স্বভাব বাল্যকালকে যে দিকে লইয়া যাও সেই দিকে যায়। যদি বাল্যকাল হইতে সদুপদেশের মত কার্য্য করিতে চেষ্টা কর তবে চিরকালই সদুপদেশ সকল পাপালন করিতে ইচ্ছা হইবে; কিন্তু যেরূপ শিক্ষা পাইবে বাল্যকাল হইতে যদি তাহার মত কার্য্য না কর তাহা হইলে চিরকাল অসৎ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে।

অতএব হেমাঙ্গিনি! সাবধান হও, দেখিও যেন দুষ্ট বালক বালিকাদিগের সঙ্গে থাকিয়া উপদেশ সকল লঙ্ঘন করিও না। যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিবে সেইরূপ কার্য্য করিবে, তাহার অন্যথা কদাচ করিও না। জ্ঞান লাভ করিয়া যদি তাহার মত কার্য্য না কর তবে বিদ্যা শিক্ষা করায় কোন প্রয়োজন নাই, সেরূপ বিদ্যা লাভ করিয়া কি ফল হইবে? সুদ্ধ জ্ঞানবান এমন লোক আমাদের দেশেও সহস্র সহস্র আছে,

তাহারদিগের দ্বারা অপকার ভিন্ন উপকার হইতেছে না। কারণ মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকেরা বিদ্বান্ লোকদিগকে অন্যায় কর্ম্ম সকল করিতে দেখিয়া মনে করে অত বড় বিদ্বান্ লোক এইরূপ কর্ম্ম করিতেছে তবে আমরা মূর্খলোক কেন না করিব ?

তাহাদিকে যদি কোন সদ্ব্যক্তি বলেন তোমরা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় কর তাহা ব্রাহ্মণ-দিগকে দাও কেন ? দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দান করিলে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। তাহাতে তাহারা উত্তর করে যে "ইস্ ইনি বড় বিদ্বান্ হয়েছেন ! অমুক বাবুর মত কে বিদ্বান্ আছেন ? তাঁহার কাছে আপনারা ত দাঁড়াতে পারেন না।" মা বাপের শ্রাদ্ধ করিয়া কত শত ব্রাহ্মণদিগকে দান কচ্চেন, তাতে আমরা করব তার আবার কথা ?

হেমাঙ্গিনি ! বাছা বুঝিয়া দেখ যাহারা সুন্দর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মত কিছুই কাজ করেন না তাহাদিগের অসৎ কর্ম্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা কত ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম শীল হইতেছে।

অতএব বাছা ! বার বার তোমাকে উপদেশ দি-তেছি যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা পাইবে সেইরূপ কার্য্য করিবে, নতুবা তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া কোন সুখোদয় না হইয়া কেবল দুঃখেরই বৃদ্ধি হইবে।

ধন উপার্জ্জনের একটী প্রধান উপায় বিদ্যা। দরিদ্র ব্যক্তিও বিদ্যাদ্বারা ধনবান্ হইতে পারেন। অতএব যাঁহারা বিদ্বান্ হইয়া দুশ্চরিত্র হয়েন তাঁহাদিগের ধন দ্বারা কেবল দুষ্কর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়। এ নিমিত্ত অগ্রে বলা হইয়াছে বিদ্বান্ হইয়া যদি সৎকর্ম্মশীল ও সচ্চরিত্র না হয় তবে সে বিদ্যা দ্বারা কেবল দুঃখ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ বিদ্যা শিক্ষা করিবার প্রধান কার্য্য আপনার উন্নতি সাধন করা। কিন্তু উন্নতি সাধন কি কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে হয়? না বহুবিধ পুস্তক পড়িলে হয়? না বড় বড় সভায় বড় বড় বক্তৃতা করিতে পারিলে হয়?

এসকলের দ্বারা যথার্থ উন্নতি হয় না। যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যেমন জ্ঞানের চর্চ্চা তেমনি কাজের আলোচনা চাই। একজন ব্যক্তির গাত্রে পঙ্ক লাগিয়াছে, তিনি উত্তমরূপ জানেন যে পাঁক গাত্র হইতে ধুয়ে না ফেলিলে গাত্র অতিশয় দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কার থাকিবে, কিন্তু তিনি কাজে তাহা করিলেন না। অতএব তাঁহার এপ্রকার জানাতে কোন ফল হয় না; যেমন দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কার গা পূর্ব্বে ছিল সেই রূপই থাকে। সেইরূপ যিনি জানেন যে সত্যবাদী হওয়া উচিত, ধর্ম্মকর্ম্ম শীল হওয়া কর্ত্তব্য; কাম ক্রোধ লোভ মোহ দ্বেষ হিংসা ইত্যাদির বশীভূত হওয়া অন্যায়,

পরোপকার সাধনে এবং বিশুদ্ধ চরিত্র করিতে কায়-মনোবাক্যে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু কার্য্যের সময় যেরূপ কিছু করেন না, তিনি আপনার উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। অতএব আপনার যথার্থ উন্নতি করিতে ইচ্ছা থাকিলে যেমন "জ্ঞান শিখিবে তেমনি কাজ করিবে।"

চতুর্থ উপদেশ।

সৎকর্ম্ম।

সতত সৎকর্ম্ম বাছা কর আচরণ,
ভ্রমেও কুপথে কভু কর না গমন।

কুমারি হেমাঙ্গিনি! তোমাকে জ্ঞান ও কার্য্যের বিষয় উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছি যে, যেমন জ্ঞান লাভ করিবে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ দুই বিষয়ের হইতে পারে; সৎবিষয়ের জ্ঞান লাভ ও অসৎ বিষয়ের জ্ঞান লাভ। এই সৎ ও অসৎ উভয় বিষয়ের মধ্যে অনুচিত কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া উচিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিতে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। এইরূপ অনুচিত কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া উচিত কার্য্য সকল সাধন করাকে সৎকর্ম্ম বলে। এই সৎকর্ম্ম সকল সাধন করিবার নি-

মিত্ত মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন ফল পুষ্প পল্লব ইত্যাদি উৎপাদন করা পৃথিবীস্থ তরু লতার কার্য্য, যেমন ভূমণ্ডলের সমস্ত পদার্থকে আলোক প্রদান করা সূর্য্যের কার্য্য, সেইরূপ অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া সৎকর্ম্মশীল হওয়াই মনুষ্য-জীবনের কার্য্য। মনুষ্য ইহ জীবনে যে সময় যে কার্য্য করিবেন কেবল সৎকর্ম্ম সাধন করিবেন; তৎবিপরীত অসৎকর্ম্ম যিনি যে পরিমাণে করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে কুপথগামী ও অধর্ম্মভাগী হইয়া এমন দুর্ল্লভ মানব জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিবেন।

অনেকের এরূপ ভ্রম আছে যে সংসারাশ্রমে থাকিলে মনুষ্যের যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার আবশ্যক হয় তৎসমুদায় কার্য্যই সৎকর্ম্ম নয়। তাহারা বলে মনুষ্যের সংসারে থাকিয়া কতকগুলি সৎকর্ম্ম এবং কতকগুলি অসৎকর্ম্ম করিতে হয়, তাঁহা না করিলে কখন সংসারধর্ম্ম পালন করা যায় না। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত কার্য্য করিবার প্রয়োজন দিয়াছেন সে সমুদায় কার্য্য যে কখন অসৎকর্ম্ম হইতে পারে না এবং মনুষ্য কেবল আপন দোষে অসৎকর্ম্ম করিয়া পাপগ্রস্ত হয়, এই জ্ঞান তাহারা অদ্যাপি লাভ করিতে পারে নাই।

তাহারা বিবেচনা করে আহার বিহার করিয়া শরীর সুস্থ রাখা, কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপা-

র্জ্জন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করা এবং বিদ্যানুশীলন করা ইত্যাদি কার্য্য সকলকে সৎকর্ম্ম বলা যায় না, এসকল কর্ম্ম না করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না তজ্জন্য কাজে কাজেই করিতে হয়। কিন্তু দান ধ্যান ইত্যাদি কর্ম্ম সকল না করিলে যেমন অসৎকর্ম্ম করা হয়, ঐ সকল কর্ম্ম না করিলে সেরূপ অসৎ বা অনুচিত কর্ম্ম করা হয় না। তাহারা আরো বলে যে অসৎকর্ম্ম না করিয়া মনুষ্য প্রায় জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ ভ্রম তাহাদের আপনাদিগের চরিত্রদোষে হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিরজীবন অসৎকর্ম্ম করে তাহার অসৎকর্ম্মের প্রতি এত আসক্তি হয় যে, তাহাকে যদি অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মশীল হইতে উপদেশ দেওয়া যায় তবে তাহার বিবেচনা হয় সৎকর্ম্ম সাধন করা অতিশয় কষ্ট সাধ্য, এবং তজ্জন্য বলিয়া থাকে যে মনুষ্য অসৎকর্ম্ম না করিয়া কখন জীবিত থাকিতে পারে না।

যে ব্যক্তি চিরজীবন সৎকর্ম্মান্বিত হন তিনি বিবেচনা করেন যে অসৎ কর্ম্মের ন্যায় দুষ্কর কার্য্য আর নাই। অতএব চরিত্র দোষই ইহার প্রধান কারণ। অসৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরা এই ভ্রমে পতিত হইয়া কখন-সৎকর্ম্ম এবং কখন অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং এরূপও বিবেচনা করে যে এক সময় একটা অসৎ-

কর্ম্ম করিয়াছি এবং অন্য সময় একটা সৎকর্ম্ম করিলাম তাহাতে পূর্ব্বের অসৎ কর্ম্মের পাপ খণ্ডন হইয়া গেল।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। মনুষ্য অসৎকর্ম্ম করিলে পাপগ্রস্ত হয় এবং সৎকর্ম্ম করিলে তাহার উপযুক্ত পুণ্যফল ভোগ করে, একটি সৎকর্ম্ম দ্বারা কখন একটি অসৎকর্ম্মের পাপ মোচন হয় না। মনুষ্য যে সৎকর্ম্ম সকল সাধন করে তাহা তাঁহার উচিত ও কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং তাহা না করিলে তিনি নিন্দনীয় ও অধর্ম্মভাগী হয়েন কিন্তু তাহা সাধন করিলে অন্যের নিকট প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা করিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহার আপনার হিতের নিমিত্তই তিনি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করিতেছেন তাহাতে আর প্রশংসা কি? কোন ব্যক্তি প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া শরীর রক্ষা করিলে তাহাকে যেমন কেহই তজ্জন্য প্রশংসা করে না, কারণ তিনি আহার গ্রহণ করিয়া আপনারই হিতকার্য্য করিতেছেন। সেইরূপ সৎকর্ম্ম করিলে আমরা অন্যের নিকট প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা করিতে পারি না। কারণ সৎকর্ম্ম করিয়া কেবল আপনারই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করি, তাহা না করিলে অশেষ প্রকারে আপনার অমঙ্গল হইয়া থাকে। যাহাদিগের এরূপ ভ্রম আছে যে,

কেবল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই মনুষ্যের কার্য্য নয়, তাহারা অনেক সময় লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার আশায় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। তাহারা সৎকর্ম্ম করিয়া আপনাদিগকে অহঙ্কারমদে মত্ত করে এবং আপনাদিগকে মহৎ লোক জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা করে। তাহারা বিবেচনা করে যে, আমরা যে কার্য্য করিয়াছি অনেক লোক এরূপ কার্য্য করে না। অতএব আমরা সামান্য মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহি। কিন্তু তাহারা যদি ভাবিয়া দেখে যে আমরা যে কার্য্য করিয়াছি তাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য ও উচিত কার্য্য, তাহা না করিলে আমাদিগের অশেষ প্রকারে প্রত্যবায় আছে। অতএব তাহা করাতে আমাদিগের মহত্ত্ব কিছু প্রকাশ পায় নাই। তাহা হইলে সৎকর্ম্ম করিয়া তাহারা কখন অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না এবং অন্যের নিকট হইতে প্রশংসা লাভেরও ইচ্ছা করিবে না। যাহারা এ প্রকারভাবে সৎকর্ম্ম সাধন করে তাহারা কখন প্রকৃত সৎকর্ম্মান্বিত হইতে পারে না, কারণ অহঙ্কার প্রভৃতি নীচ কামনা সকল দ্বারা তাহাদিগের মনে অসদ্ভাব সকলের সঞ্চার হয় এবং মন অসৎ হইলে কার্য্যও অসৎ হয়।

অতএব সৎকর্ম্মশীল হইবার ইচ্ছা থাকিলে আপ-

নার মন হইতে সর্ব্বাগ্রে অসৎভাব সকল দূর করিতে হইবে। মন পরিশুদ্ধ না হইলে কার্য্যও পরিশুদ্ধ হয় না। প্রস্রবণের জল অপরিষ্কৃত হইলে নদীরও জল অপরিষ্কৃত হয়, যেমন চন্দন হইতে সুগন্ধ ভিন্ন কখন দুর্গন্ধ নির্গত হয় না। সেইরূপ কার্য্যের প্রধান কারণ যে মন তাহা সৎ হইলে কার্য্যও সৎ হয় এবং তাহা অসৎ হইলে কার্য্যও অসৎ হয়।

আমাদিগের দেশে এপ্রকার অনেক লোক আছে যে তাহারা আন্তরিক সদ্ভাব-বিশিষ্ট না হইয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণ অগ্রে সৎ না করিয়া বাহ্যে সৎকর্ম্ম করিতে তৎপর হয়। তাহাদিগের সৎকর্ম্ম করিবার প্রধান অভিপ্রায় কেবল ধন ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর বিস্তার করা। তাহারা বিবেচনা করে যে প্রকাশ্যরূপে আড়ম্বর পূর্ব্বক সৎকর্ম্ম করাতে বহুস্থানে তাহাদিগের নাম প্রচার হইবে, দেশ দেশান্তরের লোকেরা তাহাদিগকে ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিবে এবং ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মশীল বলিয়া প্রশংসা করিবে।

এইরূপ নীচ লক্ষ্য করিয়া তাহারা সৎকর্ম্ম সকল সাধন করে। কিন্তু সে সকল কার্য্যকে প্রকৃত সৎকার্য্য না বলিয়া অসৎকার্য্য বলা যায়। কারণ সে সকল কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের কোন পুণ্যফল লাভ না হইয়া কেবল অহঙ্কার ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি সকল বর্দ্ধিত হয়।

এরূপ কার্য্যদ্বারা যেমন মনের উন্নতি হয় না, তেমনি সৎকর্ম্ম করিলে মনোমধ্যে যে এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় সে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহা দ্বারা কখন কখন অন্যের উপকার হয় বটে কিন্তু আপনার কোন উন্নতি ও ফল লাভ হয় না। যেমন একজন ব্যক্তির মন অত্যন্ত নির্দ্দয়, দুঃখী লোক দেখিলে তাঁহার মনে দয়া উপস্থিত হয় না কিন্তু লোকের প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত তিনি কোন দুঃখী লোককে কিঞ্চিৎ দান করিলেন। তাঁহার দান দ্বারা দুঃখী লোকের উপকার হইল বটে, কিন্তু দয়াবৃত্তিকে চরিতার্থ করাতে মনোমধ্যে যে আনন্দ হয় সে আনন্দ তিনি সম্ভোগ করিতে পারেন না এবং ধর্ম্ম লাভেও অনধিকারী হন। অতএব যখন সৎকর্ম্ম সাধন করিবার নিমিত্তেই মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং অগ্রে মন সৎ না হইলে প্রকৃত সৎকর্ম্ম পরায়ণ হওয়া যায় না, তখন সর্ব্বাগ্রে মনকে পরিশুদ্ধ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বৎসে্য হেমাঙ্গিনি! তুমি সর্ব্বক্ষণ সাধু লোকদিগের সহিত সহবাস করিও নিয়ত সৎগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন এবং সদুপদেশ অনুসারে কার্য্য করিও। তাহা হইলে, তোমার মন ও অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইবে এবং সৎকর্ম্মশীলা হইয়া আপনার ও অন্যের

মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। যাবজ্জীবন সৎকর্ম্মরূপ ব্রত পরায়ণা হইয়া তৎপালনে অহর্নিশি যত্নবতী হইবে, স্বর্ণ ভূষণ অপেক্ষা সরলতা ও নম্রতাকে অমূল্য ভূষণ বোধ করিবে, সকলকে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। যেমন আহার বিহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করিবে, তেমনি জ্ঞানালোচনা দ্বারা মনের উন্নতি সাধন করিবে; যেমন অনাথ দরিদ্রদিগের কুটীরে গিয়া সাধ্যানুসারে তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিতে যত্নবতী হইবে, তেমনি গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে; যেমন রোগ শোকার্ত্ত ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধান করিবে, সেই রূপ অসৎ কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া সৎপথে আনয়ন করিবে। এই প্রকার সৎকর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিয়া জীবন যাপন করিবে।

সৎকর্ম্ম সকল সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর কেমন এক নির্ম্মল আনন্দ স্বরূপ আত্মপ্রসাদ প্রদান করিয়াছেন? যিনি নিয়ত সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তিনি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হন। সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তির হৃদয়রূপ আকাশে শরৎকালীন বিমল চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল আনন্দ জ্যোতিঃ অহরহ প্রকাশিত হয়। সৎপথাশ্রয়ী ব্যক্তি শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করেন, অসৎপথাশ্রয়ী ব্যক্তি অট্টা-

লিকোপরি বিবিধ সুখসেব্য দ্রব্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সেরূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির সহিত কি অসদাচারী দুঃশীল ব্যক্তির তুলনা হইতে পারে? সদাচারী সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি পর্ণশালায় বাস করিয়া সামান্য আচ্ছাদন পরিধান করিয়া যেরূপ মনোহর বেশ ধারণ করেন, তাহার নিকট অসতের সর্ব্বপ্রকার শোভা, সৌন্দর্য্যবিহীন ও মলিন বোধ হয়।

স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর সম্বন্ধ।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার জন্য পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই এই প্রভেদ দেখা যায়। ইহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য ও সুখবৃদ্ধি করিতেছে এবং নূতন জীব সকল উৎপাদন করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধন করিতেছে। কেবল পুরুষ থাকিলে অথবা কেবল স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইলে এ পৃথিবীর এ প্রকার শোভা থাকিত না এবং তাহা হইলে জীবদিগের বংশ এককালে ধ্বংস হইয়া যাইত। মানব জাতির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী থাকাতেই লোকে পরিবার ও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সংসারধর্ম্ম পালন করে। ইহার

মধ্যে একের অভাব হইলে সংসার অরণ্য তুল্য হইত। এক জাতির মধ্যে এই দুই প্রকারের জীব রচনা করিয়া জগদীশ্বর কি অদ্ভুত কৌশল কি মঙ্গল নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন।

মনুষ্যদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যেমন সম্বন্ধ এমন আর কোন জীবের মধ্যে নাই। কিন্তু এখানে স্ত্রীলোকদিগের যেমন দুরবস্থা এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। অনেক পুরুষ এবং অনেক জাতীয় লোক, স্ত্রীলোকদিগকে মনুষ্য জাতির মধ্যে গণনা করিতে চাহে না। পশুপক্ষী ইতর জাতির ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও এক স্বতন্ত্র ইতর জাতি বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ বা ইহাদিগকে স্বভাবতঃ পাপপূর্ণ, সকল দুষ্কর্ম্মের মূল এই রূপ অতি জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করেন। আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে কি আজিও স্ত্রীদিগের প্রতি পশু বা ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার হয় না? পারসী কাব্যসকল পাঠ করিলে কি স্ত্রীলোকদিগের নাম করিতেও মনে ত্রাস ও ঘৃণার উদ্রেক হয় না?

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি দোষারোপ ও তাঁহার বিরোধী কার্য্য করা হয়।

তিনি কি পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে অমৃত আত্মায় ভূষিত করেন নাই? তিনি কি তাঁহাদিগকে

জ্ঞান ও ধর্ম্মে অধিকারী করেন নাই? তাঁহাদের আত্মার কি ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া ঈশ্বর ও মুক্তি লাভ হইবেক না? বস্তুতঃ এই মূল বিষয়ে আমরা নর ও নারী উভয়কেই সমান দেখিতেছি। কত স্ত্রীলোক বিদ্যায় পুরুষদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, কত মহিলা ধর্ম্মগুণে পুরুষদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। অতএব ইহারা আকারে প্রভেদ বলিয়া কখন নীচ জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

যাহা হউক পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের কিছু বিশেষ আছে কি না, অদ্য আমরা সেই বিষয় আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি মূল বিষয়ে ইহারা এক, তবে আকার প্রকারে ভিন্ন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি একদিকে পুরুষদিগকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় অন্যদিকে স্ত্রীলোকদিগেরও শ্রেষ্ঠতা আছে। বল, দৃঢ়তা, সাহস, গাম্ভীর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা এসকল বিষয়ে পুরুষের প্রাধান্য দেখা যায়, আবার রূপ, কোমলতা, নম্রতা, প্রীতি, সরলতা, শোভানুভাবকতা ও বিশ্বাস এসকল বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের শ্রেষ্ঠতা মানিতে হয়। আমরা কোন বিশেষ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের লক্ষ্য বলিতেছি না, কিন্তু সমুদায় পুরুষ জাতির ও সমুদায় স্ত্রীজাতির সাধারণ গুণ এই।

যখন প্রায় সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে স্ত্রী ও

পুরুষের এই প্রকার ইতর বিশেষ দেখা যায় তখন ইহাদের পরস্পরের সাহায্যে যে পরস্পরের সুখ ও উন্নতি তাহার সন্দেহ নাই। সমুদায় কঠিন গুণে মনুষ্য সুসজ্জিত, সমুদায় কোমল ভাবে বামাগণ ভূষিত। ইহাদের পরস্পরকে বৃক্ষ ও লতার ন্যায় তুলনা করা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কায় বৃক্ষের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরা তাহার শোভা পুষ্পিত লতা স্বরূপ। যখন লতা বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া থাকে তখনই সে সরল হইয়া উঠিতে পারে এবং মনোহর কুসুম ধারণ করিয়া দিক্ সকল উজ্জ্বল করে, বৃক্ষলতার সহযোগে পরম মনোহর হয়। অতএব স্ত্রীলোকগণ পুরুষগণকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের সাহায্যে কোমল ভাবে মনের সুখ ও আত্মার শোভা বর্দ্ধন করিবে। পুরুষদিগের সাহসে নির্ভর করিয়া স্ত্রীলোকেরা কেমন স্বচ্ছন্দে বাস করে! আবার স্ত্রীলোকদের কোমল স্বর শ্রবণ ও মধুর ভাব দর্শন করিয়া পুরুষদিগের সমুদায় শ্রান্তি কেমন দূর হয়।

পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রের শাসন ও উপদেশে স্ত্রীলোকদিগের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। আবার মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা ও কন্যার ভিন্ন২ প্রীতি ভাবে সংসার কি রমণীয় ও সুখকর বেশ ধারণ করে।

কুসংসর্গ।

বাল্যকালে যাহারা যে রূপ সংসর্গে থাকে তাহারা সেইরূপ চরিত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে সকল বালক বা বালিকা অসৎসঙ্গেথাকে তাহারা অসৎ হয় আর যাহারা সৎ সংসর্গে থাকে তাহারা সৎ হয়। অতএব যাহাদের সৎ হইবার ইচ্ছা আছে তাহাদের সকলেরই সৎসঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য। নতুবা অনেক কষ্ট পাইতে হইবে।

অসৎ সঙ্গের অশেষ দোষ। যেমন এক কলসী দুগ্ধে একটু দধি বা অন্য কোন মন্দ দ্রব্য প্রদান করিলে সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ কোন সংসর্গে একজন মাত্র অসৎলোক থাকিলেও সকলের চরিত্র মন্দ হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য সকলেরই প্রথম হইতে কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহারা সর্ব্বদা অসৎ সঙ্গে থাকে (কিন্তু বাস্তবিক নিজে তাহারা অসৎ নহে) লোকে তাহাদিগকে অসৎ মনে করে। যদিও তাহাতে তত দোষ নাই, কিন্তু অসৎ সঙ্গে থাকিলে প্রায় সকলেরই চরিত্র দূষিত হইতে পারে। অসৎসঙ্গে থাকিলে যে চরিত্র মন্দ হয় তাহার কারণ এই—

১ম। অভ্যাস।—যদি কোন, স্বাভাবিক সচ্চরিত্র ব্যক্তি অসৎ সঙ্গে থাকে তাহারও চরিত্র দূষিত হয়। মনে কর কোন ব্যক্তির শৈশব কালে সুরাপানে অত্যন্ত

ষেব ছিল কিন্তু সে যদ্যপি মদ্যপায়ীদিগের সংস্রবে থাকে তবে তাহারও অভ্যাস বশতঃ সুরাপানে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। স্বভাবসকলের চেয়ে প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা তাহারও অন্যথা দেখা যায়। মনুষ্যের মনে এক প্রকার স্বাধীন ভাব আছে, তাহা দ্বারা মনুষ্য সৎ অসৎ দুই পথেই যাইতে পারেন। স্বাধীন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইতর জন্তুদিগকে যদি অভ্যাস করান যায় তাহা হইলে তাহাদিগকেও আপন আপন সংস্কারের বিপরীত কাজ করিতে দেখা যায়। কত কত কুকুর, বিড়াল, সিংহ ও ব্যাঘ্রকে আপনার হিংস্রস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখা ও শুনা গিয়াছে।

চরিত্র মন্দ হইবার কারণ যেমন কুসংসর্গ এমন আর দ্বিতীয় নাই। কত কত নীতিজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি কুসংসর্গের অনেক নিন্দা করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকানেক সুশিক্ষক অসৎসঙ্গকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ভূরি-ভূরি উপদেশ দিয়াছেন। আপন আপন সন্তানকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করিতে যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদিগের প্রথম হইতে সন্তানগণকে সৎসঙ্গে থাকিতে এবং অসৎ সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এতদ্দেশের অনেক অশিক্ষিত লোকে সন্তানের

সৎসংসর্গ বিষয়ে তাদৃশ দৃষ্টি রাখেন না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের এ বিষয়ে কিছু মাত্র যত্ন বা মনোযোগ দেখা যায় না। কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে মাতা স্বয়ং গল্প ও খেলা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট এবং মিথ্যা কথন, প্রতারণা, হিংসা, কলহ প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিয়া কন্যা ও পুত্রগণের আদর্শ স্বরূপ হন এবং মাতৃসঙ্গই তখন তাহাদের অসৎ সঙ্গের ন্যায় হয়।

অসৎ সঙ্গে থাকিলে মন্দ হইবার আর একটী প্রধান কারণ অনুচিকীর্ষা। যে যেমন সংসর্গে থাকে সে সে-ইরূপ দোষ গুণ সকল গ্রহণ করে। বিশেষতঃ সন্তানেরা শৈশব সময়ে পিতা মাতাকে যেরূপ কাজ করিতে দেখে সেইরূপ করিতে শিক্ষা করে, সুতরাং সন্তানগণ যদি মাতাকেই কড়ি খেলিতে, মিথ্যাকথা কহিতে এবং গল্প ও কলহ করিয়া সময় নষ্ট করিতে দেখে তাহা হইলে তাহারাও সেইরূপ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই-রূপে গৃহে মাতাই সন্তানগণের মন্দ আদর্শ হইয়া তা-হাদের অসৎ চরিত্রের কারণ হন।

এদিকে আবার বাহিরে সন্তানেরা সহচর দিগের সহিত কিরূপ ক্রীড়া কৌতুক করে, ও শিক্ষকদিগের কাছে কিরূপ উপদেশ ও শিক্ষা পায় তাহার তত্ত্ব লয়েন না। অনেকে আপন সন্তানকে গুরু মহাশয়ের

পাঠশালায় দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, সেখানে সন্তান কিরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার অনুসন্ধান করেন না। তথায় বালকের গুরু মহাশয়ের অসৎ উপদেশ এবং পাঠশালায় মন্দ বালকদিগের সংসর্গ দোষে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইয়া আপন আপন পিতা মাতাকে তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতিফল দেয়। এইরূপ কুসংসর্গ দ্বারা কত কত বালক অসৎ হইয়াছে এবং পিতা মাতার শোকানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অতএব সকলেরই স্ব স্ব সন্তানগণের সংসর্গ ও চরিত্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।

(সরলতা)

আমরা আবশ্যক মতে আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিব, এজন্য ঈশ্বর আমাদিগকে বাক্‌-শক্তি এবং ভাব প্রকাশের অন্যান্য উপায় দিয়াছেন। তাহা একারণে নহে যে আমরা মিথ্যা কহিয়া বা মনের যথার্থ ভাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া কাহারও অপকার বা আপনার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি সাধন করিব। অতএব মনের যা যথার্থ ভাব, তাহার ব্যতিক্রম প্রকাশ করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করা

হয়। যাহার কথা ও মনের ভাব, বিশ্বাস ও আচরণ একই, তাহাকে সরল কহে। সরল ব্যক্তি সকলেরই প্রশংসনীয়, কারণ সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছে। আরও সরল ব্যক্তি সকলের প্রিয় হয় ও সর্ব্বদা মনের সুখে থাকে। তুমি সর্ব্বদা সরল থাকিবে। সরলতা-হীন কখন হইও না।

যাহার মনে এক প্রকার কথায় আর এক প্রকার ভাব, যাহার বিশ্বাস এক রূপ, আচরণ অন্যরূপ, তাহাকে কপট বা ভণ্ড কহে। কপটতা ঈশ্বর ও লোক উভয়ের নিকটেই ঘৃণিত। কেহ কেহ অন্তরে পাপে পূর্ণ হইয়া বাহিরে সাতিশয় ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে; তাহারা স্পষ্ট পাপী অপেক্ষা অধম। ঈশ্বর অন্তর দেখিয়া বিচার করেন। অতএব তুমি কখন কপটাচারী হইও না, মনে পাপ পূর্ণ কিন্তু বাহিরে বিলক্ষণ ধার্ম্মিক দেখাইবে না। ঈশ্বর তোমার মন দেখিয়া শাস্তি দিবেন বরং কপটতার জন্য অধিকতর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভ্যাস, ভয়, লোভ এবং অহঙ্কারাদি কুপ্রবৃত্তির বশ হইয়া লোকে কপটাচারী হয়। কিন্তু কপটতা মাত্রই জঘন্য ও পরিত্যজ্য। মনে করিও না যে কোন কোন সময়ে তোমার কপটতা না হইলে চলে না। ঈশ্বর মনুষ্যকে এমত ক্ষমতা দিয়াছেন যে, সে আপনার ভাব

হয় যথার্থরূপ প্রকাশ করিবে, নয় একেবারে স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু কপট ব্যবহার স্বভাববিরুদ্ধ।

যাহারা হিংসা বা কোন দুরভিসন্ধি সাধনার্থ কপটাচারী হয়, তাহাদিগকে খল কহে। খলেরা সর্পের ন্যায় দেখিতে সুন্দর, কিন্তু অন্তরে বিষময়। তুমিত নিজে খল হইবে না ও খলের সহিত সহবাসও করিবে না। বরং অন্যকে সাবধান করিয়া দিবে যেন খলের সহিত সহবাস না করে। স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা খল বন্ধু শত গুণে ভয়ানক।

অত্যন্ত পাপী হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি সরল হয়, সে অতি শীঘ্রই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কারণ সরল না হইলে কোন উপদেশ কার্য্যকারক হয় না; অতএব সর্ব্বাগ্রে সরল হইতে শিখ। সরলতা কিছু বহু কষ্টসাধ্য নহে; বরং কপটতা অনেক চাতুরীর কর্ম্ম। যাহা যথার্থ মনের ভাব, তাহা সহজেই প্রকাশ পাইবে তজ্জন্য আর আয়াস করিতে হয় না। বাল্যকাল হইতে সরল হও, নতুবা মহা অনিষ্ট হইবে। তুমি যদি সরল হইতে পার তাহা হইলে সহজেই অন্যান্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিবে; নচেৎ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। সরলতা দুই প্রকার, সত্যকথন ও সত্য ব্যবহার।

১। সত্য কথন—সত্য কথা কহা যে লোকমাত্রেরই

উচিত তাহা বলা বাহুল্য। তুমি কখনই মিথ্যা কহিও না। এমন কি উপহাস ছলেও মিথ্যা কহিবে না। কারণ তাহা হইলে কুঅভ্যাস জন্মিবে যদি সকলেই তোমাকে ভর্ৎসনা করে, ভয় দেখায়, তথাপি সত্য কথা কহিতে ক্ষান্ত হইবে না। তুমি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সত্যবাদী হইবে; ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। তা বলিয়া নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোন অপ্রিয় সত্য কহিয়া কাহারও মনে মিছামিছি কষ্ট দিবে না। মিষ্ট কথা কহিবে, সত্য কথা কহিবে। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অপ্রিয় সত্য বাক্য কহিবে না। কিন্তু মিথ্যা সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। যদি একটী মিথ্যা কহিলে কোন এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয় বা আপনার প্রাণরক্ষা হয় তাহাও কহিবে না। যদি কোন একটী সত্য কহিতে গেলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এমন কি আপনার প্রাণ সংশয় হয়, তথাপি প্রয়োজন হইলে সত্য কহিতে ক্ষান্ত থাকিবে না।

যদি কোন দোষ কর, তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিবে। যাহা কিছু করিবে বলিয়াছ, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা অবশ্যই পালন করিবে। প্রতিজ্ঞা অবহেলা করা পাপ। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন না করে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না। তুমি এরূপ সত্য কহিতে অভ্যাস রাখিবে; যেন লোকে তোমার কথাকে

কখন মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ না করিতে পারে। অতএব প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া বিবেচনা করিবে। শীঘ্র প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিও না; পালন করিতে পারিবে কি না আগে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে। যাহা নিশ্চয় জান না এমন কথা কহিতে গেলে "বোধ হয়" এইরূপ কথা ব্যবহার করিবে, যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে যে তুমি তাহা নিশ্চয় জান না।

শুদ্ধ বাক্যদ্বারাই যে মনের ভাব প্রকাশ হয় এমত নহে, আকার ইঙ্গিত দ্বারাও হইয়া থাকে। অতএব বাক্যদ্বারা যেরূপ মিথ্যা ভাব প্রকাশ হয়, ভাব ভঙ্গিতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যথা, যদি তুমি একটী দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেল, আর যাহার জিনিস সে তোমাকে সন্দেহ না করিয়া কহে, যে 'তুমি কখন এমন কর্ম্ম কর নাই, সে সময় তুমি যদি চুপ করিয়া থাক তাহা হইলে এই বুঝা যাইবে যে, তুমি যেন বলিতেছ যে তুমি নষ্ট কর নাই। তুমি মনে করিয়া রাখিতে পার যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে সত্য কহিবে, সুতরাং কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই বলিয়া তুমি নিস্তব্ধ রহিয়াছ তাহাতে পাপ কি? কিন্তু বাস্তবিক সে স্থলে তোমার মিথ্যা কথা কহা হইল সুতরাং কথা দ্বারাই হউক, বা ভাব ভঙ্গি দ্বারাই হউক, অন্য লোকে যেন তোমার নিকট হইতে অযথার্থ বিশ্বাস না পায়। তুমি

স্পষ্ট বল বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশ কর, লোকে তোমার নিকট সত্য জানিতে না পারিলে অনেক সময় তোমারই দোষ বলিতে হইবেক। অতএব স্পষ্ট করিয়া হউক বা অস্পষ্ট করিয়া হউক কথন মিথ্যা আচরণ করিও না।

২। সত্য ব্যবহার—তোমার মনের বিশ্বাস যেরূপ সেইরূপ কার্য্য করিবে। লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত বা লোক ভয়ে স্বীয় দৃঢ় প্রত্যয় অনুসারে কার্য্য না করা কপটতা মাত্র। তুমি যাহা সত্য বলিয়া জান, তুমি যাহা বিশ্বাস কর, লোকের কথায় তাহা লুকাইয়া রাখিও না। সরলতা ধর্ম্মের প্রথম কার্য্য। কথন ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের কাছে ভাণ করিবে না। আপনি যেরূপ, সকলের নিকটই সেইরূপ দেখাইবে। যাহাকে যেরূপ ভালবাস তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে; যাহাকে যথার্থ সম্মান না কর বা ভাল না বাস, তাহার নিকট বলিয়া বেড়াইও না যে "আমি তোমার কথা শুনিয়া থাকি, তোমাকে ভাল বাসি।" ইহা বলিয়া আবার বাড়াবাড়ি করিও না, কাহাকেও বিরক্ত করিও না। সকল লোকের সহিত শিষ্টাচার করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তিকে তুমি যথার্থ ভক্তি না কর; তাহার প্রতি কপট ভক্তি প্রকাশ করিও না। কিন্তু যাঁহারা গুরুলোক, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি না

থাকা পাপ। অতএব যদি কোন গুরুলোকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তুমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে যাহাতে ভক্তি হয়।

সরল ব্যবহার বন্ধুতার মূল। সরলতা না থাকিলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার, যশ পাইতে পার, কিন্তু বন্ধুতা লাভ করিতে পার না। মনের বন্ধু মনের ভাব চায়, কেবল মুখের নহে। অতএব বন্ধু নিকট কখনই কপটতা করিও না। যদি তাহার উপর তোমার কোন বিরাগ জন্মিয়া থাকে স্পষ্ট বলিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিবে। বন্ধুও সরলভাবে ভৎসনা করিলে বিরক্ত হইও না। সরল ব্যবহার করিতে গেলে অনেক সময়ে ভাল লাগিবে না বটে, কিন্তু তাহা না হইলে বন্ধুতা থাকে না। মাতা যেরূপ সন্তানের নিকট কপট স্নেহ প্রকাশ করেন না, কার্য্যে স্নেহ দেখান; সেইরূপ তুমি বন্ধুর নিকট মুখে কপট ভালবাসা দেখাইবে না; যথার্থ ভাল বাসিবার কার্য্য করিবে। বস্তুতঃ যেমন আপনার মনের ভাব, ঠিক সেইরূপটী অন্যের নিকট কি কথায় কি কার্য্যে প্রকাশ করিবে। উচিত বোধ হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পার কিন্তু বিপরীত প্রকাশ কখনই করিবে না। এইরূপ আচরণ করিলে তুমি সরল হইবে।

ঈশ্বরের নিকটও কেহই কপটতা দ্বারা মনের ভাব

গোপন করিতে পারে না, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তথাপি পাপিলোকে তাঁহার নিকট সরল হয় না। তুমি পাপ করিলে তাঁর নিকট গোপন করিতে যাইও না। তাহা স্বীকার করিবে। যেমন সাধু লোকের নিকট কাতর হইয়া দোষ স্বীকার করিলে ক্ষমা করেন, সেইরূপ দুঃখের সহিত পাপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরও পাপীকে ক্ষমা করেন। তুমি যদি কৃতপাপের জন্য সমুচিত দুঃখ প্রকাশ করিয়া আর সেরূপ পাপ করিবে না প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে সে পাপ হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু শুদ্ধ মুখেতেই কিছু হইবেক না; সরল হইয়া দুঃখ ও প্রতিজ্ঞা করা চাই ও সর্ব্বদা সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে যত্নশীল হইতে হইবেক। অতএব প্রতি সন্ধ্যাকালে সমস্ত দিনে যে যে পাপ করিয়াছ তাহা একে একে মনে করিয়া সেই পাপের উপর যাহাতে ঘৃণা পড়ে, তাহার জন্য যাহাতে দুঃখ হয়, এরূপ করিবে; এবং ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে যেন আর সেরূপ না হয়। যখন হঠাৎ কোন পাপ করিয়া ফেলিবে তখনি ‘কেন করিলাম’ বলিয়া ক্ষোভ করিবে; এবং আর না হয় এমন প্রতিজ্ঞা করিবে; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে যে তিনি তোমাকে ক্ষমা করেন ও প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বল দেন।

দ্বিতীয় উপদেশ।

(কৃতজ্ঞতা।)

যিনি কাহারও উপকার করেন তাঁহাকে উপকারী কহে; এবং যিনি উপকার প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে উপকৃত ব্যক্তি কহে। উপকারীর প্রতি উপকৃত ব্যক্তির যে সদ্ভাব, তাহাই কৃতজ্ঞতা। সাধু লোক কিছু মাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলেই আপনাকে উপকারীর প্রতি চির বাধিত মনে করেন, এবং সর্ব্বদা চেষ্টা করেন যাহাতে তাঁহার ভাল হয়। তিনি সুযোগ পাইলেই উপকারীর প্রতি উপকার করিতে ত্রুটি করেন না। এই রূপ উপকারীর প্রতি উপকার করাকে প্রত্যুপকার কহে।

প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতার এক প্রধান চিহ্ন। মাতা যে-রূপ স্বয়ং সন্তানের কোন সুখ সাধন করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন, কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও তদ্রূপ নিজে প্রত্যুপকার করিতে পারিলে সাতিশয় সুখী হয়েন। কিন্তু মাতৃস্নেহ যেরূপ যে কোন প্রকারেই হউক সন্তানকে সুখী দেখিলেই চরিতার্থ হয়, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপকারীর লাভ হওয়া দেখিলে কৃতজ্ঞতা সেরূপ চরিতার্থ হয় না। এজন্য কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা সুযোগ দেখেন কিসে প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম হন।

অতএব যদি কৃতজ্ঞ হইতে চাহ সতত প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু তা বলিয়া মনে করিও না প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতার এক মাত্র কার্য্য—প্রত্যুপকার করিতে না পারিলে কৃতজ্ঞ হওয়া হয় না। এমন অনেক স্থল আছে যেখানে হাজার চেষ্টা করিলেও প্রত্যুপকার করা যায় না; এবং অনেক লোক আছে যাহাদের উপকার করা নিতান্ত দুষ্কর। সচরাচর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপকার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না, এবং দরিদ্র লোকদিগের প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা অনেক স্থলে থাকে না। তবে কি নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের প্রতি, দরিদ্র ধনীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারে না? না প্রজা রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে না? কথনই নহে। উপকারী ব্যক্তিকে মান্য করা, তাঁহার কথার বশী হওয়া এবং যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা কৃতজ্ঞতার কার্য্য। ঈশ্বর তোমার অশেষ উপকারী সুতরাং অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু তাঁহার কোন অভাব নাই যে তুমি পূরণ করিয়া প্রত্যুপকার কর, তবে কি তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পার না? তাঁহার আজ্ঞা পালন করা তাঁহাকে সর্ব্বসুখদাতা বলিয়া বিনীত ভাবে নমস্কার করাই কৃতজ্ঞতার কার্য্য।

কৃতজ্ঞতা কাহাকে কহে ও ইহার কার্য্য কি তাহা

শুনিলে। কিন্তু ইহা সুদ্ধ শুনিবার কথা নয়, ইহা ভাবে পরিণত করিতে হয়। যেরূপ উপদেশ পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি পশু তুল্য; মনুষ্য মাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনই অকৃজ্ঞ হইও না। যিনি তোমার কিছুমাত্র উপকার করিবেন তুমি তাঁহার ভাল করিতে সর্ব্বদা চেস্টা করিবে, এবং তাঁহাকে মান্য করিবে। একটুকু উপকার পাইলে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, কারণ উপকার যত অল্প হউক না কেন উপকারী সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতার পাত্র। যে ব্যক্তি তোমাকে ভাল বাসিয়া, তোমার ভাল চেষ্টা করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন তাঁহাকে তুমি পরম বন্ধু বলিয়া মান্য করিবে; তাঁহার প্রতি বাধিত থাকিবে। যাহাতে উপকারী ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকেন এমন কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে। উপকার পাইবা মাত্র 'নমস্কার,' বা অন্য কোন বাক্য বা ভাব ভঙ্গি দ্বারা আপনাকে বাধিত জানাইবে।

কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা সততই উপকার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়; যথা পিতা মাতা, গুরু ও ঈশ্বর।

তুমি জন্মাবধি যাঁহাদের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছ, ক্ষুধার সময় অন্ন, নিদ্রার সময় শয্যা ও ইচ্ছা-

মুষারিক বস্ত্রালঙ্কার পাইয়াছ, যাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার ভাল চেষ্টা করিতেছেন, এমন যে পিতা মাতা তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিবে। রোগের সময় কে তোমাকে ঔষধ দিয়া তাহার শান্তি করিয়াছেন? নিতান্ত শিশু কালে, সেই অসহায় অবস্থাতে, কে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন? পিতা মাতা। এমন পিতা মাতার সহিত বিবাদ করা, তাঁহাদিগকে ভাল না বাসা, তাঁহাদের ভাল করিতে চেষ্টা না করা, ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা। এখন যদি তাঁহারা তোমার নিকট সহস্র দোষ করেন, তথাপি তুমি তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞই হইও না। শত বৎসরেও পিতামাতার ধার শোধা যায় না। কাহার যত্নে তুমি পৃথিবীতে রহিয়াছ, নানা সুখ প্রদ এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ, বন্ধু বান্ধব ভাই ভগ্নী স্বামী ও ঐশ্বর্য্য যাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছ? পিতা মাতা শৈশব কালে তাদৃশ যত্ন না করিলে তুমি কোন সুখেরই অধিকারিণী হইতে পারিতে না। অতএব তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ হইবে। তাঁহাদিগকে কখনই কটু কথা কহিবে না ও তাঁহাদের প্রতি কদাচ কর্কশ ব্যবহার করিবে না। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে, ভাল বাসিবে। যাহাতে তাঁহাদের ভাল হয়, যাহাতে তাঁহারা সুখী হন এরূপ কার্য্য করিবে। তাঁহাদের যাবৎ অভাব

যোজন করিবে; এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবে।

যেমন শরীর রক্ষাকারী পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে, তেমনি আবার যিনি মনকে ভাল করেন তাঁহা-কেও মান্য করিবে। যিনি তোমাকে বিদ্যা শিক্ষা দেন, যিনি ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। পিতামাতা তোমার শরীরের ভাল করেন, যাহাতে তুমি এই সংসারে সুখী থাক এমন করেন। গুরু তোমার মনের ভাল করেন, যাহাতে তুমি জ্ঞানবতী হইয়া ঈশ্বরকে জানিতে পার ও তাঁহাকে জানিয়া ইহ-কাল ও পরকালে সুখী থাক। উভয়ই অশেষ উপকারী। অতএব গুরুকে ভক্তি করিবে; তাঁহার কথার বশ থাকি-বে, তাঁহার উপকার করিতে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নশীলা থাকিবে। পিতা মাতা ও গুরু উভয়ই কৃতজ্ঞ-তার পাত্র। সচরাচর পিতা মাতা বালকদিগের গুরু হয়েন। জ্ঞানী পিতা মাতা সন্তানের শরীর, মন, ঐহিক, পারত্রিক উভয়েরই প্রতি সমান যত্ন লন। এরূপ পিতা মাতা অশেষ ভক্তিভাজন। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দ্বিগুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরমেশ্বরের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হইবে। তাঁহার প্রসাদে শরীর, মন, জীবন ও তাবৎ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছ। তিনিই পিতা মাতার মনে স্নেহ

দিয়াছেন; তাঁহারই নিয়মানুসারে পিতা মাতা এরূপ আশ্চর্য্য যত্নের সহিত সন্তানকে লালন পালন করিতেছেন। তিনি যদি মাতার মনে স্নেহ না দিতেন মাতা কখনই তোমাকে তাদৃশ যত্নে লালন পালন করিতেন না। দেখ, পরমেশ্বর লোকের হিতের জন্য সর্পকে অপত্য স্নেহ দেন নাই, সুতরাং প্রসব করিয়াই সর্পমাতা স্বীয় সন্তানগণকে ভক্ষণ করে। তদ্রূপ যদি তিনি পিতাকে স্নেহ না দিতেন পিতাও তোমাকে এরূপ যত্নে রক্ষা করিতেন না। দেখ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু সুযোগ পাইলেই স্বীয় স্বীয় শাবকদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে অপত্য স্নেহে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি যদি একবার তোমাকে ভুলেন তুমি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যাও। কে গুরুর দ্বারা তোমাকে জ্ঞানবতী করিতেছেন? গুরুর সাধ্য কি তোমাকে উপদেশ দেন যদি পরমেশ্বর তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতা এবং সাধু ইচ্ছা না দিতেন। ঈশ্বরই যথার্থ গুরু, গুরু তাঁহার উপলক্ষ্য, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস মাত্র। তিনি পিতা মাতার পিতা মাতা, গুরুর গুর। যদি পিতা মাতার কথা অবহেলা করা পাপ, তবে পরম পিতার অবাধ্য হওয়া কি ভয়ানক পাপ। যদি গুরুকে ভক্তি করা উচিত, তবে পরম গুরুকে ভক্তি করা কত অধিক উচিত। পরমেশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করিবে।

আগে উাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে তবে পিতা মাতা ও গুরুর আজ্ঞা শুনিবে। তিনি নিষেধ করিলে কোন কার্য্য করিবে না; তিনি আজ্ঞা করিলে বাপমার কথায় তাহা কদাপি অন্যথা করিবে না। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া হইল।

তুমি যখন নিদ্রা যাও ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেন, তোমার শরীর ও মনকে সুস্থ করেন। অতএব প্রাতঃকালে উঠিয়াই অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিবে। নূতন দিবসের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন বল পাইলে; অদ্যাবধি জীবন ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার নব দিবসের সুখ ভোগ করিতে চলিলে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিবে। আবার সমস্ত দিনে তুমি যত সুখ পাইয়াছ, ক্ষুধার সময় অন্ন, শ্রান্তির সময় বিশ্রাম;—সমস্ত দিনে যাহা কিছু সৎকার্য্য করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য প্রতি সন্ধ্যাকালে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিবে ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

তৃতীয় উপদেশ।

(দয়া-স্নেহ।)

বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি দয়া করিতে হয় বটে, কিন্তু কাহারও প্রতি নির্দ্দয় হওয়া উচিত নহে। কি ইতর প্রাণী, কি মনুষ্য, নিষ্ঠুরতা কাহারও পক্ষে বিধি নহে। অনর্থক কোন জীবকে যাতনা দেওয়া নিষ্ঠুরতা। যাহারা পরকে কষ্ট দিয়া আপনাদিগকে কেবল তাহাতেই চরিতার্থ মনে করে তাহারা নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুরতা সকলের নিকটই ঘৃণিত। কেহ কেহ মনে করেন যে মনুষ্যের উপর নিষ্ঠুরতাচরণ করা পাপ; কিন্তু ইতর জন্তুর (পশু পক্ষী কীটের) উপর নিষ্ঠুরতাচরণ করিলে দোষ নাই। যদিও অচেতন ও উদ্ভিদের উপর নিষ্ঠুরতা হয় না কারণ তাহাদের বোধ নাই, তাহারা কষ্ট বোধ করিতে পারে না, কিন্তু কি অতি ক্ষুদ্র কীট, কি বৃহদাকার পশু যাহাদের প্রাণ আছে, যাহারা কষ্ট বোধ করিতে পারে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিলেই নিষ্ঠুরতা হয়। সদুপদেশহীন বালকেরা প্রায় কীট পতঙ্গাদি ও পশু পক্ষীর উপর নির্দ্দয় হয়। পিপীলিকাকে কষ্ট দিয়া অনেক শিশু আমোদ করে কেহ চড়ুই ধরিয়া, কেহ বেঙ মারিয়া অথবা মাছ ধরিয়া আমোদ করে। শৈশব কালে

এই রূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়া নির্দ্দয় হইয়া উঠে; ক্রমে মনুষ্যের উপরও অত্যাচার করিতে শিখে।

কেহ কেহ মনে করেন যে দোষী ও পাপী লোককে ইচ্ছামত যাতনা দেওয়ায় কোন পাপ নাই; এবং তদনুসারে চৌর দেখিলেই যাহার যত ইচ্ছা সে তত প্রহার করে। মাতালকে মারিতে কেহই নিষেধ করে না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে সুদ্ধ যাতনা দেওয়া, অথবা সেই যাতনা দেখিয়া আপনাকে সুখী বোধ করা নৃশংসের কার্য্য। আত্মরক্ষা ও শাস্তি হেতু লোককে কষ্ট দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা আর এক প্রকার। কেহ কেহ পাগল লইয়া খেলা করে, তাহাকে কষ্ট দিয়া তামাসা দেখে; কিন্তু যেমন অবলা পশুকে যাতনা দেওয়া পাপ, সেই রূপ অজ্ঞান পাগলকেও কষ্ট দেওয়া নিষ্ঠুরতা। তুমি কখনই নিষ্ঠুর হইও না। কি কীট পতঙ্গ, কি পশু পক্ষী, কি দোষী ব্যক্তি, বস্তুতঃ জীব মাত্রেরই উপর কখন অত্যাচার করিও না।

খাইবার জন্য মৎস্য ও পশু মারা দোষ কি না তাহা নিশ্চয় হয় নাই। কিন্তু তো বলিয়া হাতের সুখের জন্য ছিপে মাছ ধরা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কাজ। টীপ পরিবার জন্য টীপ-পোকার ডানা কাটিয়া লওয়া পাপ; কারণ মিছা মিছি টীপ পরিবার জন্য একটী

জীবকে নষ্টকরা কোন মতেই উচিত নয়। সুদ্ধ প্রাণ-হত্যা ও প্রহার করাই যে নিষ্ঠুরতা এমন নহে। কোন জীবের খাওয়ার কষ্ট দেওয়া, বস্তুতঃ তাহাদের সুখের হানি করা নিষ্ঠুরতা। মনুষ্যের উপর আরও অনেক প্রকার নিষ্ঠুরতা আছে। যেমন মনুষ্যের শরীরকে কষ্ট দেওয়া পাপ; তেমনি আবার তাহার মনকে কষ্ট দেওয়া পাপ। অনেক সময় মনের কষ্ট অত্যন্ত অসহ্য। অপমান, পরিহাস ও নিন্দায় লোকের মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অতএব সাবধান এরূপ কাজ করিও না। কটু কথা কহিলে লোকের মনে ক্ষোভ হয়; অতএব লোককে মিষ্ট কথা ভিন্ন আর কিছু কহিবে না। যদি নিতান্ত প্রয়োজন না হয়, যদি কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে কখনই এমন কার্য্য করিও না যাহাতে কাহারও মনোদুঃখ হয়। সংক্ষেপে এই উপদেশ যে অকারণে কাহাকেও কষ্ট দিও না।

নিকৃষ্ট লোকের মধ্যে কতকগুলির অভাব পূরণ করিতে হয় ও কতকগুলিকে সুদ্ধ স্নেহ করিতে হয়। পিতা মাতা বর্ত্তমান এমন শিশুর অভাব পূরণ করিতে হয় না বটে; কিন্তু তাহাদিগকে আদর করিতে হয়। যাহাতে তাহারা প্রফুল্ল থাকে এমন করিবে। দাস দাসীগণের বিশেষ কোন অভাব পূরণ করিতে হয় না বটে; কিন্তু সর্ব্বদাই তাহাদিগকে স্নেহ করিবে; কখন

তাহাদিগকে কষ্ট দিবে না; অনর্থক তাহাদের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে না। কতকগুলি লোক আছে যাহাদের কিছুই করিতে হয় না যথা অজ্ঞাত লোক, অভাবরহিত ব্যক্তি। কিন্তু কাহারও অপকার করা কোন মতেই উচিত নহে।

শুদ্ধ যে কাহারও অপকার করিবে না, কখনও নিষ্ঠুর হইবে না এমন নহে : দয়াবান্ হইবে, বৃদ্ধ, আতুর, অন্ন বস্ত্রাভাবে শীর্ণ ভিক্ষুক দেখিয়া কি চুপ্ করিয়া থাকা উচিত? রোগে কাতর ও বিপদে আপন্ন ব্যক্তি দেখিয়া কি উপেক্ষা করা যায়? কে না তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ করিতে চায়? ফলতঃ অভাব বিশিষ্ট লোক দয়ার পাত্র। পরমেশ্বর তোমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, যে অভাগা লোকের অভাব পূর্ণ করিবে; তোমাকে ধন দিয়াছেন, যে তুমি নির্ধন দরিদ্রকে সাহায্য করিবে; তোমাকে সুস্থ রাখিয়াছেন যে রোগীর সেবা করিবে; তোমাকে বিদ্যা ও ধর্ম্মে ভূষিতা করিয়াছেন যে মূর্খ ও পাপীকে উপদেশ দিয়া রক্ষা করিবে। দয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দয়াহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। যাহার দয়া নাই সে পশুতুল্য। যাহার মন দয়া দ্বারা আর্দ্র না হয়, তাহার পাষাণ মন। দয়ার পাত্র দেখিলেই দয়া করিবে। মুখের গ্রাসও দরিদ্রকে দিয়া তাহার উপকার করিবে। পরের দুঃখ দেখিলেই

দুঃখী হইবে ও তাহা যেন আপনার দুঃখ এই মনে করিয়া মোচন করিবে। বিপদগ্রস্ত লোক দেখিলেই তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। পর দুঃখে যে কাতর না হয় সে নিতান্ত নিষ্ঠুর।

দয়ার পাত্র এই কয়জন—দরিদ্র, রোগী, শোকার্ত্ত, বিপদগ্রস্ত, মূর্খ, ও পাপী।

শুদ্ধ মনে দয়া করিলেই হয় না কার্য্যে প্রকাশ করাও চাই। কেবল মুখে দয়া হয় না। পর দুঃখ মোচন করাই দয়ার কার্য্য। আপনার ধন থাকিলে তাহা পর দুঃখ মোচনে সার্থক হয়। অতএব পরোপকারে ধন দান করিতে কুণ্ঠিত হইও না। দরিদ্রজনকে ধন দিবে ও অন্ন বস্ত্র দিবে। যে খাইতে পায় না তাহাকে অন্ন দিবে যে পরিতে পায় না তাহাকে বস্ত্র দিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে যত্নশীল থাকিবে। আপনার কষ্ট করিয়াও পরের দুঃখ মোচন করিবে।

রোগীকে ঔষধ প্রদান করিবে অথবা ঔষধ কিনিবার মূল্য দিবে। নিজে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও পরোপকার করা যায়। রোগীকে সেবা করা অতীব কর্ত্তব্য। রোগীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহার যাহাতে রোগ যাইয়া স্বাস্থ্য হয় এমন চেষ্টা করিবে। যে কোন লোক হউক না কেন, যে কোন প্রকারে পার রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন লইবে।

শোকগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা করিবে। বিপদে পতিত লোকের যাহাতে উদ্ধার হয় এমন করিবে। কি অর্থ কি শারীরিক পরিশ্রম বিপদগ্রস্ত লোকের উপকারার্থ কিছুরই ত্রুটি করিবে না। মূর্খ লোককে লেখা পড়া শিখাইতে কষ্ট বোধ করিও না। পাপী লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিবে। তুমি যাহা জান তাহা তাহাকে শিখাইবে।

চতুর্থ উপদেশ।

(ভক্তি ও সম্মান।)

যেরূপ কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিবে না, সেই প্রকার কাহারও অপমান করিবে না। শ্রেষ্ঠ লোককে যথেষ্ট মান্য না করিলেই তাঁহাদের অপমান করা হয়। অতএব যাহার যেরূপ মান তাহাকে সেই রূপ মান্য করিতে ত্রুটি করিও না। মান্য ব্যক্তির সহিত সমান সমান কথা কহিবে না, অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট নম্র ভাবে কথা কহিবে। তাঁহাদের কোন দোষ দেখিলে কর্ত্তৃত্ব করিয়া উপদেশ দিতে যাইও না; তাঁহাদের কোন অভিপ্রায় খণ্ডন করিতে হইলে নম্র ও বিনীত ভাবে কথা কহিবে। মান্য ব্যক্তির প্রতি কখন 'তুই' বাক্য প্রয়োগ করিও না। বিশেষ কোন কর্ত্তব্য না হইলে মান্য ব্যক্তির আজ্ঞা

অবহেলা করিও না। তাঁহাদের সম্মুখে পরিহাস, বিকট হাস্য ইত্যাদি করিবে না। যে কথায় কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের সম্মুখে এরূপ কথা বলা মূর্খতা ও অলম্রতা মাত্র, মান্য ব্যক্তি অপেক্ষা কোন এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার সম্মানের ত্রুটি করা উচিত নয়। অবশ্য, মনুষ্য সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ না হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি কোন এক বিষয়ে তাহাকে মান্য করিবে না? তাবৎ গুরু জনকে মান্য করিতে হয়। আপনা হইতে যিনি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে সেই বিষয়ের জন্য মান্য করা উচিত।

কিন্তু শুদ্ধ বাহ্যিক আচরণে মান্য করিলেই যে শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি যথার্থ ব্যবহার করা হইল এমন নহে। বিশেষ-গুণ-বিশিষ্ট লোকের প্রতি ভক্তি করিতে হয়। যেরূপ কাহারও অভাব দেখিলে সহজেই মনে দয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ কাহার কোন বিশেষ গুণ দেখিলে স্বভাবতঃ ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি মানসিক ভাব, ভক্তি অন্তরের, বাহিরের নহে। ভক্তি-ভাজন লোকদিগকে বাহিরে মান্য করিলেই হয় না মনে মনে তাহাদিগকে সম্মান ও ভক্তি করিতে হয়। ভক্তি প্রকাশকে সম্মান কহে; ভক্তির কার্য্য সম্মান। সম্মান না থাকিলে কখনই ভক্তি করা হয় না? কিন্তু ভক্তি না থাকিলেও সম্মান করা হয়। সম্মান বাহ্যিক, ভক্তি আন্তরিক।

সম্মান বাহ্যিক; অতএব সাংসারিক গুণে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা মান্য ব্যক্তি। যাঁহারা শুদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ অথবা ধন, মান, যশ ও সাংসারিক ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে মান্য করা উচিত। তাঁহারা যদি বিদ্যা, ধর্ম্ম ও অন্যান্য মানসিক গুণহীন হয়েন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভক্তি না করিতে পার; কিন্তু কখনই অমান্য করা যাইতে পারে না। ভৃত্য প্রভুকে ভক্তি করিতে পারে বটে; কিন্তু যদি প্রভু দোষী হয়েন, পাপী ও মূর্খ হয়েন তাহা হইলে কেমন করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি আসিবে? মানসিক গুণ না দেখিলে ভক্তি আইসে না। কিন্তু তা বলিয়া কি সে প্রভুকে মান্য করিবে না? না, তাহার সহিত সমান সমান ব্যবহার করিবে? ফলতঃ ভক্তি রহিত সম্মানও অনেক স্থলে আবশ্যক। নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ কতক গুলিকে শুদ্ধ স্নেহ করিতে হয় ও কতক গুলিকে দয়া করিতে হয়; সেই রূপ শ্রেষ্ঠ জনের মধ্যে কতক গুলিকে শুদ্ধ সম্মান করিতে হয় এবং কতক গুলিকে ভক্তি করিতে হয়। যদ্রূপ স্নেহপাত্রকে দেখিলে আদর করিতে হয়, সেইরূপ মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে হয়। তিনি নিকটে আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হয়। মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে হয়।

কিন্তু মানসিক সদ্গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শুদ্ধ সম্মান

করিলেই হয় না। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হয়। ধনী হউক বা নির্ধন হউক, প্রভু হউক বা ভৃত্য হউক, বৃদ্ধ হউক বা বালকই হউক, সদ্গুণ যাঁহার আছে তিনি ভক্তির পাত্র। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার লোকের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, যথা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইত্যাদি; বিদ্যায়-শ্রেষ্ঠ—শিক্ষক, বিদ্বান্; ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ—ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সাধু-লোক, ঈশ্বর-পরায়ণ লোক: এবং বিশেষ বিশেষ সদ্গুণে শ্রেষ্ঠ; যথা—দেশ হিতৈষী, উদার-স্বভাব ব্যক্তি ইত্যাদি।

সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ লোক যদি বিদ্যা ও ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ না হন তথাপি তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। পিতা মাতা যদি নিতান্ত মূর্খ ও পাপী হয়েন তথাপি তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে। অবিচক্ষণ পিতা মাতার কথা সকল সময়ে গ্রাহ্য না হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের প্রতি ভক্তি থাকা আবশ্যক। শ্বশুর শাশুড়ীও পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন। তাঁহাদের সেবা করা আবশ্যক। জ্যেষ্ঠভ্রাতা-ভগ্নীগণ পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন। স্বামী ও স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাভগ্নীও তাঁহার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভক্তি-ভাজন হয়েন। এতদ্ভিন্ন মামা খুড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে। ইহাদিগকে মনের সহিত ভক্তি করিবে।

মনুষ্য পশু হইতে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ; অতএব জ্ঞান মনু-

ষ্যের এক প্রধান গুণ। অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠলোক। এই জন্যই লোকে বিচক্ষণ প্রাচীনদিগকে ভক্তি করে। ফলতঃ বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ মাত্রেই পূজ্য। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানের সুন্দর-রূপ আলোচনা হয়; চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তি উভয়ই প্রবল হয়, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি ভক্তি-ভাজন। এই জন্য গুরু এত পূজ্য। বিদ্বান্ ব্যক্তি বয়সে ছোট হইলেও ভক্তি ভাজন হয়েন। ধনী বা নির্ধন, বিখ্যাত বা অপরিচিত যাহা হউন না কেন, বিদ্বান্ ব্যক্তির গৌরব কখনই হ্রাস হয় না। অতএব বিদ্বান্ লোককে ভক্তি করিবে। তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিবে।

কিন্তু সকল হইতে ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ গুণ। ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুতুল্য। সুতরাং ধর্ম্মেতেই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব হইয়া থাকে। পাপিলোক সকলেরই ঘৃণিত। এবং ধার্ম্মিক লোক সকল অবস্থাতেই আদরণীয় ও পূজ্য। ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, যশ, এবং বিদ্যাও ইহার তুল্য নহে। যেরূপ গন্ধহীন পুষ্প ও জলশূন্য সরোবর শোভা পায় না সেইরূপ ধর্ম্মহীন বিদ্বান্ যথার্থরূপ ভক্তির পাত্র হইতে পারেন না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি নিতান্ত দরিদ্র বা মূর্খ হয়েন তথাপি তিনি অধার্ম্মিক, ধনী ও বিদ্বান্ অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। একজন

ধার্ম্মিক চাষা, ধনী ও বিদ্বান্ অপেক্ষাও পূজ্য। বস্তুতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনি সকল হইতে পূজ্য। অতএব তুমি ধার্ম্মিক লোককে সর্ব্বদাই ভক্তি করিবে। তাঁহাদের অর্থ নাই বা মান নাই বলিয়া লজ্জা বোধ করিও না। সকল অর্থ হইতে ধর্ম্মই প্রধান অর্থ; সকল মান হইতে ঈশ্বরের আদরই শ্রেষ্ঠ। ধার্ম্মিক লোকের সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে প্রণাম করিবে। যে ব্যক্তি যেরূপ ধার্ম্মিক তিনি সেই রূপ পূজ্য। ধার্ম্মিক ও সাধু লোকের পরামর্শ সর্ব্বদাই গ্রাহ্য।

এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের আরও অনেক বিষয়ে অদ্বিতীয় গুণ আছে যাহার নিমিত্ত তাঁহারা শ্রদ্ধাস্পদ অর্থাৎ ভক্তি-ভাজন হয়েন। কোন কোন লোক স্বদেশকে এরূপ ভাল বাসেন যে তাহার হিতের জন্য তিনি আপনার সুখ, মান ও প্রাণও ত্যাগ করিতে দুঃখিত হন না। দেশীয় লোকের সুখে তাঁহাদের সুখ ও তাহাদের দুঃখে তাঁহাদের দুঃখ হয়। এরূপ লোককে দেশহিতৈষী কহে। দেশহিতৈষী লোকের প্রতি সম্মান ও ভক্তি করা উচিত। ইঁহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক প্রকার লোক আছেন—যাঁহারা সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ ও যাবতীয় মনুষ্যকে স্বপরিবার মনে করেন, এরূপ লোক অবশ্যই ভক্তি-ভাজন।

ঔদার্য্য এক মহৎ গুণ। উদার ব্যক্তি কুটিল স্বার্থ-পরতার অধীন নহেন। তিনি কাহার প্রতি বিরক্ত হয়েন না। উদার ব্যক্তি সকলকেই ভাল বাসেন ও শত্রুকেও ক্ষমা করেন। এরূপ ব্যক্তিকে মহানুভব কহে এবং ইঁহাকেই মহাশয় বলা যায়। উদার-ব্যক্তি সকলেরই পূজ্য।

এইরূপ অনেক প্রকার সদ্গুণ আছে। সেই সকল সদ্গুণ বিশিষ্ট লোককে ভক্তি করিবে। তোমার যে গুণ নাই কিন্তু অন্যের সেই সদ্গুণ আছে এরূপ লোক তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব এরূপ লোককে সেই গুণের জন্য ভক্তি করিবে।

যাবতীয় সদ্গুণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে রহিয়াছে, তিনি সর্ব্ব-গুণ সম্পন্ন। অতএব তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করা উচিত। মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না; কিন্তু তিনি তোমা অপেক্ষা সকল গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব কদাপি তাঁহাকে ভক্তি করিতে ত্রুটি করিও না। অপবিত্র মনে ঈশ্বরের নাম বৃথা গ্রহণ করিও না, তাহা হইলে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়।

ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার উপদেশ।

ভগ্নি সরস্বতি! আমি তোমার সুশীলতা ও পাঠে মনোযোগ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি এবং আমার আশা হইতেছে যে যদি সর্ব্বদা এইরূপ মনোযোগ দিয়া বিদ্যাভ্যাসে রত হও তাহা হইলে বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। অতএব আরও মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিবে। বিদ্যা মহামূল্য রত্ন যিনি পরিশ্রমরূপ মূল্য দিয়া বিদ্যারত্ন উপার্জ্জন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ধনী এবং তিনিই একজন শ্রেষ্ঠবণিক। বিদ্যালোচনার দ্বারা যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করা যায়, যিনি একবার বিদ্যারসের আস্বাদ পাইয়াছেন তিনিই তাহা অবগত আছেন। এই বিদ্যাদ্বারাই পৃথিবীর এত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই বিদ্যাদ্বারা মনুষ্য আপনার অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে দেশ যত সভ্য ও উন্নত দেখা যায় সেই দেশেই বিদ্যার তত অধিক আলোচনা হয় এবং যেখানে বিদ্যার তাদৃশ আলোচনা নাই সেই দেশের লোকেরাই তত হীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। ফলতঃ বিদ্যা শিক্ষার তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি ও অবনতি সংঘটিত হয়। অতএব যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক

বিদ্যানুশীলন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষায় ঔদাস্য ও অবহেলা করে, তাহার মত হতভাগ্য অতি অল্প দেখা যায়, সে চিরকাল দুঃখ ভোগ করত জীবন যাপন করে।

হায়! আমাদের দেশের অবলারা কি হতভাগ্য, এমন দুর্ল্লভ বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাসীর ন্যায় দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে। ভগ্নি! যদিও তুমি এই সংসারে কোন কোন বিষয়ে কষ্ট পাইতেছ, যদিও তোমার সকল ইচ্ছা সফল হইতেছে না তথাপি তুমি যে এমন অপূর্ব্ব বিদ্যারূপ সুধারসের আস্বাদ পাইয়াছ, তাহাতেই আপনাকে সুখী জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ভাবিয়া দেখ দেখি যদি তুমি এতাদৃশ সুখকর বিদ্যা শিক্ষায় বঞ্চিত হইতে তাহা হইলে তোমার অবস্থা কি হইত! তুমি এখন পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া ও উপদেশ পাইয়া যে অনুপম সুখ সম্ভোগ করিতেছ তাহার স্বাদও জানিতে পারিতে না। দেখ! তোমার চতুষ্পার্শ্বে কত কত ভগ্নীগণ মোহ ও অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কি ভয়ানক দুঃখ ও দুরবস্থায় কাল যাপন করিতেছে; কিন্তু তাহারা অন্ধপ্রায় হইয়াছে বলিয়া আপনাদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইতেছে না। যদি তাহাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দেওয়া যায় তবে তাহারা স্ব স্ব দুরবস্থা দেখিতে

পায় এবং তাহা দূর করিতে যত্ন ও চেষ্টা করে যাহা হউক তুমি যখন সৌভাগ্য ক্রমে তাহাদের মত না হইয়া বিদ্যারূপ অমূল্যরত্ন লাভ করিয়াছ তখন তাহা সঞ্চয় করিতে অবহেলা করিও না; অধিকতর পরিশ্রম ও মনোযোগ দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করিবে, কদাচ বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

সময়ও একটী অমূল্য ধন? যিনি যে সময় অনর্থক নষ্ট করিবেন তাঁহাকে তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইতে হইবে। যিনি যত সময় পাইবেন অর্থাৎ যিনি যত কাল জীবিত থাকিবেন তাঁহাকে পরমেশ্বরের কাছে তাহার হিসাব দিতে হইবে। অতএব অনর্থক সময় নষ্ট করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা বিদ্যানুশীলনে মনোনিবেশ করিবে। এবং সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া যে সময় পাইবে তাহাও কখন বৃথা নষ্ট করিও না। যদি কখন নিরর্থক সময় নষ্ট না কর তাহা হইলে সংসারের প্রাত্যাহিক কার্য্য সকল সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে এবং বিদ্যা শিক্ষা-য়ও দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে মনুষ্য সহস্র পুস্তক পাঠ করুন কিম্বা হাজার জ্ঞান-শিক্ষা করুন যত-দিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের মত কার্য্য না করিবেন তত দিন তিনি কখনই মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারেন না,

অতএব তুমি কেবল লেখা পড়া শিখিয়াই কদাচ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে না এবং উত্তম আবৃত্তি ও পাঠাভ্যাস করিতে পারিলেই যে প্রশংসাযোগ্য হইবে এমত নহে। যখন তুমি যে পরিমাণে আপনার দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং সৎকর্ম্ম সকল সাধন করিয়া আপনার চরিত্র পবিত্র করিবে তখনই তোমার বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ সেই পরিমাণে সফল হইবে এবং সেই পরিমাণে প্রশংসা ভাজন হইবে।

অতএব ভগ্নি! তুমি যখন যে পুস্তকে ভাল ভাল হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইবে তখনই তাহার মত কাজ করিতেও অভ্যাস করিবে নতুবা তোমার সে পুস্তকপাঠ নিরর্থক হইবে। তুমি পুস্তকে কত নীতিগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছ; কিন্তু যদি তদনুযায়ী কার্য্য না কর তবে তোমার সে জ্ঞানলাভে কি ফল হইল? তুমি তোমার পাঠ্য পুস্তকের কত স্থানে পাঠ করিয়াছ "ঈশ্বরকে প্রীতি করা কর্ত্তব্য, সদা সত্য ও প্রিয় কথা কহা উচিত, পিতা মাতাকে ভক্তি করা এবং তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করা আবশ্যক"। কিন্তু যদি কার্য্যের সময় তাহার মত কাজ না কর তবে তোমার সেই পুস্তক পাঠে কি ফল দর্শিল? যাহা হউক নিশ্চয় জানিবে যে কেবল পুস্তক পড়িলেই কেহ বিদ্বান্ ও বড়লোক হয় না এবং কেবল পড়িবার জন্য পুস্তকে নীতি-উপদেশ

সকল লিখিত হয় নাই। তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্যই বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা ও পুস্তক পাঠের প্রয়োজন। যদি কোন ব্যক্তি পুস্তক না পড়িয়াও তাহার মত কাজ করিতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকে তবে তাহারও সেই পুস্তক পাঠের ফল হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন বোধ করি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমরা কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াই শ্রেষ্ঠ হইতে পারি না, আমাদের জ্ঞানানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। অতএব যখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে তখনই তাহার মত কার্য্য করিবে। কিন্তু পরে যদি তাহা ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পার তবে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। অজ্ঞানতা-বশতঃ কোন কর্ম্ম করিলে তাহাতে পাপ হয় না।

ভগ্নি! যদিও আপাততঃ তোমার পড়ার কিছু প্রতিবন্ধক হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহাতে কখন ভগ্নোৎসাহ হইও না। যদি আপনা আপনি চেষ্টা ও পরিশ্রম কর এবং অধ্যবসায় অবলম্বন কর তাহা হইলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। বিদ্যারূপ মহাসমুদ্রের সীমা নাই; সুতরাং লোকে চেষ্টারূপ নৌকা দ্বারা যত দূর গমন করুক না কেন কখনই তাহার তীর দেখিতে, পাইবে না, অতএব আমাদের যাবজ্জীবন বিদ্যা উপার্জ্জনার্থে যত্ন ও পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যারূপ সমুদ্রে গমন করিবার চেষ্টাই নৌকাস্বরূপ, পরিশ্রমই ক্ষেপণী এবং অধ্যবসায়ই কর্ণরূপ; এবং উৎসাহ পালস্বরূপ, বিদ্যা শিক্ষার যে কত গুণ তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্য নহে। বিদ্যাশূন্য জীবন অসার জীবন। বস্তুতঃ বিদ্যার উপরেই মনুষ্যের শ্রী সৌভাগ্য, সভ্যতা ও উন্নতি সকলি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আহা! এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত থাকাতে কি মহান্ অপকার হইতেছে এবং সম্প্রতি সৌভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় দুঃখভাগিনী বামাগণ বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে যে, দেশের কত উপকার হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার তাদৃশ প্রচার না থাকাতে কি কি অপকার হইতেছে এবং তাহা সম্যক প্রচলিত হইলেই বা কি কি উপকার হইবে, একদিন তোমাকে এই বিষয়টি লিখিতে বলিয়া ছিলাম তুমি তাহা উত্তমরূপ লিখিতে পার নাই। অতএব আর এক দিন তোমাকে এই বিষয়টি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব। তাহা হইলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভগ্নীভাব।

পুরুষদিগের সহিত পুরুষদিগের যেরূপ প্রণয় রক্ষা করা আবশ্যক, স্ত্রীলোকদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ সদ্ভাব সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। যিনি সদ্ভাব রক্ষা করিয়া লোকের সহিত কার্য্য করেন যিনি সকলকে বিনীত ও নম্রবচনে অভ্যর্থনা করেন, যিনি সকলকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিয়া সকলের হিতানুষ্ঠানে যত্নশীল হন, যিনি মিথ্যা পরিহাস, কলহ, বিবাদ হইতে সতত বিরত থাকেন, তিনি সকলের আদরণীয়া ও স্নেহপাত্রী হইয়া মনসুখে সকলের সহিত সহবাস করিতে পারেন। কিন্তু যিনি নিয়ত ভগ্নীদের সহিত কলহ বিবাদ করিয়া দিন যাপন করেন, যিনি সদাই কর্কশ বচনে সকলকে সম্বোধন করেন, যিনি স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া সকল ভগ্নীদিগকে বিভিন্ন করিয়া জানেন, যিনি নিয়তই পরদ্বেষ, পরহিংসা, পরশ্রীতে কাতরা হন, তিনি কোন কালে মনসুখে কালযাপন করিতে সক্ষম হন না। যিনি যতই অসদ্ভাব ব্যবহার করেন, তাঁহাকে ততই হীনাবস্থায় ও মনোদুঃখে অবস্থান করিতে হয়। অতএব হে ভগ্নীগণ! তোমরা সকল স্ত্রীলোকদিগকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিবে। এবং দুর্ব্বাক্য

সকল বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া মধুর বচনে সকলকে সম্বোধন করিবে। কখন কাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না। তোমাদের যে ভগ্নী যত কেন নীচ ব্যবসায় অবলম্বিনী হউন না, তথাপি তাঁহাকে ভগ্নী বলিয়া আদর ও শ্রদ্ধা করিবে। কি নীচজাতি, কি দরিদ্রা, কি দাসী কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না এবং কাহারও প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা মনোবেদনা প্রদান করিবে না। যিনি রাজ্ঞী তাঁহাকে ধনী বলিয়া যেরূপ মান্য করিবে, যিনি দাসী তাঁহাকে পরিচারিকা বলিয়া সেরূপ ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিবে। যিনি মূর্খ তাঁহারে ঘৃণা না করিয়া, বরং যাহাতে তাঁহাকে বিদ্যা-বতী করিতে পার এরূপ উপদেশ শিক্ষা দিবে। আপনি বিদ্যাবতী বলিয়া গর্ব্বিতভাবে মূর্খদিগকে অবজ্ঞা করিবে না।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় অনেককে কলহপ্রিয় দেখা যায়; তাহার প্রধান কারণ কেবল মূর্খতা। বিদ্যাশিক্ষা করিলে সকল বিষয়ের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, মন পরিষ্কৃত হয়। ইহাতে সদসৎ সকল বিষয় প্রতিভাত হয়। মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের এমনি মন্দ স্বভাব যে পরস্পর অতি নিকটসম্বন্ধ হইলেও হিংসা, দ্বেষ, কলহ, বিবাদ করিয়া অধর্ম্মে পতিতা হয় এবং ক্ষুণ্নচিত্তে ও মনদুঃখে কালাতিপাত করে। যে

বধূমাতা শ্বশুরের এক কালে প্রিয়পাত্রী ছিলেন কিছুদিন পরে তিনি বিষতুল হইলেন। যে ভ্রাতা চিরকাল এক-হৃদয়ে ভ্রাতৃভাবে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন, হয়ত হিংস্রক স্ত্রীর প্র ণয়জালে পতিত হইয়া প্রাণসম ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। যে ভ্রাতা প্রিয়তমা সহোদরা হইতে বিভিন্ন হইবার ভাব হৃদয়ে একবারও স্থানদান করেন নাই, হয়ত স্বার্থপর স্ত্রীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া ,প্রাণাধিকা ভগ্নী হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হন। যে পিতা, যে পুত্রের মুখাবলোকনে একবার আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, যে পিতা একবার মাতৃহীন শিশুকে নিরাশ্রয় অবস্থায় স্নেহের সহিত ধাত্রীর ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন, তিনি হয়ত এককালে দ্বিতীয় ভার্য্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সেই স্নেহের ধনকে নিরাশ্রয় করিয়া দেন। এইসকল ঘটনা কি ভয়ঙ্কর! এই সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার দর্শন করিলে হৃদয় ব্যাকুল, মন শঙ্কিত হইতে থাকে। মূর্খ স্ত্রীলোক-দিগের দ্বারা সংসারের কত অমঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে; ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ; ভগ্নী-বিচ্ছেদ, পুত্র-বিচ্ছেদ হইতেছে, এবং জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলি তাহাদের জন্য বিযুক্ত হয়। ভগ্নীগণ! তোমাদের স্বভাব যেন এরূপ দূষণীয় কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয়। তোমাদিগের যেরূপ কোমল স্বভাব, যেরূপ নম্র প্রকৃতি তাহাতে এরূপ

ঘৃণাজনক ভাব ধারণ করিয়া স্ত্রীকুলে কলঙ্ক আরোপ করিও না। তোমরা এখন সংসারে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান! দেখিও যেন কাহার প্রতি মন্দ ব্যবহার না হয়। তোমরা যেমন কেন অবস্থায় পতিত হও না স্ত্রীলোকদিগকে ভগ্নীভাবে এবং পুরুষদিগকে ভ্রাতৃভাবে সম্ভাষণ করিবে, এবং তোমাদের স্বভাবোপযোগী কোমল মৃদু বচনে মধুরালাপ করিবে। কখন কাহার প্রতি কুব্যবহার করিবে না, সর্ব্বদাই ভগ্নীভাবে সকল ভগ্নীদিগের সহিত মনসুখে কাল যাপন করিবে। সংসারে প্রকৃত ভগ্নীভাব বিরাজিত হইলে দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ আর স্থান পায় না এবং সকল প্রকার অমঙ্গল দূরে পলায়ন করে।

যাহাকে যে বাক্য বলিলে অপ্রিয় হয়, তাহাকে সে বাক্য বলিবে না, কিন্তু যদি সত্য রক্ষার জন্য অপ্রিয় বলিতে বাধ্য হও তাহাও বলিবে, কিন্তু যতদূর তাহা কোমল করিয়া বলিবার তোমার সাধ্য থাকে তাহার চেষ্টা করিবে; কদাচ সত্য অপ্রিয় বলিবে না। স্ত্রীলোকদিগের এমনি কুটিল স্বভাব যিনি শত্রু প্রাণান্তেও তাঁহার উপকার করিতে ইচ্ছা করে না এবং যাহাতে তাঁহার অনিষ্ট হয় তাহারই সর্ব্বদা চেষ্টায় রত থাকে। যিনি শত্রু তাঁহার প্রতি শত্রুতা বা ঘৃণা না করিয়া ভগ্নীভাবে তাঁহাকে সৎ উপদেশ প্রদান করিবে।

স্বার্থপরতায় জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ মনকে প্রশস্ত করিয়া ভগ্নীভাবে স্নেহ দৃষ্টিতে সকলকে দেখিবে।

ভগ্নীদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সে বিষয় বলা হইল। এখন ভগ্নীভাব কি প্রকারে বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহার দুই একটী সহজ উপায় বলিতেছি।

এ দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রায় বাহিক ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের উপর প্রীতি সংস্থান করেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রণয়ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যাঁহাদের শ্রীসৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি তাঁহারা স্ত্রীলোক দেখিলেই সুলক্ষণা, কি সুশ্রী তাহাই নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, যাঁহার মনোমত শ্রী বা সুলক্ষণ সকল দেখিতে পান তাঁহার সহিত সদ্ভাব করিতে ভাল বাসেন এবং তাঁহার সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিয়া, দিন দিন প্রণয় বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। এই প্রকারে তাঁহাদের প্রণয় বর্দ্ধিত হয় বটে কিন্তু সাধারণ লোকের সহিত তাঁহাদের কোন কালে প্রণয় হয় না। কি শারীরিক সৌন্দর্য্য, কি অলঙ্কার, কি বস্ত্র এই প্রকার ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের উপর প্রীতি সংবদ্ধ করিলে তাহা, কখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অতএব এসকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী আন্তরিক বিষয়ের উপর প্রীতি স্থাপন করিলে তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে পারে। গুণের উপরেই সকলের প্রীতি

সংবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ভগ্নী দরিদ্রাই হউন, বা নীচ জাতিই হউন, সচ্চরিত্র হইলে তাঁহার সহিত অবশ্যই প্রণয় রক্ষা করা উচিত। ভগ্নীভাব বৃদ্ধি হইবার এই একটী প্রধান উপায় যে যাঁহার মন ভাল তাঁহারই সহিত প্রণয় রক্ষা করা।

জাতি বা ধন মানের গৌরব পরিত্যাগ করতঃ মধ্যে মধ্যে সকলের সহিত ভগ্নীভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে পরস্পরের ভগ্নীভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে পারে। সঙ্গিনীগণের সহিত যেরূপ প্রণয় হইয়া থাকে, প্রতিবেশীগণের সহিত তদ্রূপ হয় না। আবার প্রতিবেশীগণের সহিত যদ্রূপ প্রণয় হয়, গ্রামস্থ লোকদের সহিত তদ্রূপ হয় না; অতএব যাঁহার সহিত যত সহবাস হয় তাঁহার সহিত তত প্রণয় হইয়া থাকে, এজন্য সকলের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরিবারস্থ ভগ্নী ও সঙ্গিনীগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক, গ্রামস্থ লোকদিগের সহিতও সেরূপ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব বৃদ্ধির উপায় এই যে সর্ব্বপ্রকার অভিমানাদি পরিত্যাগ করতঃ সরল চিত্তে তাঁহাদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিবে। এবং আপনার ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতিকে যেরূপ প্রীতি কর, সেইরূপ অকপট প্রীতি প্রকাশ করিবে এবং সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের উপকার করিতে চেষ্টা করিবে।

সমানের সহিত সমানের সদ্ভাব দেখা যায় অর্থাৎ ধনী ধনীর সহিত, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমানের সহিত, কিন্তু ধনী দরিদ্রের সহিত, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের সহিত প্রায় সদ্ভাব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে না। এই অভিমানটী সদ্ভাবের একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। এপ্রকার নীচ-ভাব অতিশয় মন্দ। যাহার মন যত ছোট, সে ততই স্বার্থপর, কিন্তু যাঁহার প্রশস্ত মন, তিনি সকলকে সমান দেখেন ও সকলকে সমান ভাল বাসেন। অতএব সদ্ভাব বৃদ্ধির আর একটী উপায় এই যে শ্রেষ্ঠ লোক-দিগের অভিমান, ও নীচদিগের লজ্জা পরিত্যাগ করা — এই দুইটী প্রতিবন্ধক দূর হইলে ভগ্নীভাব সহজেই বর্দ্ধিত হইতে পারিবে।

বিদ্যালয়স্থ একপাঠীদিগের সহিত যে প্রণয় হইয়া থাকে, ইহারও কারণ একত্র অধ্যয়ন, একত্র ক্রীড়া, একত্র অবস্থিতি। অতএব ঐরূপ বিদ্যালয় ও প্রকাশ্য উপাসনালয় গমন করিলে ভগ্নীভাব বৃদ্ধি হইতে পারে। যাঁহারা সমাজ বা বিদ্যালয়ে গমন করেন তাঁহারা এই বাক্যের মর্ম্ম উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য।

(উপক্রমণিকা।)

পরম জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্য জাতির উৎপত্তি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একের অভাবে মানব জাতি কখনই রক্ষা হয় না। ইহাদিগের উভয়েরই নিজ নিজ কার্য্য আছে এবং প্রত্যেকের শরীর এবং মন সেই সেই কার্য্যের উপযোগী করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষের শরীর সবল ও শ্রমসহ এবং মন তেজস্বী ও সুচতুর। স্ত্রীর শরীর ও মন উভয়ই কোমল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। পুরুষেরা যাহাতে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক এপ্রকার নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন এবং সংসার পালনের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সংগ্রহ করিবেন। স্ত্রীর কার্য্যক্ষেত্র সেরূপ প্রশস্ত নহে, তিনি গৃহ মধ্যে থাকিয়া পুরুষ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত দ্রব্য সকল শৃঙ্খলা পূর্ব্বক গৃহমধ্যে সুরক্ষিত এবং তাহাদের পরিমিত ব্যয় করিবেন। সংসারের তাবৎ কার্য্য পরিদর্শন, পুত্র কন্যাদিগকে পালন, আয় ব্যয় নিরূপণ, গৃহদ্রব্য সকল যত্নের সহিত সংরক্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য। পুরুষের বাহিরে

পরিশ্রম করিতেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়, গৃহ শৃঙ্খলা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, সেই জন্য স্ত্রীর উপরেই সেই সমস্ত কার্য্যের ভার রহিয়াছে। পরমেশ্বর পুরুষকে দৃঢ়িষ্ঠ এবং স্ত্রীকে কোমল করিয়া সৃষ্টি করিয়া জগতের কেমন মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যাহারা দৃঢ়িষ্ঠ, বল-বীর্য্যবান্ তাহারা কখনই গৃহমধ্যে বা এক স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করে না, স্বভাবতই তাহারা পরিশ্রম করিতে ধাবিত হয়। পুরুষের এইরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যক জানিয়া পরমেশ্বর তাহাকে সবল প্রকৃতি করিয়াছেন। স্ত্রীকে ঐরূপ দৃঢ়িষ্ঠ ও শ্রমক্ষম করিলে, গৃহ মধ্যস্থ যৎসামান্য পরিশ্রমে তাহার শরীর রক্ষা হইত না অথচ গৃহমধ্যে অধিকাংশ সময় যাপন করিয়া সংসার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য জ্ঞানবান্ পরমেশ্বর স্ত্রীর প্রকৃতিকে কোমল করিয়াছেন।

অলস বা অজ্ঞান থাকিবার জন্য জগদীশ্বর কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই যেমন তিনি হস্তপদ, চক্ষুকর্ণ দিয়া পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ উভয়কেই আবার বুদ্ধি জ্ঞান দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি প্রদান করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের উপযুক্ত করিয়াছেন। কেবল পুরুষেরাই আহার করিবে স্ত্রীগণ নিরাহার থাকিবে ইহা যেমন

বলা সঙ্গত নহে, সেইরূপ কেবল পুরুষেরাই বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানালোচনা ধর্ম্মোপার্জন করিবে, আর স্ত্রীরা অজ্ঞান ও ধর্ম্মহীন থাকিয়া জগতে আহার, নিদ্রা ও সাংসারিক সামান্যসুখ ব্যতীত আর কোন উচ্চতর আনন্দ লাভের অধিকারী নহে ইহা বলাও অসঙ্গত। যদি জ্ঞান ও ধর্ম্মের সৃষ্টি মনুষ্যের জন্য হইয়া থাকে তাহা হইলে স্ত্রীজাতিরও তাহাতে অধিকার আছে, কারণ স্ত্রীজাতিও মনুষ্য। অতএব হে দেশীয় ভগ্নীগণ! আপনারা আপনাদের সকল অধিকার বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন। ঈশ্বর আপনাদিগকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহা হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিবার কাহারও অধিকার নাই। তিনি আপনাদের মঙ্গলের জন্য যে পথ প্রদর্শন করিতেছেন তাহা অবলম্বন না করিয়া অন্য পথে গেলেই আপনাদের অমঙ্গল হইবে। পিতা যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করিতে লজ্জা কি, মাতা যাহা স্নেহের সহিত উপদেশ দেন তাহা গ্রহণ করিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে। আপনারা জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইলে আপনাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, সরলতা শোভাযুক্ত হইবে, মৃদুতা আরও মিষ্ট হইবে, তখনই আপনারা সকল শোভার ভাণ্ডার হইবেন। জ্ঞানের অভাবে সৌন্দর্য্য শোভাবিহীন হয়; মৃদুতা—নির্ব্বুদ্ধিতা, এবং সরলতা—অজ্ঞানতা হয়।

গন্ধই গোলাপের প্রধান গুণ, গন্ধহীন গোলাপের আদর কোথায়। জলের যদি স্নিগ্ধকরী শক্তি না রহিল তাহা হইলে তাহার আর প্রায়োজন কি? সেইরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মবিহীন মন মনই নহে, তাহা প্রাণহীন শরীরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য, শ্রীহীন। ভগ্নীগণ! আপনারা এই জ্ঞানধর্ম্মকে অবহেলা করিবেন না, তাহা হইলে আপনাদের মনুষ্য জন্ম ধারণ করিবার কোন ফলই লাভ হইল না। আপনাদিগের কি কি কর্ত্তব্য তাহা জানিয়া সেইরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন আর কালবিলম্ব করিবেন না।

স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য।

এদেশের স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ সংস্কার যে তাঁহারা কেবল সংসারের কার্য্য এবং সন্তান প্রসব ও পালন করিবেন, এই জন্যই পরমেশ্বর তাহাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। এই ভাব পুরুষেরাই তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের এই সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে গৃহকার্য্য ব্যতীত তাহাদের আর কোন মহত্তর কার্য্য নাই। স্ত্রীরা পুস্তক হস্তে করিলে বিধবা হয় তাঁহাদের বিশ্বাস। স্ত্রীরা পুস্তক রচনা করিবে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবে কিম্বা ধর্ম্ম-

চিন্তা করিবে একথা শুনিলে তাঁহারা শ্রুতিমূলে হস্তার্পণ করেন। স্ত্রীদিগের আত্মা পুরুষদিগের আত্মার ন্যায় উন্নতিশীল কি না তাঁহারা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে সাহস করেন না।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের যেমন শরীর আছে সেইরূপ উভয়েরই আত্মা আছে। শরীরেরই কেবল স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদ আছে কিন্তু আত্মার স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। আত্মা জ্ঞান পদার্থ, অতএব যাহা জ্ঞান তাহার আবার স্ত্রী ও পুরুষ কি? এ শরীর এবং আত্মা উভয়েরই উন্নতি হয়। আহার, পরিশ্রম এবং বিশ্রাম দ্বারা শরীরের উন্নতি হয়, সেরূপ আত্মাকে উন্নত করিবার জন্য কতকগুলি কার্য্য আছে। বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান এবং মানসিক ভাব সকলকে উন্নত করিলেই আত্মার উন্নতি হয়। জগতে কত প্রকার পদার্থ রহিয়াছে তাহাদিগের বিষয়ে আমরা যত অধিক জানিব ততই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে। পৃথিবী, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র ইহারা কি, ইহাদের গতি কিরূপে হয়, দিবারাত্রি হইবার কারণ কি, গ্রহণ, ভূমিকম্প, জোয়ার ভাঁটা, মেঘ, বিদ্যুৎ, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ছয় ঋতু এ সমস্ত কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, এই সকলের বিষয় আমরা যতই জানিব আত্মা তত উন্নত হইবে। আবার ন্যায়, পরোপকার, সত্যপ্রিয়তা, বন্ধুতা, প্রণয়, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভাব, দেশ-

হিতৈষিতা, হিতাহিত জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি এই সকল ভাবকে যতই বৃদ্ধি করিতে পারা যায় আত্মা ততই উন্নত হয়। ইহাকেই আত্মার উন্নতি করা বলে। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই এই সকল করিতে পারেন এবং উভয়েরই আত্মা সমান উন্নত হইতে পারে। যেমন সকল শরীরই আহার গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ সকল আত্মারই ঐ সকল কার্য্য করিবার শক্তি আছে; স্ত্রীদিগের আত্মা ঐ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে না ইহা বলা যেমন সম্ভব আর স্ত্রীদিগের শরীর পুরুষদের ন্যায় অন্নপান পরিশ্রম দ্বারা পুষ্ট হয় না ইহা বলাও সেইরূপ সম্ভব। আহার ও পরিশ্রম বিষয়ে কোন স্ত্রীই অবহেলা করেন নাই সেই জন্য সকলেরই শরীর সুস্থ ও সবল দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যে সকলেরই অবহেলা বলিয়া সে বিষয়ে তাঁহাদের দুর্ব্বলতা আছে। স্ত্রীরা স্বভাবতঃ সরল, চতুর এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহারা সহজেই সকল বিষয় শিক্ষা করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা পুরুষদিগের আত্মার ন্যায় তাঁহাদের আত্মা উন্নত হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যেমন পুরুষদিগের শরীরের ন্যায় স্ত্রীদিগের শরীর উন্নত হয় সেইরূপ তাঁহাদের আত্মার ন্যায় স্ত্রীদিগের আত্মাও উন্নত হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্ত্রীদিগকে এই উভয় অধিকার দিয়াছেন।

তিনি পরম জ্ঞানবান্ তিনি কি না জানিয়া শুনিয়া একটী অধিকার দিলেন, এবং তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা কি তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য নহে? অতএব হে নারীগণ! তোমরা সেই পরম জ্ঞানবান্ পরমেশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য কর। তিনি যখন তোমাদিগকে পুরুষদের ন্যায় উন্নতিশীল আত্মা দিয়াছেন এবং তোমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করিবার শক্তিও দিয়াছেন. তখন কি তাঁহার এই অভিপ্রায় নহে যে তোমরা জ্ঞানকে উন্নত করিবে ধর্ম্মকে বৃদ্ধি করিবে; তাঁহাকে ভক্তি করিবে? যখন বাহিরে আহারীয় বস্তু এবং ভিতরে ক্ষুধা রহিয়াছে তখন কি ইহাই বোধ হইতেছে না যে ঐ আহারীয় বস্তু ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করিতে হইবে? সেইরূপ অন্তরে জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং শক্তি. এবং বাহিরে শিক্ষা করিবার অসংখ্য অসংখ্য বিষয় থাকাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে। জ্ঞানই মনুষ্যের চিরকালের বিষয়, শরীর চারি দিনের জন্য। এই জ্ঞানকে উন্নত না করিলে প্রকৃত মনুষ্য হওয়া যায় না।

অনেকের এইরূপ ভ্রম আছে যে, অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্যই কেবল বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা। কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে, জ্ঞানোন্নতির জন্য বিদ্যা শিক্ষা

আবশ্যক এবং এই জ্ঞানই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষণ। অতএব মনুষ্য নামের যোগ্য হইবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যা ও জ্ঞান থাকিলে মনুষ্য নানা উপায়ে আপনার অবস্থাকে ভাল করিতে পারে, সেই জন্য বিদ্যাশিক্ষা অর্থের একটী উপায় হইতে পারে, কিন্তু উহা তাহার উদ্দেশ্য নহে। জ্ঞানহীন পুরুষকে যখন পশুর সহিত তুলনা করা হয়, জ্ঞানহীনা স্ত্রীকে কি তবে পশু বলা যায় না? জ্ঞান স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই ভূষণ।

হে নারীগণ! তোমরা এখন আপনাদের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ। তোমরা কি, তাহাও বোধ হয় বুঝিয়াছ। তোমরা কেবল পুরুষের সেবার জন্য, গৃহকার্য্যের জন্য জন্ম গ্রহণ কর নাই, ঈশ্বরের কার্য্য করিতে এখানে আসিয়াছ। তোমরা তৈজস নহ কিন্তু জ্ঞান শক্তিসম্পন্ন আত্মা! পুরুষেরা নানা বিদ্যাতে পণ্ডিত হইতেছে, ধর্ম্মেতে উন্নত হইতেছে, তোমাদের কি তাহাতে অধিকার নাই? পরমেশ্বর তোমাদের শরীরের অন্ন দিয়াছেন আত্মার অন্ন দেন নাই ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে? তোমরা নানা বিদ্যায় পণ্ডিতা হইবে, ধার্ম্মিক হইবে, দেশের হিতকর কার্য্য করিবে। তোমাদের দ্বারা জগতের অধিক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। মনুষ্যেরা তোমাদের ক্রোড়ে

লালিত পালিত হয়, তোমাদের নিকট বাল্যকালে কত জ্ঞান পাইতে পারে।

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষো-
হস্তি কশ্চন।"

স্ত্রীগণ গৃহের শ্রীস্বরূপ। স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির যে সমাদর ছিল, তাহা উপরোক্ত শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। আমাদের পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ স্ত্রীদিগকে গৃহের শ্রী অর্থাৎ গৃহলক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরমেশ্বর রমণীজাতিকে মানব সমাজের ভূষণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের আকৃতি, ইহাদের প্রকৃতি, ইহাদের ভাষা ও ইহাদের মানসিক ভাব সকলই স্বভাবতঃ কোমল ও অতি মনোরম। যেমন তরুর ভূষণ পুষ্প, আকাশের ভূষণ নক্ষত্রমালা, সরোবরের শোভা সরোজিনী দল সেইরূপ রমণীগণকে মানবমণ্ডলীর শোভাস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। যে গৃহে স্ত্রী নাই সে গৃহের শ্রী নাই, তাহা শ্মশান তুল্য। সেখানে কোমলতা, মধুরতা, রমণীয়তা ইহার কিছুই অনুভূত হয় না।

পরমেশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক ভাবগুলি রক্ষা করিয়া

কার্য্য করা স্ত্রীগণের একান্ত কর্ত্তব্য। পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীদিগেরও জ্ঞান ও ধর্ম্মে অধিকার আছে। তাঁহারাও অমৃত আত্মা লইয়া আসিয়াছেন, চিরকাল তাহার উন্নতি সাধন করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতিতে বিনয় ও লজ্জা, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা, স্নেহ ও মমতা যেন বিরাজ করিতে থাকে। আমরা পিতা অপেক্ষা মাতা, ভ্রাতা অপেক্ষা ভগিনী, পতি অপেক্ষা পত্নী, পুত্র অপেক্ষা দুহিতাকে সমধিক প্রীতির আধার বলিয়া বোধ করি। কিন্তু সেই আধারগুলি যদি প্রীতি বিহীন হয়, তবে আর তাহাদের মর্য্যাদা কি থাকে?

প্রত্যেক রমণী যদি আপনাকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, তাহা হইলে সংসারে আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। যে স্ত্রী পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী, সন্তানগণের প্রতি স্নেহান্বিতা, দাস ও দাসীগণের প্রতি কৃপাবতী, সেই গৃহলক্ষ্মী। যে স্ত্রী পরদুঃখ শ্রবণ করিলে অশ্রুবর্ষণ করে, পরের ক্লেশ মোচনের জন্য আপনার অর্থ ও অলঙ্কার অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে সেই যথার্থ স্ত্রী। যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা, পরিমিত ব্যয়শীলা, "ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম সাধিকা হয়েন;" তিনিই গৃহলক্ষ্মী। যে স্ত্রী জ্ঞান দ্বারা আপনার বুদ্ধিকে

মার্জ্জিত করেন, সুশীলতা দ্বারা প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করেন, এবং সর্ব্বদা সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন, তিনিই যথার্থ স্ত্রী। ধর্ম্ম যাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য, সত্য যাঁহার প্রাণ, প্রিয়বাক্য যাঁহার অস্ত্র এবং সতীত্ব যাঁহার অঙ্গের আভরণ তিনিই যথার্থ স্ত্রী। যিনি আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুঃস্থ পরিবার ও দীন হীন মানবগণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন, যিনি সম্পদের সময়ে উন্মত্ত এবং বিপদের সময়ে অবসন্ন না হইয়া স্থিরচিত্তে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, যিনি অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সৎপথের অনুসরণ করেন, তিনিই যথার্থ স্ত্রী এবং তিনিই যথার্থ গৃহলক্ষ্মী।

বামাগণ আপনাদিগের ঈশ্বর প্রদত্ত কমনীয় প্রকৃতি রক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষা, জ্ঞানবতী ও ধর্ম্মশীলা হইলে যেরূপ গৃহলক্ষ্মী বলিয়া আদরণীয়া হইতে পারেন, কেবল শরীরের সৌন্দর্য্যে সেরূপ কখনই হইতে পারেন না। অনেক রমণীর আকৃতি অতি সুন্দর কিন্তু প্রকৃতি যার পর নাই কুৎসিত দেখা যায়। অনেকের আকৃতি যত সুন্দর হউক না হউক প্রকৃতি অতি জঘন্য। তাঁহারা গর্ব্বিত স্বভাবা, কটুভাষিণী, চঞ্চলা ও অসন্তুষ্টা। তাঁহারা স্বামীর প্রতি প্রীতিশূন্যা, সন্তানের প্রতি

নির্ম্মমা এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মগুণে বিবর্জ্জিতা। পরনিন্দা, পরহিংসা, কলহ ও বিবাদেই তাঁহাদিগের অতিশয় আমোদ। এরূপ নারীগণ অলক্ষ্মীর জীবন্ত মূর্ত্তি। তাঁহারা যে গৃহে প্রবেশ করেন সে গৃহ হইতে শৃঙ্খলা ও শান্তি পলায়ন করে এবং তাহা অবিশ্রান্ত বিবাদ ও অসুখের আস্পদ হইয়া উঠে। সেখানে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ও পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ হয়, সেখানে আত্মীয় কুটম্বগণের সহিত দর্শন ও সম্ভাষণ উঠিয়া যায়, সেখানে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতে থাকে, পরিবার ঋণগ্রস্ত হয় এবং অবশেষে তাহাদিগের দিনান্তে এক মুষ্টি অন্নলাভ করাও দুর্ঘট হইয়া উঠে। দুষ্টা স্ত্রী আপনারে পাপে নিক্ষেপ করে, নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক দেয় এবং সন্তানগণকেও কুপথগামী করে। তাহাদিগকে মনুষ্য আকারে রাক্ষসী বা কালসর্পিণী বলা যায়।

পরিবারের সুখ, যেমন হিন্দুদিগের এমত আর কোন জাতিরই নাই। ইহাঁরা বন্ধুগোষ্ঠী কুটুম্ব একত্রিত হইয়া পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া অতি স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করেন। স্ত্রীগণ সুশীলা হইলে এই স্বাচ্ছন্দ্য শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তাহাদিগের দোষেই আবার অমৃতের স্থানে বিষ উৎপন্ন হয়। এমন কি শ্বশ্রূ ও বধূ, মাতা ও কন্যা, যাতা ও যাতার মধ্যে বিষম কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। তাহাতে অনেক

গৃহ উৎসন্ন হইয়া যায়। এরূপ স্থলে পরস্পারে পৃথক হওয়া শ্রেয়স্কর।

এক্ষণে এদেশের স্ত্রী লোকদিগকে উন্নত ও সভ্য করিবার জন্য অনেকের প্রয়াস হইয়াছে, বামাগণ নিজে নিজেও তাহার জন্য উৎসুক হইতেছেন। ইহা যার পর নাই আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু পাছে স্ত্রীগণ কেবল বাহ্য সুখে বিমুগ্ধ হইয়া প্রকৃতগুণ বিহীন হন, সেই জন্য সর্ব্বদাই আমাদিগের আশঙ্কা হইয়া থাকে। হিন্দু রমণীগণকে যে ঠিক বিলাতী বিবির মত করিতে পারিলেই তাহাদের উন্নতির একশেষ হয়, এরূপ মত উদ্ধত ও চঞ্চলচিত্ত বালকের মত। তাহাতে স্ত্রীগণ স্বাধীন না হইয়া কেবল স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠে। স্বেচ্ছাচার হইতে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। যাঁহারা অবলাগণের মন জ্ঞান ও ধর্ম্মে প্রথমে দৃঢ়ীকৃত না করিয়া তাহাদিগের বাহ্যিক চাকচিক্য ও বাহ্যিক সভ্যতা দর্শন করিতে চান, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কবরের যেমন বাহিরে সুন্দর ইষ্টক ও প্রস্তর গঠিত স্তম্ভ থাকে, কিন্তু ভিতরে দুর্গন্ধময় গলিত, মৃতদেহ। নারীগণের সেইরূপ বাহিরে দিব্য বেশ ভূষা কিন্তু অন্তর অজ্ঞানতা পাপ ও মলিনতা সঞ্চিত থাকিলে নিতান্ত ঘৃণাজনক হইবে। তাঁহাদের অন্তরে সার না জন্মিলে বাহ্যিক উন্নতি কেবল উপহাসকর হইবে। বিশেষতঃ স্ত্রীগন নামেই অবলা,

তাহারা বিপদ ও প্রলোভনে হঠাৎ জড়িত হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে সবল না করিয়া আশঙ্কার স্থলে নিক্ষেপ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। এই জন্য অনেক সভ্য-জাতি মধ্যে নারীদিগের স্বেচ্ছাচার হেতু বহুল পাপ স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। রমণীগণ সর্ব্বগুণে গুণবতী হইলে, তাঁহাদিগের বাহ্যিক উন্নতির জন্য অধিক ভাবিতে হইবে না, তাহা আপনা হইতেই সম্পন্ন হইবে। আমাদের দেশের রমণীগণের নম্রতা, দয়া, পতিভক্তি প্রভৃতি অনেকগুলি প্রশংসনীয় গুণ আছে। তাঁহাদের সেগুলি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তবে তাঁহারা আপনাদের দোষ ভাগ সংশোধন করুন এবং ধীরতার সহিত আপনাদিগের উন্নতি করিতে থাকুন।

সত্যবতী ও সুকুমারীর কথোপকথন।

সত্যবতী। সুকুমারী তোমার সঙ্গে অনেক দিন পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হয় নি, তা, আজ দেখা হয়ে ভাল হল।

সুকুমারী। এতদিন ব্যারামের জন্যে আসতে পারিনি। আমারও বড় ইচ্ছে যে তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় দিন কাটাই।

সত্য। আচ্ছা সুকুমারি! সর্ব্বদা কোন্ বিষয়ে আলাপ কর্ত্তে তোমার ইচ্ছা হয়?

সুকু। যে সকল আলাপে আমোদ হয় সেই সকল বিষয়ের আলাপ কত্তে বড়ই ইচ্ছা হয়?

সত্য। তোমার এ রকম মন ভাল নয়। মিথ্যা মিথ্যা আমোদ করে দিন কাটালে পাপ হয়। যারা আমোদ প্রমোদ করে দিন কাটাতে চায় তারা বড় বোকা; তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারে।

সুকু। কেন সকলেই ত এই রকম করে, তবে এতে দোষ কি?

সত্য। সকলে মন্দ কর্ম্ম কচ্ছে বলে যে আমাকেও মন্দকর্ম্ম কর্ত্তে হবে, তা নয়। আচ্ছা তুমিই বিবেচনা করে দেখ এরূপ করা মন্দ কি না? একেতো আমাদের ঘরকন্নার কাজ কর্ত্তেই সকল সময় যায়। তাতে যদি কিছু সময় পাওয়া যায় তবে সে সময় টুকুকে কি বৃথা কাটান উচিত? যদি এই রকম করে সকল সময় কাটাই তবে ধর্ম্মকর্ম্ম কখন কর্ব্বো।

সুকু। ধর্ম্ম কর্ম্ম কি সারা দিনই কর্ত্তে হবে? এখনও ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ব্বার বয়েস হয়নি।

সত্য। সর্ব্বদাই ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তে হবে। মনুষ্যের কেবল ধর্ম্মই কর্ম্ম, মনুষ্য ধর্ম্মের জন্যে জন্মেছে. মনুষ্যকে সর্ব্বদাই ধর্ম্মপথে চলিতে হবে, যে সর্ব্বদাই ধর্ম্মপথে না

চলে তার মরণই ভাল। ধর্ম্মের চেয়ে আদরের দ্রব্য আর কিছুই নাই। স্বামী পুত্র পিতা মাতা ভাই বন্ধু মরে গেলে কারই সঙ্গে সম্বন্ধ থাক্‌বে না, তখন কেবল এক ধর্ম্মই সঙ্গের সঙ্গী হবেন। এখন ভাল করে বুঝে দেখ দেখি, যে সকল বিষয়ের সঙ্গে অল্পকাল সম্বন্ধ সেই সকল বিষয় লইয়া থাকা ভাল, না, যাঁর সঙ্গে চির-দিনের সম্পর্ক সেই ধর্ম্মকে নিয়ে সারাদিন কাটান ভাল? সুকুমারি! বল্‌তে কি, কেও কারও নয়, কেবল ধর্ম্মই আপনার।

সুকু। তোমার কথাতে, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু কাকে ধর্ম্ম বলে কি কর্‌লে ধর্ম্মপথে চলা যায় তা কিছুই জানিনে, ছেলে বেলা থেকে কেবল আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিয়েছি, এখন আমার বড়ই কষ্ট বোধ হচ্ছে। তুমি যদি কিছু কিছু উপদেশ দাও তাহলে বড়ই ভাল হয়।

সত্য। আমি নিজেই ধর্ম্মবিষয় ভাল জানিনে, তা তোমাকে কি উপদেশ দিব, তবে যা কিছু জানি, তা বলি, মন দিয়ে শোন। যদি ধর্ম্মপথে চল্‌তে হয়, তবে আগে ঈশ্বরে দৃঢ় করে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে। এই যে সমুদায় জ-গৎ দেখ্‌ছ, পূর্ব্বে এ সকল কিছুই ছিল না, পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সূর্য্যকে উত্তাপ ও আলো দিবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্রকে

শীতল কিরণ দিবার জন্য ও রাত্রিতে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, এবং আর সকল নক্ষত্রদিগকেও এইরূপ কিরণ দিবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি জল, বায়ু, অগ্নির সৃষ্টি করে প্রাণিগণের জীবন ধারণের উপায় করে দিয়েছেন এবং জীবদিগকে ক্ষুধা দিয়া তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই শিশুদিগকে গর্ব্ভ মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া দেন। রোগীদিগকে আরোগ্য করিবার জন্য, তিনিই ঔষধের সৃষ্টি করেছেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় পরমেশ্বর সকল স্থানেই আছেন, তিনি, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় নক্ষত্রে আছেন, এই পৃথিবীতে আছেন, আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আছেন। তিনি নিরাকার, জড় বস্তুর ন্যায় তাঁহাকে দেখা যায় না; তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা দেখিতে হয়। তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার কোন রিপুও নাই ইন্দ্রিয়ও নাই। তিনি পবিত্র স্বরূপ, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অনন্তস্বরূপ কেহ তাঁহার সীমা করিতে পারে না। মঙ্গলময় পবিত্র স্বরূপ সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বর সর্ব্বদাই আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তিনি আমাদিগের অন্তরতম প্রিয়তম বন্ধু, তিনি ভিন্ন আর কেহই আমাদিগের চিরবন্ধু নাই। তিনিই আমাদিগের একমাত্র

সম্পদ্। যাহারা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে তাহাদের অপেক্ষা দীন হীন আর কেহই নাই। পিতা মাতা হীন বালকের যেরূপ দুর্দ্দশা তাহা অপেক্ষাও তাহাদিগকে অধিক দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। যাহারা ঈশ্বরকে পূজা না করিয়া সৃষ্ট পদার্থের পূজা করে, তাহারা পিতা মাতাহীন বালকের ন্যায় দুর্দ্দশা হইতে দুর্দ্দশাতে গমন করে। সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, আনন্দময় পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে মনুষ্য জন্মই বৃথা। যদি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করা সফল করিতে ইচ্ছা হয়, তবে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস কর, তাঁহাকে প্রীতি কর এবং তাঁহার মহৎ আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

সুকু। আমার মনের মধ্যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। আমি যে কত পাপ করেছি তা কিছুই বল্‌তে পারি না, আমি এতদিন সেই পরম পিতাকে ভুলে ছিলাম। যিনি সর্ব্বদাই আমাকে দয়া কর্চ্চেন, এক পলের জন্যেও আমাকে ভুলেন না, কোন্ প্রাণে এত দিন তাঁকে ভুলে ছিলাম। সত্য! তুমি আজ আমাকে উপদেশ দিয়ে যে উপকার কর্লে, তা আমি কখনই ভুল্‌তে পারবো না, এর জন্যে যে তোমাকে কি দিব, তা কিছুই স্থির কর্ত্তে পার্চ্ছিনে। আজ থেকে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকলাম তুমি যদি প্রাণ চাও তাও আমি অনায়াসে দিতে পারি।

সত্য! বল্‌তেকি আজ আমার শুভদিন, আজ কি সুলগ্ন ক্ষণে যে তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিলাম তা বল্‌তে পারিনে। এখন কিরূপ উপায়ে ঈশ্বরের দর্শন পাব, তা বলে আমার দুঃখ দূর কর।

সত্য। সুকুমারি! এত শীঘ্র যে তোমার মনের ভাব এমন ভাল হবে তা আমি কিছুই জানি না। তোমার এ রকম ভাব দেখে আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। তুমি কি এর আগে আর কারও কাছে উপদেশ পেয়েছিলে?

সুকু। কৈ আর কেওতো আমাকে উপদেশ দেয়নি। আজ তোমার কাছে এই কয়েকটি কথা শুনে আমার মন যেন কেমন হয়ে গেল। আমার বোধ হচ্ছে, তোমার কথা যে শুনে তারই এই রকম হয়।

সত্য। তা প্রায় হয় না, পাড়ার আর কত লোককে এইরূপ উপদেশ দিয়েছি, তাতে তো কিছুই ফল হয়নি। তায় আজ তোমার এরূপ ভাব দেখে আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। ঈশ্বর করুন তোমার এই ভাব যেন চির দিন থাকে।

সুকু। এখন আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়েছে, কেমন করে ঈশ্বরকে অন্তরে নিয়ে আস্‌বো তায় আমার একমাত্র চিন্তা হয়েছে। সত্য! তুমি যদি এখন কোন উপায় বলে দিতে পার, তা হলে বড় ভাল হয়।

সত্য। সুকুমারি! তোমার কথা শুনে আমারই কান্না পাচ্ছে। আহা! যারা ঈশ্বরকে দেখ্‌বার ব্যাকুল না হয়, তাদের কথা মনে কর্ত্তে গেলে কার বুক না ফেটে যায়? তারা অনাথের ন্যায় কেবল সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে তাদের মাতা, কে তাদের পিতা, তা তারা কিছুই জানে না। তাদের কি কঠিন প্রাণ! ভুলেও একবারও জগতের পিতামাতার স্নেহের কোলে যেতে চায় না, আহা! ঈশ্বরের কি অপার করুণা যে তাঁকে দেখ্‌তে চায় না, শুন্‌তে চায় না, তাকেও তিনি স্নেহভরে কোলে নিবার জন্যে সর্ব্বদাই তার কাছে রয়েছেন। সে যদি একবার পাপশূন্যহৃদয়ে একাগ্রচিত্তে ব্যাকুলতার সহিত তাঁকে পিতা বলে ডাকে, দয়াময় পিতা অমনি তাকে কোলে নিয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

সুকু। সত্য! যারা পাপ করে, তারা কি ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পায় না! তারা কি চিরকালই অনাথ থাকে?

সত্য। মানুষ যতক্ষণ পাপী থাকে ততক্ষণ সে ঈশ্বকে দেখ্‌তে পায় না। পাপের দ্বারা সে অন্ধ হয়ে থাকে, সুতরাং কেমন করে তাঁর দেখা পাবে।

সুকু। আমিতো অনেক পাপ করেছি, তবে কি আমি ঈশ্বরের দর্শন পাব না?

সত্য। তুমি সেই সকল পাপের জন্যে অনুতাপ কর এবং ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন কর তিনি তোমাকে দেখা

দিবেন. তাঁর সমান দয়া আর কারও নাই তিনিই জগতের দয়াবান্ পিতা ও ন্যায়বান্ রাজা।

সুরু। আমি যদি আর পাপ না করি; তবে ঈশ্বরের দর্শন পাব ?

সত্য। যদি পাপ নাকর. এবং তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে ব্যাকুল হও অবশ্যই তিনি তোমাকে দর্শন দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তোমার মনের একাগ্রতা থাক্‌বে ততক্ষণই ঈশ্বরের দেখা পাবে। মন যদি ঈশ্বরের দিকে না গিয়া সংসারের দিকে যায় তবে সংসারকে দেখিতে পাইবে. ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেনা। এই একাগ্রতার ভাব যদি বুঝে না থাক তবে সংক্ষেপে বুঝায়ে দি শোন। তুমি যখন কোন বস্তু দেখ, তখন তোমার চক্ষু সেই বস্তুর দিকে থাকে, যদি অন্য দিকে তাকাও তবে আর সে বস্তুটি দেখতে পাও না। সেইরূপ তোমার জ্ঞানচক্ষু যতক্ষণ ঈশ্বরের দিকে একভাবে স্থির হয়ে থাকবে ততক্ষণই তুমি ঈশ্বরকে দর্শন কর্ত্তে পারবে। যাহার মন সর্ব্বদা বিষয় বিষয় সংসার সংসার করে ব্যস্ত থাকে, তাহার জ্ঞানচক্ষু ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য কখনই স্থির থাকে না, সুতরাং সে কেবল সংসারেরই বিষয় বিভব দর্শন করে, ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে না। অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান থাকিবে. তোমার মন যেন ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্যদিকে না যায়। তুমি যেখানে থাক না কেন. যে কর্ম্ম

কর না কেন, তোমার চক্ষু কেবল ঈশ্বরেরই দিকে স্থির রাখিবে তা হলেই তোমার আশাপুর্ণ হইবে। সুকুমারি! ঈশ্বর তোমার হৃদয়মণি, যদি বহু কষ্টে সেই মণিকে হৃদয়ে আন্‌তে পার তবে তুমি চিরকালই সুখে থাকবে, তোমার সুখের দিন কখনই গত হবে না। সেই অমূল্য রত্ন যার নিকট থাকে তার কিসের অভাব। যে এক বার সেই উজ্জ্বল মণিকে হৃদয়ে দেখেছে, সেই অমূল্য মণি ভিন্ন সে আর কিছুই দেখ্‌তে চায়না। এমন যে অমূল্য মণি তা তুমি হৃদয়ে গেঁথে রেখ। সেই অমূল্য রত্ন হতে তোমাকে বঞ্চিত কর্‌বার জন্য সংসারের পাপচোরেরা তোমাকে কতমতে প্রলোভন দেখাবে, তুমি যদি সাবধান না থাক তবে এমন উপায়ে তোমাকে সেই ধনহতে বঞ্চিত করিবে যে তা তুমি জান্‌তেও পারবে না। এই অমূল্য মণি পাবার জন্যে মনুষ্যসকল পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। যে এই অমূল্য ধন লাভ কর্ত্তে না পারে তার জন্মগ্রহণই বৃথা। সুকুমারি! এখন যেমন তোমার মনের ভাব হয়েছে এই ভাবই যেন চিরকাল থাকে, তোমার জন্মগ্রহণ যেন বৃথা না হয়।

সুকু। সত্য! তোমার উপদেশ গুলি বড়ই আশ্চর্য্য। আমার বোধ হয় হাজার হাজার বই পড়ার চেয়ে তোমার উপদেশ শুন্‌লে অত্যন্ত উপকার হয়। কেবল যে বই পড়িলেই ধার্ম্মিক হয়, একথা কোন কাজের নয়,

তাহলে আমাদের পাড়ার বড় বড় পণ্ডিতেরা নাস্তিক অধার্ম্মিক হোত না। তুমি যদিও লেখাপড়া ভাল জান না, কিন্তু লেখাপড়া জেনে যা হয় তার চেয়ে লক্ষগুণে তোমার জ্ঞান হয়েছে। আজ তোমার কাছে এসে আমার প্রাণ মন সব শীতল হোল। তোমার উপদেশের মত যদি কাজ কর্ত্তে পারি, তবে আমার অন্তরের জ্বালা দূর হবে। সত্য! আজ আমি বাড়ী যাই বাড়ী গিয়ে যেন তোমার উপদেশ গুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

সত্য। আচ্ছা আজ এস। কাল যেন আবার দেখা হয়। তোমার যে রকম মন হয়েছে, ঈশ্বর অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

গৃহকার্য্য।

স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ।

পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষজাতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার জগতের কি অনুপম শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ উভয়জাতির মনোবৃত্তি সকল ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে যে ঐ উভয় জাতি পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে, ধর্ম্মের পথে ও উন্নতির পথে লইয়া যাইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষ পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই স্ব স্ব উন্নতি সাধনে যত্নবান থাকিবে, কারণ যে কোন প্রকারে হউক মনের উন্নতি সাধন করাই কর্ত্তব্য ও যুক্তি সঙ্গত। বাহ্যাড়ম্বর বা কোন প্রকার ক্ষণস্থায়ী নীচ আমোদের সহিত বিবাহের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। বিবাহের সম্বন্ধ অতি পবিত্র সম্বন্ধ। এই হেতু স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ কোন্ প্রকার অস্থায়ী সাংসারিক সম্বন্ধ নহে। তাহাদিগের সম্বন্ধ পরম বিশুদ্ধ সম্বন্ধ।

এদেশের কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ লোকেরা স্ত্রী ও স্বামীর যথার্থ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া আপন আপন ইচ্ছামত নানা প্রকার কারণ কল্পনা করিয়া লয়। অনেক অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, স্ত্রীরা কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই এই অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলেন স্ত্রীরা কেবল দাসীর ন্যায় দিনরাত্রি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। হায়! তাহাদিগের কত ভ্রম! তাহারা যথার্থ সম্বন্ধ নিজে বুঝিতে অক্ষম হইয়া পরম পবিত্র সম্বন্ধকে অস্থায়ী সাংসারিক সুখের মধ্যে গণনা করিয়া লয়।

স্ত্রীর আর একটি নাম সহধর্ম্মিণী; স্ত্রী ও স্বামী এক সঙ্গে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে ইহাই তাহাদিগের যথার্থ সম্বন্ধ। পরস্পর পরস্পরের আত্মার অভাব মোচনের উপায় সকল অন্বেষণ করিবেন; এক সঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা এক সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা, এক সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান, এক সঙ্গে শয়ন, এক সঙ্গে ভোজন, এক সঙ্গে অধ্যয়ন ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

স্ত্রীরা উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়, স্বামীকে

আচার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে; অধ্যয়ন ও ধর্ম্মোপদেশের সময়, ছাত্রগণের ন্যায় নম্র ও বিনীত হইয়া নীতিগর্ভ উপদেশ সকল সাদরে গ্রহণ করিবে; গৃহকার্য্যানুষ্ঠানের সময় বন্ধুর ন্যায় প্রীতি করিবে; বিপদুদ্ধারের সময় উপকৃত ব্যক্তির ন্যায় কৃতজ্ঞ হইবে। এই সংসারের মধ্যে স্বামীরাই স্ত্রীগণের একমাত্র অবলম্বন। স্ত্রীরা সর্ব্বদা স্বামীদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে আত্মাকে উন্নত করিতে যত্নশীলা হইবে।

স্ত্রীরা স্বামীদিগের উৎসাহ, বল কর্ম্মদক্ষতা, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিয়া আত্মাকে উৎসাহী, বলীয়ান, কর্ম্মদক্ষ, অধ্যবসায়ী করিবে এবং স্বামীরাও, স্ত্রীগণের কোমলতা, বিনয় লজ্জা, মধুরতা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, অনুনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিয়া আপনাদিগের আত্মাকে কোমল, বিনয়ী, সলজ্জ, মধুর, প্রীতিপূর্ণ, দয়ালু, স্নেহান্বিত, সানুনয় করিতে যত্নশীল থাকিবেন।

স্ত্রীরা বিনয়ী হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামীর হিতের নিমিত্ত গৃহকার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিবে এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গের, সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য তাঁহার শরীর ও আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে কায়মনে যত্ন করিবে। আবার স্বামীরাও

তাহাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। এই প্রকারে বিশুদ্ধ সম্বন্ধে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

সময়।

সময় অমূল্য ধন। জীবনের যত কর্ম্ম আছে, সকল কর্ম্মই সময়ের উপর নির্ভর করে; এজন্য অতি সাবধান হইয়া সময় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। একটু মাত্র সময় বৃথা নষ্ট হইলে সে সময় আর পুনরায় পাওয়া যায় না।

যতই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আমাদের জীবনের সময় গত হইতেছে, ততই আমরা মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি। কাহার কবে মৃত্যু হইবে কেহই বলিতে পারে না। অদ্য যিনি প্রশস্ত অট্টালিকোপরি বাস করিয়া সুখাদ্য দ্রব্য সকল ভোজন করিতেছেন, হয়ত কল্য আবার মৃত্যু তাঁহাকে তাঁহার প্রাণসম-প্রিয় ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়া ধূলায় শায়িত করিতেছে। অদ্য যিনি যৌবনমদে মত্ত হইয়া ভয়ানক কুক্রিয়া সকল সম্পান্ন করিতেছেন, তিনি হয় ত এই মুহূর্ত্তেই সকল অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতেছেন। কত পতিপ্রাণা-রমণী

পতিবিচ্ছেদে হাহাকার ধ্বনি করিয়া শিরে করাঘাত করিতেছে। কত পুত্র-প্রাণা মাতা প্রাণসম প্রিয়তম পূর্ণযৌবন পুত্রকে হারাইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া ধূসরিত হইতেছে। কত দুঃখিনী মাতা পুত্রশোকে পাগলিনীর ন্যায় হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব মৃত্যু কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না, একে একে সকলকে আক্রমণ করিবেই করিবে। এই হেতু যত দিন এই অবনী-ধামে বিচরণ করিতে হয়, তত দিন যেন আমরা অসৎকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ না করিয়া সৎকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ করি। পূর্ব্বকালে এবং এখন যে সকল মহাপুরুষদিগের নাম শ্রবণ করা যায়, তাঁহারা কেবল সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই স্বীয় স্বীয় নাম জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন, অতএব তোমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে আর অবহেলা করিও না, যিনি যতই সময়ের সদ্ব্যবহার করিবেন, তিনি দিন দিন পাপপথ হইতে বিরত থাকিয়া ততই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ সময় অবহেলা করিয়া বৃথা নষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা প্রায় কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করিয়া সময় ক্ষেপণ করে না। যে কর্ম্ম এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই কর্ম্ম করিতে তাহারা প্রায় ৩। ৪ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করে। যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে এক

দিনের অধিক লাগে না, সেই সকল কর্ম্ম করিতে তাহারা প্রায় ৪।৫ দিন ক্রমাগত নিক্ষেপ করে। প্রাতঃকাল হইতে নিদ্রা পর্য্যন্ত তাহারা প্রায় সৎকর্ম্ম করে না। কেবল ৪।৫ ঘন্টা কাল সাংসারিক আবশ্যক কর্ম্ম সকল সমাধা করিয়া সমস্ত সময়, গল্প, খেলা ও নিদ্রায় যাপন করে। এই প্রকারে এদেশস্থ অধিকাংশ স্ত্রীলোক বৃথা সময় নষ্ট করিয়া আপনাকে পাপে জড়ীভূত করিতেছে। যে মনুষ্য যত সময় বৃথা নষ্ট করেন তিনি তত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হন। "সময় আর জীবনে কোন ভেদ নাই, ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু সময় লইয়াই আমাদিগের জীবন। যতটুকু সময় ভালরূপ ক্ষেপণ করা যায় তত টুকু আমাদের জীবন, আর যতটুকু আলস্য বা মন্দ কর্ম্মে অতিবাহিত করা যায় ততটুকু মৃত্যুর প্রতিরূপ মাত্র। যিনি একশত বৎসর জীবিত থাকিয়া কেবল পাঁচবৎসর মাত্র সৎকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ করেন, তাঁহার আয়ু পাঁচবৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; অতএব সময়কে নষ্ট করা একপ্রকার প্রাণকে আঘাত করা হয় জানিবে।"

কি প্রকারে সময় ক্ষেপণ করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার হয় তাহার বিষয় লেখা যাইতেছে, এই লেখনানুসারে সময় ক্ষেপণ করিলে সময় কখনই বৃথা নষ্ট হইতে পারে না।

——নিদ্রা হইতে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্ব প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিবে; এবং তৎপরে, যে পরম পিতার প্রসাদে গতরাত্রি নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে, সেই পরম পিতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। তৎপরে কিছুক্ষণ নূতন পাঠ অভ্যাস করিয়া সাংসারিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে, এবং সাংসারিক কার্য্য ও স্নান ভোজন সমাপন করিয়া দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নিদ্রা গল্প ও খেলায় সময় নষ্ট না করিয়া পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিবে। প্রথমে পুরাতন পাঠ আবৃত্তি করিয়া নূতন পাঠ অভ্যাস করিবে। মধ্যাহ্ন সময়ে লেখা অভ্যাস করিবে, অঙ্ক কসিবে এবং কারপেট, ফুল, জামাসেলাই ইত্যাদি সূচীর কার্য্য করিবে এবং মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রামও করিবে। আবার অপরাহ্ন উপস্থিত হইলে সাংসারিক কার্য্য ও আহার বিহার করিয়া সন্ধ্যার পর পুনরায় পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দিবে এবং পাঠাভ্যাস হইলে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যে জগৎপিতার আশ্রয়ে থাকিয়া সমস্ত দিন স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলে যাঁহার কৃপায় সমস্ত দিন বিবিধ সুখ সম্ভোগ করিলে, সেই পরম পিতার প্রতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে এবং পাপের জন্য অনু-

তাপিতচিত্তে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে, যাহাতে সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পার। তৎপরে যথাকালে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবে।—

এই প্রকার করিয়া প্রাতঃকাল হইতে নিদ্রা পর্য্যন্ত সময় ক্ষেপণ করিলে তোমরা পাপ হইতে বিরত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

বিদ্যাসুন্দর, কামিনীকুমার, রসিকরঞ্জন ইত্যাদি কুৎসিত পুস্তক পাঠ করিয়া বা কুলোকের সহবাসে থাকিয়া কুকর্ম্মে সময় নষ্ট করত আপনাকে কলঙ্কিত ও পাপে পতিত করিবে না। সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে ও সদালাপে সময় অতিবাহিত করিবে।

অর্থ ব্যয়।

আমাদের সকলেরই পক্ষে অর্থ অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু। অর্থ দ্বারা মনুষ্যের মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ হইতে পারে। অর্থ দ্বারা কত দীন দুঃখিদিগকে দরিদ্রাবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়। অর্থ দ্বারা বিপন্নব্যক্তির বিপদুদ্ধার করা যাইতে পারে। অর্থ দ্বারা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করিয়া বালক-বৃন্দের বিদ্যোন্নতি সাধনে সক্ষম হওয়া

যায়। অর্থ দ্বারা চিকিৎসালয়, ও অতিথিশালা স্থাপন ইত্যাদি নানা প্রকার দেশ-হিতকর-কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থ দ্বারা সকল প্রকার সৎকার্য্য সাধন ও সকল প্রকার দুঃখ দূর করা যাইতে পারে। দারিদ্রদুঃখ নিবারিণী-সভা, বাষ্পীয় শকট, অর্ণবযান, সেতু, বিদ্যালয় ইত্যাদি সকল প্রকার মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে অর্থই কেবল আবশ্যক। অর্থ ব্যতীত ঐরূপ কোন প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। অর্থ আমাদের জীবন ধারণের এক প্রধান উপায়। অর্থ ব্যতীত আমাদিগের জীবন ধারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অর্থ যে এত উপকারী, তথাপি অজ্ঞান লোকদিগের দ্বারা ইহার কুব্যবহার হওয়াতে ইহা মহানিষ্টের মূল হইয়া উঠিয়াছে। কত পাষণ্ড কেবল এক মাত্র অর্থের জন্য প্রাণসম-প্রিয়তম-ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। কত নিষ্ঠুর পামর এই অর্থের জন্য কত লোকের মস্তক চ্ছেদন করিয়া পাপে জড়ীভূত হইতেছে। কত কৃপাপাত্র একমাত্র অর্থ বিহীন বলিয়া আপনাকে সামান্য মনে করত সর্ব্বসুখবিধানকর্ত্তাকে নিন্দা করিতেছে। কত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি মদ্যপান ও ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইয়া অর্থকে অতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য কার্য্যে ব্যয় করিতেছে।

অর্থ আমাদের অতিশয় প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু বটে, কিন্তু মনুষ্য সকল যেমন অর্থকে পৃথিবীর এক মাত্র সার ধন ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, সেরূপ করা মূর্খতা মাত্র। অর্থ অপেক্ষাও মনুষ্যদিগের সার ধন ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে। সেই সার ধনের সহিত অর্থের কোন মতে তুলনা করা যাইতে পারে না, তাহার সহিত তুলনা করিলে অর্থ কিছুই নয় বলিয়া প্রতীত হইবে। মূর্খ ও দাসলোকেরাই অর্থকে পৃথিবীর সার ধন মনে করে। কিন্তু জ্ঞানবান্ সাধুরা অর্থকে অতি সামান্য মৃন্ময় পদার্থ মনে করিয়া যথার্থ যাহা সার তাহাই সারধন বলিয়া জানেন।

এই পৃথিবীতে বা পরলোকেই হউক অর্থ বা বিদ্যা মনুষ্যের কখনই সার ধন ও শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতে পারে না, অনেক অর্থগৃধ্নু ও অর্থ-পিশাচ অর্থকে ও বিদ্যার্থী বিদ্যাকেই পৃথিবীর সার ধন বলিয়া মনে করে, কিন্তু অর্থ ও বিদ্যা কেহই সার ধন নহে। ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যের একমাত্র সার ধন, কি অর্থ কি বিদ্যা কিছুরই ধর্ম্মের সহিত তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম চিরস্থায়ী, অর্থ ও বিদ্যা ক্ষণস্থায়ী; ধর্ম্ম মনুষ্যের পরকালের সহায়, অর্থ ও বিদ্যা কেবল এই পৃথিবীর ধন; ধর্ম্ম মনুষ্যকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়, অর্থ ও বিদ্যা কেবল সামান্য মনুষ্যের নিকট লইয়া যাইতে পারে;

ধার্ম্মিক হইলে ঈশ্বরের নিকট আদরণীয় হয়, ধনী ও বিদ্বান্ হইলে মনুষ্যদিগের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। সে বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যাই নয়, যে বিদ্যা দ্বারা ধর্ম্মের পথ জানা যায় না, সে অর্থ অর্থই নহে, যে অর্থ দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান না হয়। "ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিবেক ও তাঁহার আদেশানুসারে তাহা ব্যয় করিবে। স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থ ব্যয় করিবে না, ইহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতিসাধন চান। সাংসারিক প্রয়োজন ব্যয় সমাধা করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে তাহার ষষ্ঠাংশ ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য প্রদান করিবে।"

অনেকে এরূপ মনে করেন যে, অর্থ ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না, এমন কি ধর্ম্মই হইতে পারে না। হায়! তাহাদিগের কি ভ্রম, ধর্ম্ম কখনই অর্থ সাপেক্ষ নহে, কিন্তু অর্থ কেবল ধর্ম্মেরই জন্য। যথার্থ ধর্ম্মের জন্য কত লোক বাড়ীর গুরুজনদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন, কত সাধু ধর্ম্মের আদেশ পালন করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সাহসের সহিত ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন। কত লোক পিতা মাতা ও বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়াও হৃষ্টচিত্তে দিন দিন

ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতেছেন। কত পুণ্যাত্মা ঋষি নির্জ্জন বনে গমন করিয়া কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া ঈশ্বরের পূজাতেই রত ছিলেন। কত সাধু ধর্ম্মের উদ্দেশে ধন মান পরিত্যাগ করিয়া দেশ বিদেশ সকল পর্য্যটন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছেন, ইত্যাদি নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে অর্থ ব্যতীত ধর্ম্ম অনায়াসে সংসিদ্ধ হইতেপারে, অর্থের সহিত ধর্ম্মের কিছু যোগ নাই। ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু ও অর্থ বাহিরের বস্তু। আলোক ও অন্ধকার, স্বর্গ ও নরক, পাপ ও পুণ্যে যেমন প্রভেদ ধর্ম্ম ও অর্থতে ঠিক সেই রূপ প্রভেদ। দরিদ্র ব্যক্তিকে বা কোন হিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থ দান করিলেই যে ধর্ম্ম হইল এরূপ নহে। যিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধার সহিত একটী মাত্র পয়সা কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করেন তিনি যে মানাকাঙ্ক্ষার সহিত এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয় দেখেন, তিনি কোন বাহিরের কার্য্য দেখেন না।

উপযুক্ত পাত্রে ও অবস্থানুসারে অর্থ ব্যয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই কৃপণ ও মিথ্যা বিষয়ে অর্থ ব্যয় করে। তাহারা নানা প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ

নিঃশেষিত করে। তাহারা গণক, দৈবজ্ঞ, রোজা প্রভৃতি অর্থলোলুপ ব্যক্তিকে অর্থ দান করা আপনাদের হিতকর কার্য্য মনে করিয়া প্রচুর অর্থ দান করে। আবার কত পুরুষ পুত্রের বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও পিতা মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচুর অর্থ নিঃশেষিত করিয়া অবশেষে দীনভাবে কালযাপন করে। কেহ কেহ স্বার্থপরতার দাস হইয়া স্ত্রীর গহনাতেই যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলেন, কিন্তু তাহারই দ্বারে কত লোক অন্নের জন্য দীনভাবে হাহাকার করিতেছে, তথাপি তিনি একটী মাত্র পয়সা দিতে কুণ্ঠিত হন ও কাতরতা প্রদর্শন করেন। হায়! তাহাদিগের কি পাষাণ মন! কি কঠিন হৃদয়!! যেখানে অর্থ দান করিলে অর্থের সার্থক্য হইবে, সেখানে তাহারা অর্থ ব্যয় না করিয়া মিথ্যা কার্য্যে অর্থ ব্যয় করে। অতএব হে পাঠিকাগণ। তোমরা আর এই প্রকারে অর্থ ব্যয় না করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যেতেই অর্থ ব্যয় করিবে। স্বেচ্ছাচারিতা, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে অবস্থানুরূপ অর্থ ব্যয় করিলে অর্থের সার্থক্য হইবে ও ধর্ম্মের পথে ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে।

সম্পূর্ণ।